পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত অনুবাদ

হযরত মাওলানা আব্দুল গফুর সাম্বলী

দাওরায়ে হাদীস ও মিশকাত পরীক্ষার্থীদের জন্য অনন্য উপহার

اختلاف الائمة فى المسائل المهمة

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায়

ইমামগণের ইখতিলাফ

সংযোজন : মুয়াত্তা মালেক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ ও ত্বহাবী শরীফ-এর মুসান্নিফ রহ.গণের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

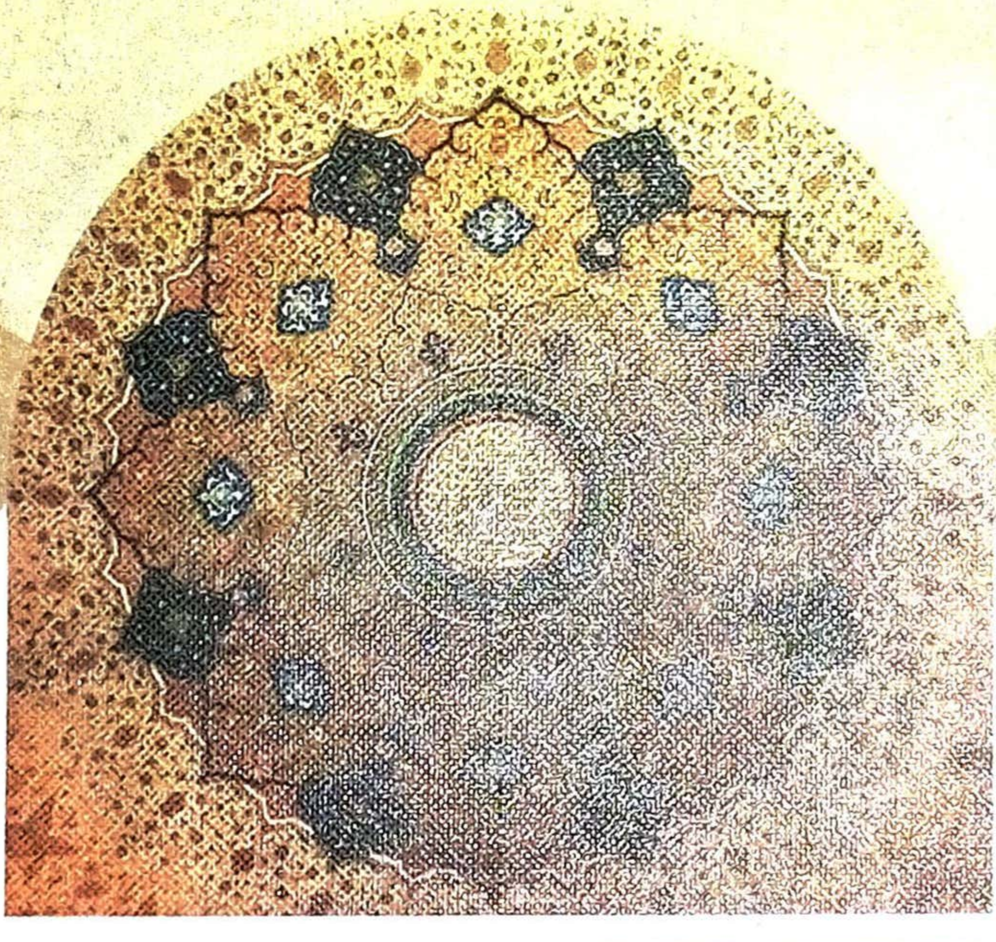

অনুবাদ : মাওলানা আবু আফফান নুরুজ্জামান

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত অনুবাদ

মেশকাত ও দাওরা হাদীসের ছাত্রদের জন্য অনন্য উপহার
হযরত মাওলানা আব্দুল গফুর সাম্ভলী কর্তৃক রচিত

اختلاف الأئمة في المسائل المهمة

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায়

ইমামগণের ইখতিলাফ

রেজাউল করিম
PDF

অনুবাদ

মাওলানা আবু আফ্‌ফান নূরুজ্জামান

প্রকাশনায়

তাওফিকিয়্যাহ লাইব্রেরী

হাটহাজারী মাদ্‌রাসার শাহী গেইটের পশ্চিম পার্শ্বে
ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৯৩৩-০৮২৬৩৬

অনুবাদকের কথা

শরীআতের মূল দলীল চারটি। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। এই চারটি থেকে শরীআতের সকল বিধি-বিধান উৎকলিত। শরীআতের এমন বহু বিষয় রয়েছে যেগুলির সম্পর্কে কুরআন হাদীসে একাধিক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরাম ব্যাপক গবেষণা করেছেন। দীর্ঘ গবেষণার পর যার কাছে যে ব্যাখ্যাটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে সেটি গ্রহণ করেছেন। ফলে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে দুইজনের গবেষণা এক রকম হয়নি, সেখান থেকে ইখতিলাফের সূচনা হয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, বিজ্ঞ ফকীহগণ একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সঠিক বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাই তাদের গবেষণা যেমনি হোক, তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক অনেক জাযা পাবেন। এই গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন অনেকেই। তার মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন চারজন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.। বক্ষ্যমাণ কিতাবটি সে সকল ইখতিলাফপূর্ণ মাসআলা নিয়েই লেখা। মেশকাত ও দাওরা হাদীস পড়ুয়া ছাত্ররা যে সকল মাসআলার সম্মুখীন হন এবং ব্যাপক বিড়ম্বনার শিকার হন, এতে সেসব মাসআলা স্থান পেয়েছে। প্রসিদ্ধি লাভকারী চার ইমামের মাযহাব প্রায় মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামের মতও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মাযহাবকে কারণ উল্লেখসহ তারজীহ দেওয়া হয়েছে। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় রচিত। সমাপনী পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য উপকারী ভেবে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো। মূল লেখক না জানা কারণে কিতাবটি দুইখন্ডে একত্রে ছেপেছেন। বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না করে বিশেষ বিবেচনায় পূর্ণ কিতাবটি এক খন্ডে ছাপা হয়েছে।

خيار المجلس শিরোনামের লেখাটি বিবাহ অধ্যায় থেকে সরিয়ে বেচা-কেনা অধ্যায়ে স্থাপন করা হয়েছে।

কোনো কোনো মাসআলায় লেখক সংক্ষিপ্ততার দিক অবলম্বন করেছেন। সে সকল ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে কিছুটা বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আশা করি এতে কিতাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছাত্রদের বিশেষ ফায়েদার দিকে লক্ষ করে, রেজাল শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবের আলোকে ছিহাহ ছিত্তাসহ হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনীর একটি সংকলন শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করা হয়েছে। কিতাবটির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ সংযোজন।

মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করি, তিনি কিতাবটি কবুল করুন। মেশকাত ও দাওরা হাদীসের ছাত্রদের জন্য ইস্তিফাদার মাধ্যম বানান। আরো দু'আ করি লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

আবু আফ্ফান নূরুজ্জামান
শিক্ষক, সাইফুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা
নতুন ঝাউদিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কালের খতীব হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলী (উস্তাযে আদব ও ফেকাহ্ দারুল উলূম দেওবন্দ) এর অভিমত

কাসেমী বাগানে নিয়মিত পরিচর্যা ও সিঞ্চন হচ্ছে। মাশাআল্লাহ তার মনোরম বসন্তে বিভিন্ন রঙ-বেরঙের ফুল খেলতে থাকে। যার মনোমুগ্ধকর সুবাস জাতির জীবন নাসিকাকে সুরভিত করতে থাকে। তাদের মজলিসের উদ্যানকে সুষমা করতে থাকে। সেই ফুলের একটি মালা হলো, ইখতিলাফুল আয়িম্মা ফিল মাসায়িলিল মুহিম্মা। যা প্রস্তুত করেছে ইলমী মারকাযের একযোগ্য ছাত্রপ্রিয় আব্দুল গফুর সাল্লামাহুল্লাহ। সে এ বছর দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র। আগ্রহী ও পরিশ্রমী তালেবে ইলম। দরসে নিয়মিত উপস্থিতিসহ মুতালাআ ও তাকরার তার দৈনন্দিন কাজ। হাদীসের দরসে আসাতেযায়ে কেরামের পবিত্র মুখ থেকে যেই ফুল ঝরেছে, সে তা এই কিতাবে একত্রিত করেছে। ঈমানের বাহাস থেকে শুরু করেছে। তারারাত, নামায ইত্যাদি বিষয়গুলিও এতে এসে গেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীসের ব্যাখ্যা, মাসায়েলের মধ্যে ইমামগণের ইখতিলাফ দলীল ও জবাবসহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য কিতাবের হাওয়ালাও পেশ করা হয়েছে।

মনে হচ্ছে, উস্তাদগণের আলোচনার সার নির্যাস এতে তুলে ধরেছে। যা হাদীসের ছাত্রদের জন্য একটি মূল্যবান হাদিয়া।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবকে পূর্ণ কবুলিয়াত দান করুন। প্রিয় লেখককে আরো বেশি ইলমী খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন

শুভাকাঙ্ক্ষী

(মাওলানা) আব্দুল খালেক সাম্ভলী

মুদাররিস, দারুল উলূম দেওবন্দ

১৮.০৬.১৪১৮ হি.

ফকীহুল আসর, হযরত মাওলানা মুফতী যফীরুদ্দীন সাহেব (দা.বা.) (উস্তাদ ইফতা বিভাগ ও ফত্ওয়া দারুল উলূম দেওবন্দের সংকলক)এর

অভিমত

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

মহান রবের লাখ লাখ শোকর যে, হযরতুল ইমাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.এর আপন মুরশিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীরহ.এর পরামর্শে এবং বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় যেই দারুল উলূমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা বর্তমান নিয়মিত ইলম ও দ্বীনের প্রচার প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে এবং সারা পৃথিবীর মুসলিমগণ এর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

প্রত্যেক যুগে এখান থেকে বড় বড় যুগশ্রেষ্ঠ আলেম তৈরি হয়েছে। এখানের শিক্ষা সিলেবাস পুরা ইসলামী বিশ্বে গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইলমে হাদীস এ ফিক্হ এখানের বিশেষ ফন। ওলামায়ে দেওবন্দ এই ফনগুলিতে ব্যাপক সুখ্যাতি লাভ করেছে এবং লাভ করাই উচিত।

এ বছর এখানের একজন হাদীসের ছাত্র একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব সংকলন করেছে। যা মানগত দিক দিয়ে অনেক উঁচু মানের। মাশাআল্লাহ ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে খুবই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অধমও কিতাবখানা অধ্যয়ন করেছি। আমার বড়ই আনন্দ লেগেছে যে, আমাদের প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফতী আব্দুল গফুর সাম্ভলী অনেক পরিশ্রম করে এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলি একত্র করার চেষ্টা করেছে। এর নাম দিয়েছে ইখতিফুল আয়িম্মা ফিল মাসায়িলিল মুহিম্মা। হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ বাব গুলির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছে। সাথে সাথে চার ইমাম ও হাদীসের ইমামগণের মাযহাব বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। একজন তালেবে ইলম এবং একজন আলেম কিতাবটি দেখলে খুব সহজে জানতে পারবে যে, কোন মাসআলায় ইমামগণের কী মাযহাব। প্রত্যেকের দলীল

কী। হানাফীদের পক্ষ থেকে তার কী জবাব দেওয়া হয়েছে। অথবা হানাফী আলেমগণ সমন্বয়ের কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যাতে একবাবের সকল হাদীসের ওপর আমল করা সহজ হয়ে গেছে।

এই কিতাবের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হচ্ছে। (এই সংকলনে ১ম-২য় খণ্ড একত্রে ছাপা হয়েছে) নিষ্ঠাবান ছাত্রের মূল্যবান খেদমত বড়ই ভালো লেগেছে। অন্তর থেকে দো'আ বেরিয়ে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলি একত্রিত করে দিন এবং আমাদের প্রিয় ছাত্ররা তা থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করার চেষ্টা করবে।

পরিশেষে দো'আ করছি, মুহতারমের এই মেহনতটুকু এলাহির দরবারে কবুল হোক এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি ইলমী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন।

দো'আপ্রার্থী

মুহাম্মদ যফীরুদ্দীন গুফিরালাহু

(মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ) ভারত)

৮.০৭.১৪১৯ হিজরী, শুক্রবার।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা....................................০৩
অভিমত....................................০৫

... ঈমান অধ্যায় ...

ঈমান মুরাক্কাব নাকি বাসিত.................................. ১৫
ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে.................................. ২২
ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক..............................২৩
অন্তিম মুহূর্তের ঈমান ২৪
ফেরাউনের ঈমান..................................২৫
আবু তালেবের ঈমান..................................২৮
কাফেরদের সৎকাজ..................................২৯
কাফেরদের অসৎ আমল.................................. ৩০
আল্লাহর দীদার.................................. ৩১
হদ লাগানোর পর তাওবা..................................৩৪
নামায বর্জনকারীর বিধান.................................. ৩৬
নফলের কাযার মাসআলা..................................৩৭
কাফেররা শাখাগত মাসআলার মুখাতাব কি না?...............৩৯
এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তর করা...............৪১
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দুধ সম্পর্ক প্রমাণ হওয়া........................৪২

... তহারাত অধ্যায় ...

পানি পাক ও নাপাকের বিষয়.................................. ৪৪
মুস্তামাল পানি.................................. ৪৭
নাপাকী দূরকারী..................................৪৮
সাগরের পানি ও তার জীব.................................. ৪৮

সাগরের কোন জন্তু হালাল এবং কোন জন্তু হারাম?........... ৪৯

নাবীযের বিধান...৫১

কুকুরের উচ্ছিষ্ট...৫৩

পাত্র পাক করার পদ্ধতি.. ৫৪

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট.. ৫৬

গাধার উচ্ছিষ্ট... ৫৮

মহিলা পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে থাকা পানি.................৫৯

ইস্তিঞ্জাতে ব্যবহারিক পাথরের সংখ্যা.............................৬০

কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া.......................... ৬২

নাপাক বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা.. ৬৫

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা...৬৬

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ............................... ৬৭

দাঁড়িয়ে পেশাব করা...৬৮

খাদ্য গ্রহণের পূর্বে বাচ্চার পেশাব............................... ৬৯

হালাল প্রাণীর পেশাব...৭১

মনি, মযি ও অদির বিধান...৭২

হায়েযের সর্বোচ্চ সময় ও সর্বনিম্ন সময়...........................৭৫

হায়েযের বিভিন্ন রং.. ৭৬

মুস্তাহাযার প্রকার...৭৮

হায়েযা মহিলার নামাযের কাযা নেই............................ ৭৯

হায়েযা মহিলা থেকে উপকৃত হওয়া..............................৮০

হায়েযা মহিলা ও জুনুবী মসজিদে প্রবেশ করা.................৮১

নাপাকী থেকে জমিন পাক করা................................. ৮৩

বাতাসের কারণে উযু নষ্ট হওয়া.................................৮৪

ঘুমের দ্বারা উযু ভঙ্গ হওয়া...................................... ৮৫

আগুনে পাকানো জিনিসে উযু ভঙ্গ হওয়া.......................৮৬

উটের গোশত খেলে উযু ভঙ্গ হওয়া............................ ৮৮

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হওয়া........................ ৮৯
চুমু দিলে উযু ভঙ্গ হওয়া........................ ৯১
বমি ও নাকের রক্তের কারণে উযু ভঙ্গ হওয়া........................৯২
উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা........................ ৯৩
কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া........................৯৪
মেসওয়াক........................ ৯৬
মাথা মাসেহ করা........................ ৯৮
দুই কান মাসাহ করা........................ ৯৯
পাগড়ীর ওপর মাসাহ........................১০০
মোজার ওপর মাসাহ........................ ১০১
জাওরাবের ওপর মাসাহ করা........................ ১০৩
পুরুষ ও মহিলার গোসল........................ ১০৪
জুমার গোসল........................ ১০৬
ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা........................ ১০৭
তায়াম্মুমের আলোচনা........................ ১০৭
পবিত্রতা অর্জনের বস্তু দুটি না পাওয়ার বিধান........................ ১০৯
আযানের বাক্য........................১১১
ইকামতের বাক্য........................১১৩

... নামায অধ্যায় ...

ফজরের নামাযের সময়........................ ১১৫
যোহর ও আসরের নামাযের সময়........................ ১১৭
নামাযের তাহরীম হলো তাকবীর........................১১৮
নামাযের তাহলীল হলো তাসলীম........................১২০
নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া........................ ১২১
ইমামের পিছনে ক্বেরাত পাঠ........................ ১২২
উচ্চ আওয়াজ ও নিম্ন আওয়াজে আমীন বলা........................ ১২৪

হাত তোলা...১২৫
তা'দীলে আরকান...১২৬
হাত রাখা...১২৮
দ্বিতীয় মাসআলা হলো, হাত কোথায় বাঁধবে....................১২৯
কপাল ও নাকের ওপর সাজদা করা..........................১৩০
সাজদায়ে সাহু...১৩১
নামায ভঙ্গ হওয়া...১৩৪
বসা ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির নামায......................১৩৫
নামাযে কথা বলা...১৩৭
বিতিরের নামাযে কুনুত পাঠ................................১৩৯
ফজরের নামাযে কুনুত পড়া................................১৪১
বিতিরের নামায...১৪৩
বিতিরের রাকাত সংখ্যা....................................১৪৫
এক সালামে বিতির..১৪৭
জুমার ওয়াক্ত...১৪৯
খুতবা চলাকালীন সময়ে নামায...............................১৫০
কসর আযীমত নাকি রোখসত................................১৫২
নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়ুয়ার নামায.......................১৫৪
যে ব্যক্তি এক রাকাত পেয়েছে...............................১৫৬
সূর্য ওঠা ও ডোবার সময়ে নামায..............................১৫৮
ইমামতির অধিক হকদার কে?................................১৬১
ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া...........................১৬৩
জামাতের বিধান...১৬৫
নামায পুনরায় পড়া..১৬৮
যোহরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত....................................১৭১
আসরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত....................................১৭২
মহিলারা মসজিদে গমন.....................................১৭৫

কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া..........১৭৮
মায়্যিত দেখে দাঁড়ানো..........১৮১

... যাকাত অধ্যায় ...

উটের যাকাত..........১৮২
সংজ্ঞা..........১৮৫
রেকাযের বাস্তবতা..........১৮৫
একত্রিত করণ ও বিভাজন..........১৮৭
জীব-জন্তুর ক্ষতি বৃথা..........১৯০
ইয়াতিমের মালে যাকাত..........১৯২
অর্জিত সম্পদ..........১৯৩
জরিপ করার বিধান..........১৯৫
রোযার নিয়ত..........১৯৭
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা..........১৯৮

... হজ্ব অধ্যায় ...

কোন্ হজ্ব উত্তম?..........২০০
হজ্বের বিধানাবলিতে তারতীব..........২০৩
কারেনের তাওয়াফ..........২০৫
রান সতর..........২০৭

... বিবাহ অধ্যায় ...

অলি বিনে বিবাহ হয় না..........২০৮
বাধ্য করার অধিকার..........২১০
হায়েয চলাকালীন সময়ে তালাক দেওয়া..........২১২
খরচ ও বাড়ি..........২১৩
মাহার মাল হতে হবে..........২১৫

স্বাধীন করা মাহার হওয়া..২১৬

... বেচা-কেনা অধ্যায় ...

বিক্রয়যোগ্য হওয়া..২১৭
মজলিসের খেয়ার..২২১
মুছাররাত জন্তু বিক্রি করা..২২২
খেজুর গাছ তাবীর করা..২২৪
সালাম লেনদেন ২২৫
শোফার অধিকারী প্রতিবেশী....................................২২৭

... জিহাদ অধ্যায় ...

নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ..২২৮
পদাতিকের জন্য একাংশ..২৩০
নিকটাত্মীয়..২৩২

... হদ ও কেসাসের অধ্যায় ...

কাফেরের কারণে মুমিনকে হত্যা করা.............................২৩৩
হারামে অপরাধীর ওপর হদ লাগানো..............................২৩৫
মদপানের বিচার..২৩৭
মদপানের হদের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে.......................২৩৭
যেনার হদ ২৩৯
বিবাহিত পুরুষ মহিলার হদেও ইখতিলাফ আছে.................২৪১

... বিবিধ ...

কসমের প্রকারভেদ..২৪১
কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা..২৪৪
ঈসালে সাওয়াব..২৪৬
পেটের বাচ্চার যবাহ..২৪৮

ঘোড়ার গোশত..২৪৯
গুই সাপ ভক্ষণ করা..২৫০
হায়েনা খাওয়া..২৫১

পরিশিষ্ট

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবের লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালেক বিন আনাস আলআসবাহী.........২৫৪
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী.........২৫৮
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী..................................২৬১
ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নিসাপুরী........২৬৯
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন মাজাহ আলকযবিনী....................২৭৩
ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানী...........২৭৫
ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী..২৭৯
ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শোয়াইব নাসায়ী.......২৮৩
ইমাম আবু জা'ফার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ তহাবী..............২৮৬

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

ঈমান অধ্যায়

الإِيْمَانُ مُرَكَّبٌ أَمْ بَسِيْطٌ

ঈমান মুরাক্কাব নাকি বাসিত

ঈমান যৌথ (মুরাক্কাব) না একক (বাসিত), এক্ষেত্রে ৬টি মত আছে। যার মধ্যে দুটি মত সঠিক, আর চারটি মত ভুল। জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুরজিয়াদের মতে ঈমান বাসিত। অর্থাৎ শুধু একটি জিনিসের নাম ঈমান এবং সেটিই মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আমলের প্রয়োজন নেই।

জাহমিয়া : তারা বলে, ঈমান হলো শুধু আন্তরিক পরিচয়ের নাম। অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকার, অন্যান্য রুকন মতে আমল করার প্রয়োজন নেই।

দলীল : তারা দলীল হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস পেশ করে থাকে। হাদীসটি হলো,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ : যে ব্যক্তি মারা গেলো, আর সে জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

---

[১]. সহীহ মুসলিম : ১/৪১।

উল্লিখিত হাদীস দিয়ে তারা এভাবে দলীল পেশ করে যে, দেখো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমায়ে তাওহীদ জানার ওপরই জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, অন্তরে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। মুখে স্বীকার এবং আমলেরও প্রয়োজন নেই।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে يعلم শব্দ থেকে শাব্দিক অর্থ জানা উদ্দেশ্য নয়। বরং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা উদ্দেশ্য। এটা এভাবে বুঝা গেলো যে, অন্য হাদীসে অতিরিক্ত কথা এসেছে, غير شاك فيهما অর্থাৎ এই দুয়ের মাঝে সন্দেহ ব্যতীত।[২] তাছাড়া ঈমানের জন্য যদি শুধু অন্তর দিয়ে জানা যথেষ্ট হতো, তাহলে সকল ইহুদী-খৃস্টান মুমিন হতো। এ কারণেই তাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ অর্থ : তারা তাকে তেমনি চিনে, যেমন তাদের সন্তান-সন্ততিকে চিনে।

তাহলে তাদের জানা ছিলো, তারপরও মুমিন নয়। প্রমাণ হলো, নিছক জানা ও পরিচয় লাভ করা ঈমান পাওয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

কাররামিয়া : তারা বলে, ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম। অন্তরে বিশ্বাস বা রুকনসমূহ আমল করার প্রয়োজন নেই।

দলীল : তারা দলীল হিসেবে হাদীস পেশ করে,

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বললো, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩] তারা বলে, দেখুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে স্বীকারোক্তির ওপরই জান্নাতে প্রবেশের সংবাদ দিয়েছেন। বিশ্বাস ও আমলের কোনো আলোচনা নেই।

---

২. সহীহ মুসলিম : ১/৪১, নভভীর টীকা, ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৯।

৩. মাজমাউয যাওয়িদ : ১/১৮।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে শুধু মুখে বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখে বলা উদ্দেশ্য। যেমন অন্যান্য হাদীসে مخلصا ও موقنا ইত্যাদি অতিরিক্ত শব্দ আছে।[৪] এর দ্বারা এটাই বুঝা যায়। ঈমানের জন্য যদি শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হতো, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সকল সাথী সঙ্গীরা মুসলমান হতো। কেননা, মুখে তো তারাও স্বীকার করতো। কিন্তু তারা কাফেরের বাচ্চা মুনাফিকই- মুনাফিক থেকে গেছে। প্রমাণ হলো, শুধু মুখে স্বীকার করা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।

মুরজিয়া : তারা বলে, ঈমান বলে শুধু অন্তরের বিশ্বাসকে। আর এতটুকুই মুক্তি এবং প্রথম স্তরে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট। আমল করার প্রয়োজন নেই। মানুষ যতই গুনাহ করুক জাহান্নামে যাবে না। তার ঈমান তাকে সোজা জান্নাতে নিয়ে যাবে।

দলীল : তারা দলীল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস পেশ করে। হাদীসটি হলো,

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ : কোনো বান্দা যদি বলে আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। অতঃপর সে এর ওপর মৃত্যু বরণ করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবু যর রাযি. বলেন, وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ (যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ (যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে)[৫] দেখুন, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেনা ও চুরির পরও জান্নাতী বলেছেন,

---

[৪]. জামেউস সগীর, সুয়ূতী : ২/১৭৬, মাউমাউয যাওয়ায়িদ : ১/১৭।

[৫]. সহীহ মুসলিম : ১/৬৬।

আযাবের কোনো উল্লেখ নেই। বুঝা গেলো, ঈমান থাকলে গুনাহের ওপর কোনো শাস্তি হবে না।[৬] বরং তার ঈমান তাকে সোজা জান্নাতে নিয়ে যাবে। তাই অন্তরের বিশ্বাসের পর আমলের কোনো প্রয়োজন নেই।

জবাব : অন্তরের বিশ্বাসের নাম যে ঈমান, একথা আমরা স্বীকার করি। তবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি, জান্নাতে প্রথম পর্যায়ে প্রবেশের জন্য শুধু এতটুকু যথেষ্ট, আমল করার প্রয়োজনই নেই একথা আমরা স্বীকার করি না। কেননা, ভালো আমলের যদি একেবারে প্রয়োজনই না হতো এবং গুনাহের দ্বারা কোনো ক্ষতি না হতো, তাহলে কুরআনে কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহে এত ব্যাপক পরিমাণে কর্মের নির্দেশ দেওয়া হতো না। গুনাহের কাজে বারণও করা হতো না।

প্রমাণ হলো, অন্তরের বিশ্বাসের পর আমল করা এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচার প্রয়োজন আছে। আর হাদীসের জবাব হলো, কেউ মুমিন হলে তার থেকে গুনাহ্ পাওয়া গেলেও সে কোনো একদিন জান্নাতে যাবেই। তবে জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে তাকে তার গুনাহের শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেই শাস্তির কথা এই হাদীসে উল্লেখ নেই বলে একথা প্রমাণ করা যে, গুনাহের ওপর শাস্তিই হবে না। এটা কিভাবে ঠিক হবে? অথচ অন্যান্য হাদীসে শাস্তি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব এই সংক্ষিপ্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

মু'তাযেলা ও খারেজীরা : তারা বলে, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও রুকনগুলি আমল এই তিন জিনিসের সমষ্টির নাম ঈমান। আর এই তিনটি জিনিস ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ। অর্থাৎ এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি ছুটে গেলে ঈমানই চলে যাবে। মানুষ ইসলামের সীমা থেকে বেরিয়ে যাবে। তবে কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে কি না? মু'তাযালা বলে কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে না। বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে থাকবে। আর খারেজীরা বলে কুফরের মধ্যে প্রবেশ করবে।[৭]

---

৬. ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৮, ফয়যুল বারী।
৭. ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৮।

দলীল-১ : ঈমানের সীমা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে উক্ত দুই দল দলীল পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ যেনাকারী যখন যেনা করে যখন সে মুমিন অবস্থায় যেনা করে না।[৮]

দেখুন! যেনাকারী থেকে যখন আমল ছুটে গেলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঈমান থেকে বহির্ভূত বললেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, আমল ঈমানের এমন অংশ যে, তা ছুটে গেলে মানুষ মুমিনই থাকে না।

দলীল-২ : খারেজীদের দৃষ্টিতে আমল বর্জনকারী যেহেতু ঈমান থেকে বেরিয়ে কুফরের মধ্যে প্রবেশ করে তাই তিনি পৃথকভাবে এই দলীল দিচ্ছেন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

অর্থাৎ যে মুসলমান জেনে বুঝে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। আর জাহান্নামে সর্বদা তো কাফেরেরই আযাব হবে। বুঝা গেলো আমল বর্জনকারী এবং গুনাহে কবীরাকারী ঈমানের সীমা থেকে বেরিয়ে কুফরের মধ্যে ঢুকে যায়।

জবাব- ১ : উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়, যা তোমরা বুঝেছো। বরং উদ্দেশ্য হলো, সে শুধু ততটুকু সময় মুমিন থাকে না, যতটুকু সময় যেনাতে লিপ্ত থাকে। কেননা ততটুকু সময় তার ঈমান অন্তর থেকে বেরিয়ে ছায়ার মতো উপরে ঝুলে থাকে। সে যখন যেনা থেকে বিরত হয় তখন তার অন্তরে ফিরে আসে।[৯] এবং সে মুমিন হয়ে যায়। তাই তাকে সর্বদার জন্য ঈমানের সীমা থেকে বহির্ভূত মনে করা ভুল। একথা যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, ঈমানের জন্য আমল জরুরী এবং আমল না

---

৮. মিশকাত শরীফ।

৯. জামে তিরমিযী: ২/৯০।

করলে মানুষ মুমিন থাকে না, তাহলে কুরআনে অনেক জায়গায় কবীরা গুনাহকারীকে মুমিন বলে সম্বোধন করলেন কেন? যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ যদি মুমিনদের মধ্যে থেকে দুই দল লড়াই করে, তাহলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। বুঝা গেলো, আমল ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ নয়। বরং আমল বিনেও শুধু ঈমান পাওয়া যেতে পারে।

জবাব-২ : খারেজীদের পেশকৃত আয়াতের জবাব হলো, এখানে خَالِدًا শব্দ দ্বারা সর্বদা জাহান্নামে থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং দীর্ঘদিন থাকা উদ্দেশ্য।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ

তারা বলেন, অন্তরে বিশ্বাস মুখে স্বীকার ও রুকনগুলি আমল করার সমষ্টির নাম ঈমান। তবে মু'তাযালা ও খারেজীদের মতো নয়। বরং তাদের দৃষ্টিতে অন্তরে বিশ্বাস মূল। আর বাকি দুটি অংশ অতিরিক্ত শাখা। অর্থাৎ এই দুটি না হলেও শুধু অন্তরে বিশ্বাসের কারণে মানুষ মুমিন থাকবে। এই মতটি সমতার ওপর ভিত্তি।

মুহাদ্দিসগণের দলীল : কুরআনে কারীম এবং সহীহ হাদীসমূহে ব্যাপকভাবে আমল বর্জনকারীকে মুমিন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বুঝা গেলো, আমল ছাড়াও শুধু অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা ঈমান বাস্তবায়ন হয়।

ইমাম আযম রহ. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুতাকাল্লিমগণ

তারা বলেন, ঈমান বাসিত। শুধু অন্তরে বিশ্বাসের নাম ঈমান। তবে মুরজিয়াদের মতো নয়। বরং তার সাথে দুনিয়াবী বিধান জারি হওয়ার জন্য মুখে স্বীকার করা জরুরী। (যেমন, রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফা নিযুক্ত হওয়া, ইবাদতে ইমাম হওয়া, বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষী হওয়া ইত্যাদি) আর রুকনগুলির ওপর আমল করা ঈমানকে পাকাপোক্ত করার জন্য জরুরী। এই মতটিও সমতার ওপর ভিত্তি। আর এটা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

দলীল

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ

এই আয়াতগুলিতে ঈমানের স্থান অন্তরকে বলা হয়েছে। আর অন্তরে শুধু বিশ্বাস পাওয়া যায়। প্রমাণ হলো, শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান।

একটি সন্দেহের নিরসন

বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যকার ইখতিলাফ বাস্তব ইখতিলাফ। কিন্তু সত্য কথা হলো, দুই দলের মাঝে বাস্তবে কোনো ইখতিলাফ নেই। বরং শুধু শাব্দিক ঝগড়া। কেননা উভয় দল ঈমানকে মুরাক্কাব বা বাসিত বলেছেন একই দিক দিয়ে নয়। বরং ইমাম শাফেয়ী রহ. ও মুহাদ্দিসগণ যে ঈমানকে মুরাক্কাব বলেন, এটা ঈমানের পূর্ণতার দিক দিয়ে। (ইমাম আযম রহ.ও এর প্রবক্তা) আর জামহুর মুতাকাল্লিমীন ও ইমাম আযম ঈমানকে বসিত বলেছেন শুধু ঈমানের দিক তাকিয়ে। (ইমাম শাফেয়ী রহ.ও যার প্রবক্তা) প্রমাণ হলো, উভয়ের মাঝে বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। শুধুমাত্র ব্যক্ত করার পার্থক্য।

ব্যক্ত করার পার্থক্য : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে যখন বাস্তবে ইখতিলাফ নেই এবং বাস্তবে উভয়ের মাযহাব অভিন্ন, তাহলে শব্দ ও ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো কেনো? একদল ঈমানকে মুরাক্কাব বলে আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অপর দল ঈমানকে বাসিত বলে আমলকে ঈমান থেকে বের করে দিয়েছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.এর মুখে এর জবাব শুনুন। তিনি বলেন, এই আহলে হক ইমামগণ সর্বযুগে বাতিল ফেরকার সাথে লড়াই করেছেন। আর তারা সর্বদা সময়ের চাহিদাকে সামনে নিয়ে তাদের প্রতিহত করেছেন। ইমাম আযম রহ.এর যুগে মু'তাযালার প্রভাব ছিলো। এমনকি সরকারের মাসলাকও মু'তাযালা মাসলাক ছিলো। ইমাম আযম রহ. যুগের চাহিদা হিসেবে মু'তাযালাদের পূর্ণ বিরোধিতা করেন। মু'তাযালা

যখন আমলকে ঈমানের অংশ বানালো, ইমাম আযম রহ. তা (অর্থাৎ আমলকে) ঈমান থেকে বের করে দিলেন। আর যখন ইমাম শাফেয়ী রহ.এর যুগ আসে তখন মুরজিয়া ও কাররামিয়াদের সাথে লড়াই ছিলো। তাই ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, তোমরা আমলকে ঈমানের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বলো। আমি বলি, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং অত্যন্ত জরুরী বিষয়।[১০]

الإِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ

ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কমে

ইমাম আযম রহ. ও জামহুর মুতাকাল্লিমীন : তারা বলেন, ঈমান বাসিত তথা একক বস্তু। আর একক বস্তুর মধ্যে অংশ না থাকার কারণে বৃদ্ধি পায় না এবং কমে না। তাই ঈমানের মধ্যেও বাড়তি কমতি হয় না।

তিন ইমাম ও জামহুর মুহাদ্দিসীন : তারা বলেন, ঈমান মুরাক্কাব তথা সমষ্টিগত বস্তু। আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমলের বাড়তি কমতির কারণে ঈমানের মধ্যেও বাড়তি কমতি হয়।

বৈপরীত্যের সমাধান : উক্ত দুই মতের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবতা হলো, এই মাসআলায়ও বাস্তব কোনো বিরোধ নেই। কেননা, ইমাম আযম রহ. মূল ঈমানের মধ্যে বাড়তি কমতির কথা অস্বীকার করেছেন। যে কথা তিন ইমামও বলেন। আর তিন ইমাম ঈমানের মধ্যে যে, বাড়তি কমতির কথা বলেছেন, সেটা আমলের দিক লক্ষ করে। যেকথা ইমাম আযম রহ.ও স্বীকার করেন। তাছাড়া আমলের কারণে ঈমানের মধ্যে বাড়তি কমতির প্রমাণ কুরআনের পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[১০]. ইযাহুল বুখারী : ১/১৫৮।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অর্থাৎ তাদের সামনে আমার আয়াত তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। মোটকথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সকলে একমত মূল ঈমান বাড়েও না কমেও না। ঈমানের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য বাড়ে এবং কমে।

النِّسْبَةُ بَيْنَ الإِيْمَانِ وَالإِسْلَامِ

ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক

এক্ষেত্রে চারটি মত আছে। ১. তিন ইমাম ও জমহুর মুহাদ্দিসের মতে ঈমান ও ইসলামের মাঝে 'তাসাবী'র সম্পর্ক। অর্থাৎ ঈমান সেটাই যেটা ইসলাম। ইসলাম সেটাই যেটা ঈমান। উদ্দেশ্য ও অস্তিত্বের উভয় দিক দিয়ে দুটি এক জিনিস। কোনো পার্থক্য নেই।

২. ইমাম আযম ও মুতাকাল্লিমীনের মতে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুটি ভিন্ন জিনিস। তবে অস্তিত্বের দিক দিয়ে عموم خصوص من وجه এর সম্পর্ক। এর অর্থ হলো, এর তিনটি ছুরত হবে। এক জায়গায় উভয়টি একত্রিত হবে। অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম দুটিই পাওয়া যাবে। এক জায়গায় শুধু ঈমান পাওয়া যাবে, ইসলাম পাওয়া যাবে না। এক জায়গায় ইসলাম পাওয়া যাবে ঈমান পাওয়া যাবে না। এভাবে তিনটি ছুরত হবে। (তবে এই সম্পর্কের বাস্তবায়ন নেই।)[১১]

৩. মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী ক্বারীর মতে দুটির মাঝে عموم خصوص مطلق এর সম্পর্ক। অর্থাৎ ঈমান আম তথা ব্যাপক। ইসলাম খাস তথা বিশেষ।

---

[১১]. ফয়যুল বারী, ঈমান অধ্যায়।

৪. সায়্যিদ মুরতাযা হাসান যোবায়দীর মতে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি পৃথক পৃথক। তবে অস্তিত্বের দিক দিয়ে দুটির মাঝে পারস্পরিক আবশ্যকীয়তা রয়েছে। অর্থাৎ একটি পাওয়া গেলে অপরটি অবশ্যই পাওয়া যাবে। উভয়টির একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। তাই একটি ছাড়া অপরটি পাওয়া যাবে না।

الإِيْمَانُ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ

অন্তিম মুহূর্তের ঈমান

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে অন্তিম মুহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এমন অবস্থায় মানুষ নিজ ইচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করে না। সেই ঈমান গায়বের ওপরও হয় না। কেননা পরকালীন জীবনের দৃশ্য তার সামনে ভেসে ওঠে। অথচ ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিজ ইচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করা শর্ত।[১২] তাই এমন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এমন ঈমানকে ঈমানে বাস বা বিপদের ঈমান অথবা ঈমানে ইয়াস বা নৈরাশ্যের ঈমান বলে। অনেকে অন্তিম মুহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রবক্তা। কিন্তু তাদের দলীল অত্যন্ত দুর্বল ও হালকা হওয়ার কারণে তাদের উক্তির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

আমাদের দলীল : কুরআনের আয়াত,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ

"এমন লোকদের তাওবা কবুল হয় না যারা খারাপ কাজ করতে থাকে। আর যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমি এখন তাওবা করছি।"

---

[১২]. ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৫।

হাদীস শরীফে আছে, إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

"আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা কবুল করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তিম মুহূর্তে না পৌঁছে।"[১৩] বুঝা গেলো, যখন অন্তিম মুহূর্তে এসে পৌঁছে তখন তাওবা কবুল হয় না।

إِيْمَانُ فِرْعَوْنَ

ফেরাউনের ঈমান

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ফেরাউনের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সে ঈমানের কালিমা অন্তিম মুহূর্তে পড়েছিলো। আর অন্তিম মুহূর্তের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমনটি উপরে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের দলীল : কুরআনে কারীমের আয়াত

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

অর্থাৎ যখন তারা আমাদের আযাব দেখে নিয়েছে, তখন তাদের ঈমান তাদেরকে কোনো উপকার করেনি।[১৪] আর ফেরাউন যেহেতু আযাব দেখার পর ঈমান গ্রহণ করেছে, তাই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী তার ঈমানও তার জন্য উপকারী হবে না।

অনেকে বলে, ফেরাউনের ঈমান গ্রহণযোগ্য। তারা তাই গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে কুরআনের আয়াত থেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। যাদের মধ্যে মূল প্রবক্তা হিসেবে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবীর নাম আসে। ফুসুস, জুন্দী, কায়রুনী, কায়সারী, জামী আলাল মাহায়েমী আব্দুল্লাহ রুমী ও মুহাক্কিক দাওয়ানী প্রমুখ শারেহগণ যার সমর্থন করেছেন। প্রবক্তাদের

---

১৩. মিশকাত : ২০৪, তিরমিযি ও ইবনে মাযার উদ্ধৃতি।

১৪. সূরা মুমিন : ৮৫।

তালিকায় হাম্বলী মাযহাবের কারো কারো নাম এবং কাযী আবু বকর বাকিল্লানীর নাম গণনা করা হয়েছে।

এমন কি শায়খের সমর্থনে কায়রুনী "আল জানেবুল গরবী" নামক ফার্সী ভাষায় একটি বই লেখেছেন। তাদের আরেক সমর্থক আরবী আলেম সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন রসুল 'আল জায়েবুল গয়বী' নাম দিয়ে বইটি আরবী ভাষায় প্রবর্তন করেন। মোটকথা এই ব্যক্তিবর্গদের দিকে ফেরাউনের ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্বোধন করা হয়। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)[১৫]

শায়খ ইবনুল আরবীর কিতাব ফুতুহাতে মাক্কিয়াতে ফেরাউনের ঈমানের ওপর বিভিন্ন দলীল এবং যেই আয়াতগুলি দ্বারা ফেরাউনের কুফর প্রমাণিত হয় তার ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে। যাতে কোনো ওজন নেই। আমরা এখানে তাদের দলীল পেশ করছি। যার দ্বারা আপনি নিজেও অনুমান করতে পারবেন যে, তাদের দলীলগুলি কোন স্তরের।

দলীল : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের এক জায়গায় বান্দাদেরকে একথা বলেছেন যে, তিনি ব্যথিত মানুষের ডাক শোনেন। তার বিপদ দূর করেন। আর ফেরাউনের চেয়ে বড় দুঃখ কার হতে পারে, যখন সে ডুবে যাচ্ছিলো। আর এমন অবস্থায় সে আল্লাহকে ডেকেছে যে,

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

"আমি ঈমান এনেছি যে, সেই সত্তা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই- যার প্রতি বনি ইসরাইল ঈমান এনেছে।" তাহলে আল্লাহ তা'আলা কি তার ডাক শুনবেন না এবং তার ঈমান গ্রহণ করবেন না? অথচ তার দয়া তো এর চেয়ে অনেক গুণ ব্যাপক।[১৬]

জবাব : ফেরাউন এই কালিমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় বলেছিলো। আর এমন মুহূর্তে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। কিন্তু তারা খণ্ডন করে বলেন, সে এই কালিমা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে বলেছে।

---

[১৫]. রূহুল মা'আনী : ৬/১৮৫, ফয়যুল বারী : ৪/১৮৮, ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৬।
[১৬]. রূহুল মাআনী : ৬/১৮৬।

মোটকথা, আমরা একথা মেনে নিলেও তার কুফর প্রমাণ হয়ে যাবে। যার কারণে রূহুল মা'আনী গ্রন্থকার বলেন,

لِأَنَّا لَمْ نَحْكُمْ بِكُفْرِهِ لِأَجَلِ إِيْمَانِهِ عِنْدَ الْبَأْسِ فَحَسْبُ بَلْ لَمَّا انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ تَعَالَى ايْمَانًا صَحِيْحًا بَلْ كَانَ تَقْلِيْدًا مَحْضًا.

অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র অন্তিম মুহূর্তে তার ঈমানের কারণে তার কুফরের ফায়সালা করিনি, বরং (অন্য কারণও রয়েছে, যেমন:) সে আল্লাহ তা'আলার ওপর সঠিক ঈমান আনেনি। বরং শুধুমাত্র অন্যের অনুকরণ করেছে,[১৭] অর্থাৎ সে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনেনি, বরং বনি ইসরাঈলকে মাঝে মাধ্যম বানিয়ে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে।

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

আর এটা তাকলীদ বা অনুকরণ। যা গ্রহণযোগ্য হয় না। বিশেষভাবে ফেরাউনের মতো নিকৃষ্ট আকীদা পোষণকারীর এমনিতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি একথাও মেনে নেওয়া হয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার ওপর সহীহ ঈমান এনেছে। তবুও তার কোনো কাজে আসবে না। কেননা সে অপূর্ণ ঈমান এনেছে। অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনেনি। অথচ সকল উম্মত একথার ওপর একমত যে, রাসূলকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর ওপর ঈমান যথেষ্ট হবে না।

একথা আল্লামা আলূসী এভাবে লিখেছেন,

وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الإِيْمَانَ بِاللهِ تَعَالَى مَعَ عَدَمِ الإِيْمَانِ بِالرَّسُوْلِ لَا يَصِحُّ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ فِرْعَوْنَ امَنَ بِاللهِ تَعَالَى إِيْمَانًا صَحِيْحًا فَهُوَ لَمْ يُؤْمِنْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَعرِضُ لَه أَصْلًا فَلَمْ يَكُنْ إِيْمَانُه نَافِعًا.

---

১৭. রূহুল মাআনী : ৬/১৮৬।

"যদি আমরা মেনেও নেই যে, (সে আল্লাহর ওপর সহীহ ঈমান এনেছিলো) তাহলে একথার ওপর ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, শুধু আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনা রাসূলের ওপর ঈমান আনা ব্যতীত সহীহ হবে না। সুতরাং আমরা যদি মেনে নেই যে, ফেরাউন আল্লাহর ওপর সহীহ ঈমান এনেছিলো। তবে সে মুসা আলাইহিস সালামএর ওপর ঈমান আনেনি। আর একথা চিন্তাও করেনি, তাই তার ঈমান উপকারী হবে না।[১৮]

إِيْمَانُ أَبِيْ طَالِبٍ

আবু তালেবের ঈমান

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আবু তালেবের ঈমানের প্রবক্তা নয়। রাফেযীরা তার ঈমানের প্রবক্তা।

রাফেযী : তাদের দলীল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর সেই বর্ণনা যা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, খাজা আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সামনে কালিমা পড়তে অস্বীকার করে। এরপর হযরত আব্বাস রাযি. দেখলেন, তিনি ঠোঁট নাড়ছেন। তখন কান লাগালেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসে খবর দিলেন যে, খোদার কসম আমার ভাই (আবু তালেব) ঐ কালেমা পাঠ করেছে যা পড়তে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯]

জবাব : এই হাদীস ঐসব সহীহ হাদীসের বিপরীত যাতে আবু তালেব জাহান্নামে যাওয়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই ঐসব সহীহ হাদীসগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসে অপরিচিত ব্যক্তির মাধ্যম পাওয়া গেছে। আর ঐ হাদীসগুলির সনদ দৃঢ় ও উত্তম।[২০]

---

[১৮]. রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত।
[১৯]. ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৭।
[২০]. ফতহুল মুলহিম : ১/১৯৭।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত : তাদের দলীল হলো, সে সব হাদীস যার মধ্যে আবু তালেব জাহান্নামে যাওয়ার কথা খবর দেওয়া হয়েছে। যেমন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব আবু তালেবের হবে। আর সে আগুনের দুটি জুতা পরিধান করা থাকবে। যার কারণে তার মগজ টগবগ করবে।[২১]

উক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আবু তালেব ঈমানবিহীন দুনিয়া থেকে চলে গেছে।

حَسَنَاتُ الْكُفَّارِ

কাফেরদের সৎকাজ

ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফর অবস্থার নেককাজগুলি গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে কি না? হযরত ইমাম বুখারী রহ. বলেন, কুফর অবস্থার কোনো নেককাজ গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তা সব অনর্থক বলে প্রমাণ হবে। জামহুর বলেন, যদি সে সত্য অন্তরে ঈমান গ্রহণ করে, তাহলে তার কুফর অবস্থায় কৃত ভালো কাজের ধর্তব্য হবে এবং সে তার ওপর সাওয়াব পাবে।

দলীল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস, أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ তুমি পূর্বের ভালো কর্মের সাথে ইসলামে এসেছো।[২২]

---

২১. মুসলিম শরীফ : ১/১১৫।

২২. সহীহ মুসলিম : ১/৭৬।

উক্ত হাদীস পরিষ্কার বুঝায় যে, কাফেরের সৎকাজ ইসলাম গ্রহণ করার পরও বাকি থাকে।

سَيِّئَاتُ الْكُفَّارِ

কাফেরদের অসৎ আমল

এই শিরোনামে ঐ মাসআলার আলোচনা যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা হবে কি না?

ইমাম আহমদ : তিনি বলেন, শুধু ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কুফর অবস্থার গুনাহ ক্ষমা হয় না। বরং তার পূর্বে গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। তখন ক্ষমা হবে।

জবাব : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাওবা করার কোনো অর্থ নেই। কেননা, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে কাফের। আর যদি কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ না করে গুনাহ থেকে তাওবা করতে থাকে, তাহলে একথা স্পষ্ট যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং তার গুনাহ ক্ষমা হয়নি। তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করা অনর্থক হবে।

জামহুর : তারা বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস, اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।[২৩]

---

২৩. সহীহ মুসলিম : ১/৭৬।

رُؤْيَةُ الْبَارِئْ

আল্লাহর দীদার

স্থান হিসেবে দীদার তিন প্রকার। ১. মে'রাজে দীদার ২. দুনিয়াতে দীদার ৩. আখেরাতে দীদার।

তিন প্রকারের মধ্যেই ইখতিলাফ আছে। মে'রাজে দীদারের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা রাযি. ও ইবনে আব্বাস রাযি. এর ইখতিলাফ রয়েছে। আর দুনিয়া ও আখেরাতে দীদারের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত আলেমগণ ও মু'তাযালা, খারেজীদের মাঝে ইখতিলাফ আছে।

মে'রাজে দীদার : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, মে'রাজ রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি।

দলীল : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ অর্থাৎ চোখসমূহ তাকে দেখতে পায় না। এই আয়াতের দ্বারা জানা যায়, তার দীদার সম্ভব নয়। তাই অন্য এক জায়গায় বলেন, যে ব্যক্তি একথা মনে করলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন, সে আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে।[২৪]

জবাব : উল্লিখিত আয়াতে تُدْرِكُهُ শব্দটি تحيط এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫] যার অর্থ হলো, চোখ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর একথা সকলেই বলে। তাই এখানে আয়ত্বকে দীদারের অর্থে নেওয়া সঠিক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. : তিনি বলেন, মে'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন।

---

[২৪]. সহীহ মুসলিম : ১/৯৮।
[২৫]. ফতহুল মুলহিম : ১/৩৩৯।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস, لقد رأيت ربي عزوجل অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছি।[২৬]

মজার ব্যাপার হলো, মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে যেটা দুই রকম পড়া যায়। যার ফলে একই হাদীস দুই পক্ষের দলীল হয়। হাদীসটি হলো نور انى أراه এটা نُوْرٌ أَنَّى أَراه (তিনি নূর আমি কিভাবে দেখবো) পড়লে দীদার না হওয়া প্রমাণিত হয়। আর نُورَ انِّيْ أَراه (তার নূরানী চেহারা আমি দেখেছি) পড়লে দীদার হওয়া প্রমাণিত হয়। (অনুবাদক)

দুনিয়াতে দীদার : মু'তাযালা ও খারেজীরা বলে দুনিয়াতে দীদার সম্ভব নয়।[২৭]

দলীল : কোনো জিনিস দেখার জন্য কিছু শর্ত আছে, **১.** ঐ জিনিস বেশি দূরে না হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা অনেক দূরে। কেননা তিনি আরশের ওপর সমাসীন। আর আরশ আমাদের দৃষ্টি থেকে দূরে। **২.** ঐ জিনিস অনেক কাছেও না হওয়া। অথচ অন্য দিক থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনেক কাছে। যেমন তিনি নিজে বলেছেন, "আমি তোমাদের শাহরগ থেকে নিকটে।" **৩.** দেখার বস্তু কোনো স্থান বা দিকে থাকতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোনো স্থান বা দিকে হওয়ার থেকে পবিত্র। কেননা এটা শরীরের বৈশিষ্ট্য। আর তার শরীর নেই। **৪.** সে জিনিস সামনে হতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সামনে নয়। **৫.** দর্শকের চোখ থেকে নির্গত জ্যোতি ঐ জিনিসের সাথে ছোঁয়া লেগে ফিরে আসবে। এই শর্তও আল্লাহ তা'আলার দীদারে পাওয়া যায় না। আর এই সকল শর্ত যখন আল্লাহ তা'আলার দীদারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না,

---

[২৬]. মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে আব্বাস থেকে মারফু' সূত্রে।

[২৭]. ফতহুল মুলহিম : ১/৩৪২।

এরপরও তার দীদার কিভাবে সম্ভব হয়। বুঝা গেলো তার দীদার সম্ভব নয়।

জবাব : উপরোক্ত সকল শর্ত স্বভাবগত। আবশ্যকীয় নয়। তাই এগুলি ছাড়াও দীদার হতে পারে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার দীদার সম্ভব।[২৮]

দলীল : হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলেন, رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার দীদার করান, আমি আপনার দীদারের আগ্রহী।

এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলার দীদার সম্ভব। কেননা, দীদার সম্ভব না হলে, হযরত মূসা আ.এর এই আবেদন দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো হযরত মূসা আ.এর জানা ছিলো না যে, দীদার অসম্ভব। হঠাৎ আবেদন করে বসেন। এর দ্বারা একথা আবশ্যক হবে যে, তিনি এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সম্ভব, আর কোনটি অসম্ভব। কোনটির আবেদন করা উচিত, আর কোনটির আবেদন করা উচিত নয়। আর যদি হযরত মূসা আ. জানতেন যে, দীদার অসম্ভব, তাহলে তার এই আবেদন অনর্থক কাজ এবং অসম্ভব জিনিসের আবেদন হবে। আর হযরত মূসা আ. উল্লিখিত উভয় বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন। বুঝা গেলো, দীদার সম্ভব।

আখেরাতে দীদার : মু'তাযালা ও খারেজীরা বলে, আখেরাতেও আল্লাহ তা'আলার দীদার সম্ভব নয়।[২৯]

দলীল : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ এই আয়াত ইত্যাদি। (এর জবাব পূর্বে দেওয়া হয়েছে) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব হলো, মুমিনগণ

---

[২৮]. ফতহুল মুলহিম : ১/৩৪২।

[২৯]. ফতহুল মুলহিম : ১/৩৪২।

আখেরাতে (জান্নাতে) আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

দলীল : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং নিজ রবকে দেখবে।[৩০]

হাদীস শরীফে আছে,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

"নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখো।"[৩১] এছাড়াও বহু আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা জান্নাতে দীদারের প্রমাণ মিলে।

নীচে এমন কিছু ইখলাফী মাসআলার আলোচনা করা হচ্ছে, সেগুলির সম্পর্ক অন্যান্য অধ্যায় (যেমন, রোযা অধ্যায়, যাকাত অধ্যায় ইত্যাদির) সাথে। তবে এগুলির আলোচনা ঈমান অধ্যায়ে কোনো হাদীসে অধীনে এসে গেছে। তাই আমরাও এখানে উল্লেখ করছি।

التَّوْبَةُ بَعْدَ الْحَدِّ

হদ লাগানোর পর তাওবা

হদ লাগানোর দ্বারাই কি গুনাহ মাফ হয়ে যায়, নাকি এরপর তাওবাও করতে হয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : তিনি বলেন, হদ লাগানোর পর তাওবার প্রয়োজন নেই।

দলীল : কুরআনের আয়াত, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ (অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ থেকে ভুলক্রমে হত্যা পাওয়া যায়, তার

---

৩০. সূরা কিয়ামাহ : ২২ ও ২৩।

৩১. জামে তিরমিযী : ২/৮২।

কারণে) দুই মাস লাগাতার রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওবা হিসেবে।

বুঝা গেলো, রোযা রাখার পর তাওবা করার প্রয়োজন নেই। বরং রোযাই তাওবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে আছে, فهو كفارة ذنبه অর্থাৎ হদই তার গুনাহের কাফ্ফারা।[৩২] প্রমাণ হলো, ভিন্নভাবে তাওবার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আযম রহ.: তিনি বলেন, হদ লাগানোর দ্বারা শুধু দুনিয়াবী অপরাধের সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ এখন তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারী ও চোর বলে ডাকা হবে না। তবে আখেরাতে এখনো গুনাহ বাকি আছে। সেখানে মাফ করানোর জন্য তাওবা জরুরী।

দলীল-১ : কুরআনের আয়াত, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا এরপর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি যুলুমের পর তাওবা করে এবং সংশোধন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।" তাওবার এই নির্দেশ হদ তথা হাত কাটার বিধানের পর দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, হদের পর (যেই গুনাহের কারণে হদ লাগানো হলো তার জন্য) তাওবাও জরুরী।

দলীল-২ : হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সামনে চুরির কথা স্বীকার করেছে। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি লোকটিকে বললেন, قل استغفر الله واتوب اليه। "তুমি বলো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাওবা করি।"

---

৩২. জামে তিরমিযী : ২/৯০।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তার তাওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন।[৩৩]

প্রমাণ হলো, গুনাহ ক্ষমা হওয়ার জন্য শুধু হদ যথেষ্ট নয় বরং এরপর তাওবাও জরুরী। নতুবা হদ লাগানোর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে দিয়ে তাওবা করাতেন না।

[আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, মৌখিক তাওবা জরুরী নয়। বরং আমলী তাওবা পাওয়া গেলেও ক্ষমা হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে অপরাধে শাস্তি হয়েছে সেটা আর করলো না। এটাই আমলী তাওবা। অনুবাদক]

حكم تارك الصلاة

নামায বর্জনকারীর বিধান

এক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায়।[৩৪]

ইমাম আহমদ : তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃত নামায বর্জনকারী কাফের ও মুরতাদ। আর মুরতাদের শাস্তি হত্যা। তাই নামায বর্জনকারীকে কুফর ও মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **ইমাম মালেক** রহ. : তারা বলেন, নামায বর্জনকারী কাফের হয় না। মুমিনই থাকে। তবে তার বিচার হবে। তার শাস্তি হত্যা। তাহলে এদের দৃষ্টিতেও নামায পরিত্যাগকারীকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে।

ইমাম আযম : তিনি বলেন, এমন ব্যক্তিকে তিনদিন পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী রেখে সুযোগ দেওয়া হবে। সে যদি এই দিনগুলিতে তাওবা করে এবং নামায শুরু করে তাহলে ভালো। নতুবা তাকে এত বেশি মারা হবে যাতে সে রক্তাক্ত হয়ে যায়। এটাই গ্রহণযোগ্য ও মধ্যম মাযহাব।

---

[৩৩]. তহাবী শরীফ : ২/৯৬, ইযাহুল বুখারী : ১/২৫০।

[৩৪]. ইযাহুল বুখারী : ১/৩১৬।

مَسْئَلَةُ قَضَاءِ التَّطَوّعِ

নফলের কাযার মাসআলা

নফল ইবাদত শুরু করার পর তা পূর্ণ করা এবং যদি মাঝে কোনো ওযরের কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাযা ওয়াজিব হবে কি না?

ইমাম আযম : তার মতে নফল ইবাদত শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। কোনো কারণে মাঝে নষ্ট হয়ে গেলে কাযাও ওয়াজিব।[৩৫]

দলীল : কুরআনের আয়াত لَا تُبْطِلُوا أعمالكم ও وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ "তোমাদের আমলকে বাতিল করো না। তাদের মান্নাত পূর্ণ করা উচিত।"

প্রথম আয়াতটি স্পষ্ট দলীল। আর দ্বিতীয় আয়াত থেকে দলীল এভাবে যে, এখানে বলা হয়েছে নিজেদের মান্নাতগুলি পূর্ণ কর। আর নফল ইবাদত শুরু করলে মান্নাত হয়ে যায়। তাই তা পূর্ণ করাও জরুরী হয়ে যায়। আর একটি মূলনীতি আছে, যে ইবাদত পূর্ণ করা জরুরী হয়, তা মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেলে কাযা আবশ্যক হয়। বুঝা গেলো নফল ইবাদতের কাযা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : তিনি বলেন, নফল ইবাদত শুরু করার পর পূর্ণতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং মাঝে কোনো ওযরের কারণে নষ্ট হয়ে গেলে তা কাযা করা ওয়াজিব নয়।

দলীল : ঐ হাদীস দলীল যাতে উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলতেন।[৩৬] এর দ্বারা বুঝা যায়, নফল ইবাদত শুরু করে পূর্ণ করা জরুরী নয়।

জবাব : হাদীসে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর রোযা ভাঙ্গার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি রোযার কাযা করেছেন কি না

---

৩৫. ইযাহুল বুখারী : ১/৩৯৮।

৩৬. সুনানে নাসায়ী, রোযা অধ্যায়, ইযাহুল বুখারী : ১/৩৯৮।

হাদীসে তার উল্লেখ নেই। তবে উল্লেখ না থাকার দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, তিনি এর কাযা করেননি। বরং প্রবল সম্ভাবনা তিনি অবশ্যই এর কাযা করেছেন। যেমন অন্য হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, যখনি কোনো ব্যক্তি নফল ইবাদত ভেঙ্গে ফেলতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কাযা আদায় করার প্রতি জোর দিতেন। সুতরাং হযরত উম্মে সালমা রাযি. নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, تقضى يوما مكانه অর্থাৎ এর স্থানে একদিন কাযা রোযা রাখো।[৩৭] এই জাতীয় হাদীসের আলোকে বলা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ঐ রোযার অবশ্যই কাযা করেছেন। তাই উক্ত হাদীস দ্বারা কাযা ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণ করা সঠিক নয়।

যৌথ দলীল : এই মাসআলায় উভয় দল অন্য একটি হাদীস পেশ করে এবং উভয় দলই তা দ্বারা দলীল দেয়। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। হাদীসের সারমর্ম হলো, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গ্রাম্যলোককে কিছু ফরয বিধানের শিক্ষা দিলেন। সর্বপ্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বললেন। লোকটি বললো, এছাড়াও আমার ওপর কি কোনো ফরয নামায আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إلا أن تطوع এরপর অন্য ফরযের কথা বললেন। এরপরও লোকটি একই প্রশ্ন করলো। তিনি প্রতিবার একই উত্তর দিলেন, إلا أن تطوع ।[৩৮]

এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করার ভিত্তি হলো, ইসতিছনার আলোচনার ওপর। তাই প্রথমে استثناء সম্পর্কে কিছু কথা উদ্ধৃত করছি।

استثناء দুই প্রকার : استثناء متصل এর উদ্দেশ্য হলো, মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহুর প্রকার থেকে হবে। যেমন- جاء القوم الا زيدًا

---

৩৭. দারাকুতনী, ইযাহুল বুখারী : ১/৪০০।

৩৮. সহীহ মুসলিম : ১/৩০।

استثناء منقطع এর উদ্দেশ্য হলো, মুসতাছনা মুসতাছনা মিনহুর প্রকার থেকে না হওয়া। جاء القوم الا حمارًا

ইমাম শাফেয়ী : তিনি বলেন, হাদীসে নফলকে ফরয থেকে মুসতাছনা করা হয়েছে। আর এই استثناء হলো استثناء منقطع অতএব উদ্দেশ্য হলো, নফল ইবাদত ফরযের মতো নয়। বরং তার বিপরীত। অর্থাৎ ফরয শুরু করার পর যেমন পূর্ণ করা জরুরী, মাঝে নষ্ট হয়ে গেলে কাযা আবশ্যক। নফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। শুরু করার পর পূর্ণতায় পৌঁছানো জরুরী নয়। মাঝে নষ্ট হয়ে গেলে কাযা ওয়াজিব নয়।

জবাব : استثناء এর ক্ষেত্রে মূল হলো মুত্তাসিল। মুনকাতি মূল নয়। আর মূল বাদ দিয়ে মূল নয় বিষয় তখনই উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যখন এর পক্ষে দলীল পাওয়া যায়। আর এখানে সঠিক দলীল পাওয়া যায়নি। তাই মুনকাতি উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হবে না।

ইমাম আযম রহ. : তিনি বলেন, এখানে استثناء দ্বারা متصل উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নফল ফরযের প্রকার থেকে। সুতরাং যেমন ফরয শুরু করলে পূর্ণ করতে হয় এবং মাঝে নষ্ট হয়ে গেলে কাযা আবশ্যক হয়। তেমনি নফলও শুরু করার পর পূর্ণ করা আবশ্যক এবং মাঝে নষ্ট হয়ে গেলে কাযা ওয়াজিব।

الكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ بِالْفُرُوْعِ أَمْ لَا

কাফেররা শাখাগত মাসআলার মুখাতাব কি না?

কাফেররা শাখাগত বিষয় অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির ফরয হওয়া বিশ্বাস করা এবং তা আদায় করার মুকাল্লাফ হবে কি? এই মাসআলায় হানাফিদের তিন দল।

প্রথম দল : মা ওরাউন নাহাবের কিছু মাশায়েখ এবং সমরকন্দের মাশায়েখ বলেন, কাফেররা শাখাগত বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস রাখার মুখাতাবও নয়, আমল করার মুখাতাবও নয়।

দ্বিতীয় দল : মা ওরাউন নাহারের অন্য কিছু মাশায়েখ ও বোখারার মাশায়েখগণ বলেন, তারা বিশ্বাস রাখার মুকাল্লাফ। আমল করার মুকাল্লাফ নয়।

তৃতীয় দল : ইরাকের হানাফীরা যারা শাফেয়ী ও মালেকীদের সাথে। তারা বলেন, কাফেররা শাখাগত বিষয় বিশ্বাস রাখা ও আমল করা দুটিরই মুকাল্লাফ।

দলীল : হানাফীদের যেই দুই দল কাফেরদেরকে শাখাগত বিষয়ের মুকাল্লাফ মানে না, তারা এই দলীল পেশ করে যে, কাফেররা যদি নামায, রোযা ইত্যাদির পালন করার মুকাল্লাফ হতো, তাহলে এগুলি পালন করার দ্বারা পালন হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। অথচ কাফের নামায রোযা আদায় করার দ্বারা আদায় হয় না। অতএব বুঝা গেলো, তারা এসব জিনিসের মুকাল্লাফ নয়।

জবাব : তাদের দলিলের জবাব হলো, শুদ্ধ না হওয়ার কারণে মুকাল্লাফ না হওয়া আবশ্যক নয়। অর্থাৎ তারা আদায় করার দ্বারা এই কাজগুলি আদায় হয় না। তাই তারা মুকাল্লাফ হবে না, এটা আবশ্যক নয়। যেমন, জুনুবী ব্যক্তি জানাবতের অবস্থায় নামায আদায় করে তাহলে নামায আদায় হয় না। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তারা নামাযের মুকাল্লাফ নয়। সে মুকাল্লাফ। এভাবে কাফেররা আদায় করার দ্বারা যদিও আদায় হয় না তবুও তারা মুকাল্লাফ।

জামহুরের দলীল : ইরাকের হানাফীরা এবং শাফেয়ী ও মালেকীদের দলীল হলো, কাফেররা যদি শাখাগত মাসআলা বিশ্বাস করা ও আমল করার মুকাল্লাফ না হতো, তাহলে তারা আমল না করার কারণে বিভিন্ন ধমকি আসতো না। অথচ পবিত্র কুরআনে আছে,

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

"ঐ মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত পরিশোধ করে না।" অন্যত্র আছে, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى "বিশ্বাস করেনি নামায আদায় করেনি।"

তাদেরকে ইবাদাতের নির্দেশও দেওয়া হতো না। অথচ কুরআনে আছে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ এখানে النـاس শব্দের মধ্যে কাফেররাও অন্তর্ভুক্ত। বুঝা গেলো, কাফেররা শাখাগত মাসআলার মুখাতাব এবং মুকাল্লাফ। আর এটাই সঠিক মাযহাব।

نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তর করা

এক শহরের যাকাত অন্য শহরের লোকদেরকে দেওয়া জায়েয কি না? শাফেয়ী ও মালেকীদের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

দলীল : মু'আয রাযি. থেকে বর্ণিত:

إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের ফকিরদেরকে দেওয়া হবে।"[৩৯]

বুঝা গেলো, অন্য শহরের ফকিরদের দেওয়া জায়েয নেই।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে اغنيـائهم ও فقـرائهم এর মধ্যে هـم জমিরের মারজা শহরবাসী নয়। বরং মুসলমান। হাদীসের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। যা মুসলমানদের ধনীদের থেকে নিয়ে মুসলমানদের ফকিরদের মাঝে বণ্টন করা হবে। জানা গেলো, উদ্দেশ্য হলো মুসলিম ফকির পর্যন্ত পৌঁছা। এবার চাই তারা ঐ শহরের হোক কিংবা অন্য শহরের (আইনী)। ইমাম

---

[৩৯]. সহীহ মুসলিম : ১/৩৬, সহীহ বুখারী : ১/২০৩, জামে তিরমিযী : ১/১৩৬, শব্দ বুখারী শরীফের।

আযম আবু হানিফা এবং অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, এক শহরের যাকাত অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া জায়েয।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি আশপাশের যাকাত মদীনায় নিয়ে আসতেন। যা একথার স্পষ্ট দলীল যে, এক জায়গার যাকাত অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া জায়েয। কেননা, না জায়েয হলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো করতেন না।

ثُبُوْتُ الرَّضَاعَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দুধ সম্পর্ক প্রমাণ হওয়া

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ার জন্য কতজন সাক্ষীর প্রয়োজন?

ইমাম আহমদ : তিনি বলেন, দুগ্ধদানকারী মা যদি একাই বলে যে, আমি এই দুইজনকে দুধপান করিয়েছি। তাহলে দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং তাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।

দলীল : হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু দুগ্ধদানকারী মায়ের স্বামীর ওপর ভিত্তি করে হযরত ওকবা বিন হারেস এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ করে দেন। যা একথার স্পষ্ট দলীল যে, দুগ্ধদানকারী মায়ের একার সাক্ষী দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

জবাব : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এই সমাধান ঐ দুইজনকে বদনাম থেকে বাঁচানোর জন্য ছিলো। অর্থাৎ একটি কথা যখন মানুষের মুখে এসে গেছে, তাহলে এর থেকে বাঁচাই ভালো। সেকথা ভুল হলেও।

তিন ইমাম : তারা বলেন, দুগ্ধদানকারী যেহেতু দুধপান করানোর বিনিময় পায়, তাই শুধু দুগ্ধদানকারী মায়ের কারো সম্পর্কে একথা বলা যে, আমি তাকে দুধপান করিয়েছি এর অর্থ হলো, তার ওপর আমার

বিনিময় আবশ্যক। এটা লেনদেনের মাসআলা। আর লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার সাক্ষী জরুরী।

বিশ্লেষণমূলক কথা : যদিও বিচারের ক্ষেত্রে একা দুগ্ধদানকারীর বলা দ্বারা দুধ সম্পর্ক প্রমাণিত হবে না, তবে দীনদারীর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ রহ. দীনদারীর দিক দিয়ে ফত্ওয়া দিয়েছেন। আর তিন ইমাম বিচারের দিক লক্ষ করেছেন।

ঈমান অধ্যায়ের আনুষাঙ্গিক বাহাস শেষ হলো। এখন পবিত্রতা অধ্যায় ও নামায অধ্যায় ইত্যাদির বাহাস আলোচনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে ফিকহের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের পাশাপাশি সিহাহ কিতাবগুলির আরবী শরাহসমূহের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হযরতুল উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা)এর তিরমিযী শরীফের দরস থেকেও বিশেষ সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।[৪০]

---

৪০. সংকলক।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

তহারাত অধ্যায়

طَهَارَةُ الْمَاءِ وَنَجَاسَتُهُ

পানি পাক ও নাপাকের বিষয়

জাহেরিয়া : তারা বলে, পানি অল্প হোক কিংবা বেশি হোক নাপাকি পড়ার দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নাপাকি পানির ওপর প্রবল না হয়।

ইমাম মালেক : তিনি বলেন, পানি কম হোক কিংবা বেশি হোক নাপাকি পড়ার দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিন গুণ (রং, গন্ধ, স্বাদ) থেকে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন না হবে।

তিন ইমাম : তারা বলেন, পানি অল্প হলে, নাপাকী বস্তু পড়ার সাথে সাথে নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি বেশি হয় তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হয় না, যতক্ষণ পযন্ত না কোনো একটি গুণ পরিবর্তন না হয়ে যায়। তিন ইমামের মাঝে কম ও বেশির মাপকাঠির মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে গেছে। অল্প পানির পরিমাণ কী? আর বেশি পানির পরিমাণ কী? অর্থাৎ কী পরিমাণ পানিকে অল্প বলা হবে, আর কী পরিমাণকে বেশি বলা হবে?

সুতরাং ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যে পানি কুল্লাতাইন থেকে কম হবে, তা কম পানি। আর যা কুল্লাতাইন বা কুল্লাতাইনের চেয়ে বেশি হবে, তা বেশি পানি।

হানাফী মাযহাবে কম ও বেশির মাপকাঠির ক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায়। যার একটি হলো, যদি এতটুকু পানি হয় যে, একপাশে নাড়া দিলে অপর পাশের পানি নড়ে, তাহলে অল্প পানি। আর অপর পাশ না নড়লে বেশি পানি।

ইমাম মালেক রহ.এর দলীল : তাঁর দলীল হলো, বোযা'আ কূপ সংক্রান্ত হাদীস। যাতে আছে, اَلْمَـاءُ طَهُـوْرٌ لَا يُنَجِّـسُهُ شَـيْئٌ অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পানি পাক, তা কোনো জিনিস নাপাক করে না।

উক্ত হাদীসে অল্প ও বেশি পানির মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সকল পানির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, তা নাপাক হয় না। এটা আমাদেরও কথা যে, শুধু নাপাক পড়ার দ্বারা পানি নাপাক হয় না। কম হোক কিংবা বেশি হোক। তবে গুণ পরিবর্তনের বিষয়টি আমরা এজন্য বৃদ্ধি করেছি যে, দারা কুতনীর হাদীসে অতিরিক্ত আছে,

إلاَّ مَا غَلَبَ عَلٰى طَعْمِه أَوْلَوْنِه أَوْرِيْحِه

অর্থাৎ তবে যে নাপাকী পানির স্বাদ, রং ও গন্ধের ওপর প্রবল হবে।

জবাব : উক্ত হাদীসের বিধান বুযা'আ কূপের জন্য বিশেষ ছিলো। আর বুযা'আ কূপের পানি প্রচুর ব্যবহারের কারণে চলন্ত পানির হুকুমে ছিলো। আর চলন্ত পানি নাপাক বস্তু পড়ার দ্বারা নাপাক হয় না। তাই উক্ত হাদীসের কারণে অন্য পানির ক্ষেত্রে এমন হুকুম লাগানো সহীহ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **ইমাম আহমদ** রহ.**এর দলীল**

তারা কুল্লাতাইন সংক্রান্ত হাদীসটি পেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ

অর্থাৎ পানি যখন দুই কুল্লা হবে, নাপাকী দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বুঝা গেলো, দুই কুল্লা পানি বেশি। আর এর কম হলে কম বলে গণ্য হবে।

জবাব : কুল্লাতাইনের হাদীসের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন– ১. হাদীসটি মুযতারাব। সনদ ও মতন উভয়টির মধ্যে ইযতিরাব আছে। ২. হাদীসটি অস্পষ্ট। কেননা, কুল্লা শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন : মানুষের দেহের উচ্চতা, পাহাড়ের চূড়া, মটকা ইত্যাদি। জানা নেই যে, হাদীসে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩. হাদীসটি মুআওয়াল তথা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অর্থাৎ হাদীসটির উদ্দেশ্য এটা নয় যে, পানি

এই পরিমাণ হলে নাপাকী দ্বারা প্রভাবিত হবে না। বরং উদ্দেশ্য হলো, পানি দুই কুল্লা হলে নাপাকী সহ্য করতে পারে না। (নাপাক হয়ে যায়)

হানাফীদের দলীল : হাদীসে আছে,

لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে।[৪১]

এই হাদীসে স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে যে, পেশাব করে পানি নাপাক না করা হোক। লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। সে স্থির পানি দুই কুল্লাও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। বুঝা গেলো, কুল্লাতাইন কম ও বেশির মাপকাঠি নয়। কেননা, তা যদি বেশি হতো নাপাক হতো না। এবং তিনি এটাকে এই বিধান থেকে বাদ দিতেন। কিন্তু তিনি বাদ দেননি।

দলীল ২ :

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِيْ الإِنَاءِ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তার হাতকে পাত্রে প্রবেশ করাবে না।[৪২]

উক্ত হাদীসে ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে পানিতে ঢুকাতে নিষেধ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, হাতে কোনো নাপাক বস্তু লেগে থাকতে পারে। হাত না ধুয়ে পানিতে দিলে সে নাপাকী পানিতে চলে যাবে। আর পানি নাপাক হয়ে যাবে। এবার চিন্তা করুন, নাপাকীর সম্ভাবনার কারণে হাত না ধুয়ে পানিতে হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে আসল নাপাকীর দ্বারা পানি অবশ্যই নাপাক হবে।

---

[৪১]. জামে তিরমিযী : ১/২১, মাআরেফুস সুনান : ২৩৯।

[৪২]. জামে তিরমিযী : ১/১৩।

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ

মুস্তা'মাল পানি

ব্যবহৃত পানি (অর্থাৎ উযু এবং জানাবাতের গোসলের সময় শরীর বেয়ে নীচে পড়া পানি) পবিত্র ও পবিত্রকারী কি না?

ইমাম মালেক রহ. : তিনি বলেন ব্যবহৃত পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী।

দলীল : কুরআনে পানিকে তহুর বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا আর طهور শব্দটি فعول এর ওযনে মুবালাগার ছিগা। যার অর্থ হলো বারবার পবিত্রকারী। যেমন- قطوع শব্দের অর্থ বারবার কর্তনকারী। তাই কোনো পানি দিয়ে একবার হুকমী নাপাকী দূর করলে তাহলে তা তারপরও পাককারী থাকবে এবং এর দ্বারা দ্বিতীয়বারও পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। যেমনটি- طهور শব্দটি বুঝায়। আর যে জিনিস পাককারী তা অবশ্যই পাক। সুতরাং প্রমাণ হলো, ব্যবহৃত পানি পাক ও পাককারী।

জবাব : طهور শব্দটি মুবালাগার ছিগা এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মুবালাগা দ্বারা মুবালাগা ফিল ফেয়েল (অর্থাৎ বারবার পবিত্রকারী) উদ্দেশ্য নয়। বরং মুবালাগা ফিল ওয়াসফ (অর্থাৎ খুব বেশি পাককারী) উদ্দেশ্য।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : তিনি বলেন, ব্যবহৃত পানি পাক তো বটে পাককারী নয়। হানাবেলা ও হানাফীদের ফত্ওয়ার উক্তি এটাই।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির পানিতে যেভাবে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন, তেমনি জানাবাতের গোসল করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, জানাবাতের গোসলের পর সে পানি (ব্যবহৃত পানি) দ্বিতীয়বার ব্যবহারের যোগ্য থাকে না এবং পানির গুণের মধ্যে ক্ষতি এসে যায়। এ কারণেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। নতুবা যদি কোনো ক্ষতি না আসতো এবং পূর্বের মতো পাক ও পবিত্রকারী থাকতো তাহলে তিনি তাতে গোসল করতে কেন নিষেধ করবেন। তাই প্রমাণ হলো (কোনো অঙ্গে শরীরী নাপাকী না থাকার কারণে) উযু ও গোসলে ব্যবহার হওয়া পানি পাক তো থাকে, তবে তা দিয়ে দ্বিতীয়বার পবিত্রতা অর্জনের যোগ্য থাকে না।

مَزِيْلُ النَّجَاسَةِ

নাপাকী দূরকারী

পানি ছাড়া অন্য প্রবাহমান বস্তু দিয়ে কি নাপাকী দূর করা যায়?

জামহুর : তারা বলেন, পানি ছাড়া অন্য তরল বস্তু দিয়ে নাপাকী দূর করা যায় না।

ইমাম আযম রহ. : তিনি বলেন, হাদাস দূর করার জন্য তো পানি নির্দিষ্ট আছে, বাকি শরীরী নাপাকী দূর করার জন্য পানি ছাড়া অন্য বস্তু দিয়েও জায়েয আছে।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর সেই হাদীস, যাতে থুথু দিয়ে হায়েযের রক্ত দূর করার কথা উল্লেখ আছে।[৪৩]

مَاءُ الْبَحْرِ وَحَيْوَانَاتُه

সাগরের পানি ও তার জীব

১. সাগরের পানি দিয়ে উযু করা বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সামান্য ইখতিলাফ ছিলো। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাগরের পানি দিয়ে উযু করা মাকরূহ মনে করতেন। আর এটা না জায়েয হওয়ার ওপর দলীল হিসেবে এই হাদীস

---

[৪৩]. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫২।

পেশ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাজী, ওমরাকারী ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ছাড়া আর কেউ সাগর পথের সফর করবে না। কেননা সাগরের নীচে আগুন আছে।[৪৪] সুতরাং তারা বলেন, সাগরের পানি দিয়ে উযু করা জায়েয নেই। কেননা তার নীচে আগুন আছে। তবে এখন এ বিষয়ে আর ইখতিলাফ নেই। ইজমায়ী মাসআলা হয়ে গেছে।

২. সাগরের কোন জন্তু হালাল এবং কোন জন্তু হারাম?

ইমাম মালেক রহ. : তিনি বলেন, শূকর ছাড়া সাগরের সকল জীব খাওয়া হালাল।

দলীল : শূকর হারাম হওয়ার ওপর কুরআনের আয়াত পেশ করে থাকেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

"তোমাদের জন্য মৃত ও শূকরের গোশত হারাম করা হয়েছে।"

আর অন্যান্য জীব হালাল হওয়ার ওপর দলীল পেশ করেন যে, কুরআনে আছে أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ "তোমাদের জন্য সাগরের শিকারী হালাল করা হয়েছে।" এখানে শিকারী মুতলাক রাখা হয়েছে। যার মধ্যে কোনো কিছুকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাই শূকর ছাড়া সামুদ্রিক সকল জীব হালাল।

জবাব : এখানে صيد শব্দ থেকে জীব উদ্দেশ্য নয়। বরং صيد শব্দটি মাসদারের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ শিকার করা। আর উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের জন্য সাগরের শিকার করা জায়েয। তবে জীবসমূহের মাসআলার ক্ষেত্রে কোনটি ভক্ষণ করা জায়েয, কোনটি জায়েয নয়। এ ব্যাপারে আয়াতে কিছু উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা

---

৪৪. সুনানে আবু দাউদ : জিহাদ অধ্যায়।

হয়েছে, শিকার করা জায়েয আছে। তাই এই আয়াত দিয়ে সামুদ্রিক জীব হালাল হওয়া প্রমাণ করা ঠিক নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : তিনি বলেন, ব্যাঙ ছাড়া সাগরের সকল জীব হালাল।[৪৫]

দলীল : ব্যাঙ হারাম হওয়ার বিষয়টি ঐ হাদীস থেকে উদঘাটন করা হয়েছে, যাতে ব্যাঙ মারা নিষেধ এসেছে। অন্য জীবসমূহ হালাল হওয়ার পক্ষে একটি দলীল পেশ করে থাকে যেটা জবাবসহ উপরে অতিবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় দলীল হলো, হাদীস শরীফ الحل ميتته "তার মৃত হালাল।" লক্ষ করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাগরের মরা জীব খাওয়া হালাল করেছেন।

জবাব : হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. الحل ميتته এই হাদীসের অত্যন্ত সহীহ জবাব দিয়েছেন। তা হলো الحل শব্দ দ্বারা হালাল উদ্দেশ্য নয়। যার দ্বারা আপনারা মৃত হালাল হওয়া প্রমাণ করছেন। বরং এখানে الحل শব্দটি الطاهر তথা পাক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সাগরের মরা পাক। (অর্থাৎ নাপাক হয় না যে, যার কারণে পানি পাক নাপাক হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করা হবে।)

ইমাম আহমদ রহ. : তিনি বলেন, ব্যাঙ, কুমির ও কচ্ছপ ছাড়া সামুদ্রিক সকল জীব হালাল। দলীল প্রায় সেগুলিই যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।[৪৬]

ইমাম আযম : তিনি বলেন, সাগরের জীব জন্তুর মধ্যে শুধু মাছ হালাল। আর বাকি সকল জীব হারাম। আর মাছের মধ্যে তফী না হতে

---

[৪৫]. ইমাম নভভী রহ.।

[৪৬]. অধিক বিস্তারিত আলোচনার জন্য মীযানু কিতাবিল আতইমা : ২/৫২ শা'রানী কিতাব দ্রষ্টব্য।

হবে। যদি তফী হয় (অর্থাৎ স্বভাবগত মারা গিয়ে ভেসে উঠে) তাহলে তা হারাম।[৪৭]

দলীল– ১ : কুরআনের আয়াত وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থাৎ তাদের ওপর খবীস জিনিস হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আর মাছ ছাড়া সাগরের সকল জীব খবীস। কেননা, খবীস বলে, মানবস্বভাব যা ঘৃণা করে। আর মাছ ছাড়া সাগরের অন্যান্য জীব সম্পর্কে স্বভাবে ঘৃণা অনুভূত হয়। তাই সবগুলি খবীসের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল– ২ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ "তোমাদের ওপর মৃত হারাম করা হয়েছে। এর দ্বারাও বুঝা যায়, সকল মৃত হারাম। তবে ঐ মৃত ব্যতীত যা শরয়ী দলীল দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে। আর সামুদ্রিক জীবের মধ্যে শুধু মাছ বিশেষায়িত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসে আছে– أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ "আমাদের জন্য দুই মৃত হালাল করা হয়েছে। মাছ ও পঙ্গপাল। আর তফী মাছের কথা আবু দাউদ শরীফের হাদীসে এসেছে। তাতে এভাবে এসেছে, مَنْ مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوْهُ "যা সাগরে স্বভাবগত মরে ভেসে উঠেছে তা খেও না।"

حُكْمُ النَّبِيْذِ

নাবীযের বিধান

বিধানের দিক দিয়ে নাবীয তিন প্রকার।

১. খেজুর অল্প সময় পানিতে ভিজিয়ে তুলে ফেলা হবে। এখন পর্যন্ত পানি মিষ্টিও হয়নি।

   বিধান : এর দ্বারা উযু করা সকলের ঐকমত্যে জায়েয আছে। কেননা, বাস্তবে এটা নাবীযই হয়নি।

---

[৪৭]. আবু দাউদ : ২/৩২, ইবনে মাজাহ : ২৩৪।

২. খেজুর পানিতে এত দীর্ঘ সময় ভিজানো হবে যে, পানি পরিবর্তন হয়ে গেছে। তীব্রতা, তেজী, ফেনা ও নেশা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

বিধান : এমন নাবীয দ্বারা সর্বসম্মতক্রমে উযু নাজায়েয।

৩. খেজুর এত দীর্ঘ সময় পানিতে রাখা হবে যে, শুধু মিষ্টি হয়েছে। ফেনা, নেশা ও তেমনি তীব্রতা আসেনি।

বিধান : এই নাবীযে ইখতিলাফ আছে যে, এর দ্বারা উযু জায়েয আছে কি না?

ইমাম আযম রহ. : তিনি বলেন, এমন নাবীয দ্বারা উযু করা জায়েয। এমন নাবীয থাকতে তায়াম্মুম করার অনুমতি নেই। ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, এমন নাবীয দিয়ে উযুও করবে, তায়াম্মুমও করবে।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. কর্তৃক বর্ণিত লাইলাতুল জ্বীন সংক্রান্ত হাদীস। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের নাবীয দিয়ে উযু করার কথা আছে। আর তিনি বলেছেন, تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ "খেজুরও পাক পানি ও পাক।" এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আযম রহ. খেজুরের নাবীয দিয়ে উযু বৈধ হওয়ার কথা বলেছিলেন।

জবাব : তিন ইমাম উক্ত হাদীসকে দুর্বল বলেছেন এবং এই হাদীসের ওপর অনেক আপত্তি করেন। হানাফীরা যার কিছু কিছু জবাবও দিয়েছেন। তিন ইমাম বলেন, এমন নাবীয দিয়ে উযু করা জায়েয নেই। এই নাবীয ছাড়া অন্য পানি না থাকলে তায়াম্মুম করবে। নাবীয দিয়ে উযু করবে না। ইমাম আবু ইউসূফ রহ.এর মতও এটাই।

ফায়েদা-১ : এই ইখতিলাফ শুধু খেজুর দিয়ে বানানো নাবীযের ক্ষেত্রে। খেজুর ছাড়া অন্য বস্তু দিয়ে বানানো নাবীয দিয়ে সর্বসম্মতক্রমে উযু জায়েয নেই।

ফায়েদা-২ : ইমাম আযম রহ.এর প্রথমে উক্ত মত ছিলো। তবে পরবর্তীতে জামহুরের মতের পক্ষে মত ব্যক্ত করার কথা প্রমাণিত আছে।[৪৮]

سُؤْرُ الْكَلْبِ

কুকুরের উচ্ছিষ্ট

১. কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাক নাকি নাপাক?

ইমাম মালেক রহ.এর মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাক। তবে যেই পাত্রে কুকুর মুখ দিবে সে পাত্র ধোয়া তার মতে ওয়াজিব।

তিন ইমাম : তাদের মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। আর কুকুর মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়া ওয়াজিব।

দলীল : কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার ওপর তিন ইমাম এই হাদীস পেশ করে থাকেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَه سَبْعَ مَرَّاتٍ

"তোমাদের যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে তার পবিত্রতা হলো, তা সাতবার ধৌত করা।[৪৯] এই পাত্র ধৌত করার বিধান পবিত্রতার জন্য। আর ঐ বস্তুকে পাক করা হয়, যা নাপাক হয়। বুঝা গেলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক, আর যে পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তাও নাপাক হয়ে যায়।

---

[৪৮]. আল বাদায়ে : ১/১৫, মাআরেফুস সুনান : ১/৩১০।

[৪৯]. সুনানে আবু দাউদ : ১/১০, সহীহ মুসলিম : ১/১৩৭।

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيْرِ الإِنَاءِ

পাত্র পাক করার পদ্ধতি

২. দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কুকুরে মুখ দেওয়া পাত্র কতবার ধৌত করতে হবে? ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব। যার মধ্যে একবার মাটি দিয়ে মাঝতে হবে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব। মাটি দিয়ে মাজা মুস্তাহাব।

দলীল : তিন ইমামের দলীল এই হাদীস দ্বারা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُغْسِلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

যেই পাত্রে কুকুর মুখ দিবে তা সাতবার ধৌত করা হবে।[৫০]

তিন ইমাম বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুকুর মুখ দেওয়া পাত্র সাতবার ধোয়া জরুরী।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে সাতবার ধোয়ার বিধান ওয়াজিব হিসেবে নয়। বরং মুস্তাহাব হিসেবে। কেননা, এই হাদীসের রাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. । আর হযরত আবু হুরাইরা রাযি.এর ফত্ওয়া ও আমল উক্ত হাদীসের বিপরীত।[৫১]

যা একথার স্পষ্ট দলীল যে, উক্ত হাদীসে সাতবার ধোয়ার বিধান ওয়াজিব হিসেবে নয়। নতুবা রাবী নিজেই এর ওপর আমল করতেন। এর বিপরীত আমল করতেন না এবং এর বিপরীত ফত্ওয়া দিতেন না।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আটবার ধোয়া জরুরী। যার শেষবার মাটি দিয়ে মাজা জরুরী।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাযি.এর ঐ হাদীস যাতে এভাবে আছে,

---

৫০. জামে তিরমিযী : ১/২৭।

৫১. সুনানে দারা কুতনী : ১/২৪।

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

"কুকুর পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাজবে।"[৫২]

জবাব : এই নির্দেশ মুস্তাহাব হিসেবে। আর এর গুরুত্ব তখন বেশি ছিলো, যখন কুকুরের ব্যাপারে বেশি কঠোরতা ছিলো। এমনকি কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে ছিলো। পরবর্তীতে এই কঠোরতা তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীসে তিনবার ধোয়ার হুকুম বলা হয়েছে।

ইমাম আযম রহ. বলেন, কুকুরে মুখ দেওয়া পাত্র তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর ১ম হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিবে তাহলে সে জিনিসকে ফেলে দাও এবং পাত্রটি তিনবার ধুয়ে ফেলো।[৫৩] এর চেয়ে কম সংখ্যার কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। তাই আমরা বলেছি যে কমপক্ষে তিনবার ধোয়া ওয়াজিব, সাতবার ধোয়া মুস্তাহাব।

[উল্লেখ্য, বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের মধ্যে কুকুরের প্রতি যেমন প্রবল ভালোবাসা, ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষের মধ্যেও এমন ছিলো। সাহাবায়ে কেরাম যখন মুসলমান হলেন, তাদের কারো কারো মধ্যে কুকুরের প্রতি পূর্ব ভালোবাসা বহাল ছিলো। তাদের অন্তর থেকে এই ভালোবাসা দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌশল অবলম্বন করলেন। পর্যায়ক্রমে তিনটি বিধান দিলেন। (১) কুকুর লালন-পালন করলে দৈনিক এক কিরাত নেকী নষ্ট হয়ে যাবে। এতে

---

[৫২]. সহীহ মুসলিম : ১/১৩৭, সুনানে আবু দাউদ : ১/১০, তহাবী : ২১।

[৫৩]. নসবুর রায়া : ১/১৩১, আল আইনী : ১/৮৭৪।

অনেকে কুকুর পোষা ছেড়ে দিলেন। (২) কুকুর পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ধৌত করতে হবে। এবার আরো অনেকে কুকুর পোষা ছেড়ে দিলেন। (৩) যেখানে কুকুর পাবে হত্যা করে ফেলবে। এবার সাহাবায়ে কেরাম কুকুর একেবারে ছেড়ে দিলেন। তাদের অন্তর থেকে কুকুরের ভালোবাসা যখন চলে গেলো, দুটি বিধান শিথিল করে দিলেন। সাতবারের স্থানে তিনবার ধোয়ার বিধান দিলেন। শুধু কালো কুকুর হত্যা বিধান বহাল রাখলেন। অনুবাদক]

سُؤْرُ الْهِرَّةِ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

ইমাম আওযায়ী রহ. **বলেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক।**

দলীল : সেই হাদীস যাতে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, السنور سباع 'বিড়াল হিংস্র জন্তু।' আর হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক। বুঝা গেলো, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক।

জবাব : হাদীসটি দুর্বল। তাই এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়।[৫৪]

তিন ইমাম বলেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পূর্ণ পাক। এটা ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এরও উক্তি।

দলীল : হযরত আবু কাতাদাহ রাযি.এর হাদীস। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

"বিড়াল নাপাক নয়। কেননা তা তোমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।[৫৫] উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিড়াল

---

৫৪. নসবুর রায়া : ১/১৩৪, ১৪৫।

৫৫. আবু দাউদ : ১/১১ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট অধ্যায়।

নাপাক হওয়া নাকচ করেছেন। বুঝা গেলো বিড়াল পবিত্র জিনিস, আর যে জিনিস পবিত্র তার উচ্ছিষ্ট পাক।

জবাব : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিড়াল সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন এবং নিজের পাত্র থেকে যদি কখনো বিড়ালকে কিছু খাওয়ায়েছেন বা পান করিয়েছেন তাহলে এসব কিছু বৈধতার বর্ণনা জন্য এবং মানুষের অন্তর থেকে তা নাপাক হওয়ার সন্দেহ বের করার জন্য ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাত্র থেকে পানি পান করানোর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে তা মাকরূহে তানযিহী হতে পারে না। কেননা বৈধতার বিবরণের জন্য কখনো কখনো মাকরূহে তানযিহীর ওপর আমল করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে।[৫৬]

ইমাম আযম রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. বলেন, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। তবে মাকরূহ কোন স্তরের? ইমাম তহাবী রহ. বলেন, মাকরূহ তাহরিমী। ইমাম কারখী রহ. থেকে মাকরূহ তানযিহী উদ্ধৃত আছে। এরই উপর ফত্ওয়া।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর সে হাদীস যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

طُهُوْرُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَي فِيْهِ الْهِرُّ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً

"পাত্রে বিড়াল মুখ দিলে পবিত্র করার পদ্ধতি হলো একবার ধৌত করা।[৫৭] এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা মাকরূহ না হলে ধৌত করার মোটেই নির্দেশ দেওয়া হতো না। তাছাড়া উপরে বর্ণিত হযরত আবু কতাদা রাযি.এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিড়াল নাপাক না হওয়ার কারণ বলেছেন ঘোরাফেরা। এর উদ্দেশ্য হলো মূলে নাপাক। তবে عموم بلوى তথা

---

৫৬. মা'আরেফুস সুনান : ১/৩৩০।
৫৭. তহাবী : ১২০।

অধিক মিশ্রণের কারণে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আর এই কারণ মাকরূহে তানযিহীর ওপর বুঝায়।

سُؤْرُ الْحِمَارِ

গাধার উচ্ছিষ্ট

ইমাম শাফেয়ী রহ. **বলেন,** গাধার উচ্ছিষ্ট শুধু পাক নয়, বরং পাককারীও।

দলীল : তার একটি উসূলী মাসআলা আছে। যেই জীবের চামড়া দিয়ে উপকৃত হওয়া জায়েয় তার উচ্ছিষ্টও পাক। আর গাধার চামড়া দিয়েও যেহেতু উপকৃত হওয়া জায়েয় তাই তার উচ্ছিষ্টও পাক।

জবাব : উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক সরাসরি চামড়ার সাথে নয় যে, চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয় হলে, তার উচ্ছিষ্ট পাক বলা হবে। বরং উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক গোশতের সাথে। কেননা, গোশত থেকেই লালা সৃষ্টি হয়। আর এর গোশত নাপাক, তাই এর উচ্ছিষ্টও নাপাক।

ইমাম আযম রহ. **বলেন :** গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক।

দলীল : সেই হাদীস যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বারের দিন গাধার গোশতের পাতিল উল্টিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন।[৫৮] এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় গাধার গোশত নাপাক। আর লালা যেহেতু গোশত দিয়ে সৃষ্টি হয় তাই লালাও নাপাক। আর যেই পানিতে গাধা মুখ দিবে তাতে লালা মিশ্রিত হওয়া নিশ্চিত। তাই গাধার উচ্ছিষ্টও নাপাক হবে। তবে হাদীসের দ্বারা যেখানে গাধার গোশত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, সেখানে হালাল হওয়াও প্রমাণিত হয়। তাই দলীলসমূহের সংঘর্ষের কারণে অধিকাংশ হানাফীগণ গাধার উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত হওয়ার প্রবক্তা।

---

৫৮. সহীহ বুখারী : ২/৬০৩, খয়বার যুদ্ধ অধ্যায়।

فَضْلُ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ

মহিলা পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে থাকা পানি

মহিলা উযু বা গোসল করার পর পাত্রে যে পানি বেঁচে গেলো, তা পুরুষ ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মহিলার বাঁচা পানি পুরুষ ব্যবহার করা জায়েয নেই।

দলীল : হযরত হাকাম গেফারীর হাদীস।

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলা ব্যবহারের পর বেঁচে থাকা পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৫৯]

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে নিষিদ্ধতা থেকে মাকরূহ তানযিহী উদ্দেশ্য। আর মাকরূহে তানযিহীও জায়েযের একটি শাখা। তাই সাধারণভাবে মহিলা পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে থাকা পানি ব্যবহার করা নাজায়েয বলা ঠিক না।

[মহিলারা যেহেতু বিভিন্ন কারণে অনেক সময় ময়লা আবর্জনার মধ্যে থাকে, তাই তাদের ব্যবহৃত পানি পুরুষ ব্যবহার করতে নাপাকীর সন্দেহ করতে পারে। এ কারণে সন্দেহের থেকে বাঁচানোর জন্য নিষেধ করেছেন। অনুবাদক]

তিন ইমাম : তারা বলেন মহিলার ব্যবহারের পর বেঁচে থাকা পানি পুরুষ ব্যবহার করা জায়েয।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.এর হাদীস। যাতে হযরত মায়মুনা রাযি.এর কথা এভাবে উদ্ধৃত আছে,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ

---

[৫৯]. জামে তিরমিযী : ১/১৯।

"আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।[৬০] এই হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মহিলার ব্যবহারের পর বেঁচে থাকা পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয।

عَدَدُ الْأَحْجَارِ فِيْ الْإِسْتِنْجَاءِ

ইস্তিঞ্জাতে ব্যবহারিক পাথরের সংখ্যা

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. : বলেন, ইস্তিঞ্জাতে انقاء (স্থান ভালোভাবে পরিস্কার করা) এবং تثليث তথা তিন পাথর ব্যবহার ওয়াজিব।

দলীল : হযরত সালমান ফারসী রাযি.এর হাদীস। যাতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। সেখানে এটাও নিষেধ করেছেন যে,

أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ أَحْجَارٍ

"আমাদের কেউ তিন পাথরের কম দিয়ে যেন ইস্তিঞ্জা না করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.কে বলেছেন,

التمس لى ثلاثة أحجار

"আমার জন্য তিনটি পাথর খুঁজে নিয়ে এসো"। এছাড়াও অনেক হাদীস থেকে তিন পাথর ব্যবহার প্রমাণিত হয়।[৬১]

জবাব : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিন পাথরের কম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, অথবা নিজের জন্য তিনটি পাথর আনতে

---

৬০. জামে তিরমিযী : ১/১৯।

৬১. জামে তিরমিযী : ১/১০।

বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে, সাধারণত তিন পাথর দিয়ে পরিস্কার হয়। একারণে নয় যে, তিন পাথর ওয়াজিব। তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. তিনটি পাথর পেয়ে ছিলেন না। তাই একটি গোবরের টুকরা নিয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি নাপাক বলে ফেলে দিলেন এবং দুই পাথরের ওপর ক্ষান্ত করলেন। এটাও একথার স্পষ্ট দলীল যে, তিন পাথরই জরুরী নয়। বরং তিনের কমেও পরিস্কার হয়ে গেলে তা জায়েয আছে। আর যেই হাদীসে অতিরিক্ত কথা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোবর ফেলে দিয়ে ইবনে মাসউদ রাযি.কে দিয়ে আরেকটি পাথর সংগ্রহ করেছেন, এই অতিরিক্ত অংশ মুনকাতি। তাই দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **ইমাম মালেক** রহ. বলেন, শুধু انقاء তথা পরিস্কার করা ওয়াজিব। তিন পাথর ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত।

দলীল–১ : তারা তাসলীস ওয়াজিব না হওয়ার ওপর দলীল দিয়েছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর মারফু হাদীস।

من استجمر فليوتر مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

"যে ব্যক্তি পাথর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে তার জন্য উচিত বেজোড়া সংখ্যা গ্রহণ করা। যে করলো তো ভালো। আর যে করলো না কোনো অসুবিধা নেই।[৬২] এই হাদীস থেকে পরিস্কার জানা যায়, তিন পাথর ওয়াজিব নয়। কেননা, তিন পাথর ব্যবহার করা জরুরী হলে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একথা বলতেন না যে, যে করলো না এটা কোনো অসুবিধার কথা নয়। কেননা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সমস্যা আছে।

দলীল–২ : যেই সকল হাদীসে তিন পাথরের কথা উল্লেখ আছে সেখানে এটাও আছে যে, فانها تجزئ عنه.[৬৩]অথবা এভাবে আছে فان ذلك

---

৬২. সুনানে আবু দাউদ : ১/৬।
৬৩. সুনানে আবু দাউদ : ১/৬, ইবনে মাজা ও দারা কুতনী।

كافيه[৬৪] উভয়টির উদ্দেশ্য হলো, এই তিন পাথর যথেষ্ট হয়ে যাবে। বুঝা গেলো তিনের সংখ্যা জরুরী নয়। বরং পরিষ্কারের ক্ষেত্রে যেহেতু তিন যথেষ্ট হয়ে যায় তাই এটা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনের উর্ধ্বে বেজোড়া সকলের মতে মুস্তাহাব।

اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا

কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেওয়া

এই মাসআলায় বিভিন্ন উক্তি আছে, তার মধ্যে ৬টি উক্তি বেশি প্রসিদ্ধ।

ইমাম আযম রহ. বলেন, استقبال (ইস্তিঞ্জার সময় কেবলা সামনে নেওয়া) ও استدبار (ইস্তিঞ্জার সময় কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া) সর্ব অবস্থায় নাজায়েয। (অর্থাৎ খোলা মাঠে হোক কিংবা লোকালয়ে হোক)

দলীল : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.এর মারফু ও অবিচ্ছিন্ন হাদীস।[৬৫]

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ببول ولا غائط وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا

এই হাদীসে ইস্তিঞ্জার সময় কিবলার দিকে মুখ করতে এবং পিঠ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এই হাদীসে ফাঁকা মাঠ ও লোকালয়ের কোনো বিশেষত্ব নেই। তাই নিষিদ্ধতা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

হযরত আয়েশা রহ. বলেন, استقبال ও استدبار উভয়টি সর্বাবস্থায় জায়েয। ফাঁকা মাঠে হোক কিংবা লোকালয়ে। এটাই দাউদ যাহেরীর উক্তি।

দলীল : হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস,

---

[৬৪]. মুজামে তাবরানী মাজমাউস যাওযায়িদ : ১/২১১।

[৬৫]. বুখারী ও মুসলিম।

قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি দেখলাম তিনি কেবলাকে সামনে নিয়ে পেশাব করছেন।[৬৬]

তারা বলেন, এই হাদীস দ্বারা কেবলা সামনে নেওয়া প্রমাণিত হয়। (আর ইবনে ওমরের হাদীস থেকে استدبار প্রমাণিত হয়) তাই বলেছেন সর্বাবস্থায় উভয়টি জায়েয।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসের কিছু কিছু রাবী আপত্তিকর। তাই এই হাদীস হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.এর হাদীসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

তিন ইমাম বলেন, লোকালয়ে استقبال ও استدبار দুটিই জায়েয। খোলা মাঠে উভয়টি নাজায়েয।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ .

"আমি একদিন (আমার বোন) হযরত হাফসা রাযি.এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামের দিকে মুখ এবং কাবার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করছেন।

তিন ইমাম বলেন, এই হাদীস দ্বারা লোকালয়ে استدبار এবং উপরে বর্ণিত হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস দ্বারা লোকালয়ে استقبال প্রমাণিত হয়। তাই লোকালয়ে উভয়টি জায়েয।

---

৬৬. সুনানে আবু দাউদ, তহারাত অধ্যায়।

জবাব : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীসে বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা আছে। যেমন, ইবনে ওমর রাযি. এমন অবস্থায় ইচ্ছাকৃত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দিকে দেখেন নি। বরং হঠাৎ দৃষ্টি পড়েছে। আর এমন সময় ভুলের অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয় হলো, কিবলার দিকের استقبال ও استدبار এর দ্বারা কাবার অসম্মানী হয় না। মূল কা'বার استقبال ও استدبار এর দ্বারা কা'বার অসম্মানী হয়।

আর হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূল কা'বা থেকে অন্য দিকে ফিরে ছিলেন। কিন্তু ইবনে ওমর রাযি.এর হঠাৎ দৃষ্টি সেটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তৃতীয়তঃ হতে পারে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য। আর তিনি এই বিধান থেকে বাহিরে। মোটকথা এই হাদীসে বিভিন্ন সম্ভাবনা একত্রিত হয়ে গেছে। আর নিয়ম আছে,

إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال "সম্ভাবনাপূর্ণ হাদীস দিয়ে দলীল হয় না।" তাই উক্ত হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, استقبال সর্বাবস্থায় নাজায়েয। তবে استدبار শুধু লোকালয়ে জায়েয।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস।

ইমাম আযম ও ইমাম আহমদ রহ.এর একটি বর্ণনা হলো, استقبال সকল জায়গায় নাজায়েয। কিন্তু استدبار সকল জায়গায় জায়েয।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস।

ইমাম আযম রহ.এর একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, استقبال ও استدبار উভয়টি শুধু মাকরূহে তানযিহী। (দরসে হযরত উস্তাদ যেহেতু

৬টি উক্তি যথেষ্ট বলেছিলেন। তাই আমরাও ৬টির ওপর ক্ষান্ত করলাম। আব্দুল গফুর সাম্ভলী)।

الْاِسْتِنْجَاءُ بِشَيْئٍ نَجِسٍ

নাপাক বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, নাপাক বস্তু (শুকনা গোবর, লেদা ইত্যাদি) দ্বারা ইস্তিঞ্জা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং ইস্তিঞ্জা না করার মতো হবে। কেননা এই জিনিসগুলি দ্বারা ইস্তিঞ্জা অস্তিত্ব লাভ করে না।

দলীল : হযরত রুওয়াইফি রাযি.এর হাদীস। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি গোবর ও লেদা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে দায়িত্বমুক্ত।[৬৭] তাছাড়া দারা কুতনীতে আছে, إنهما لا يطهران "হাড্ডি ও গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় না।[৬৮]

জবাব : এই জিনিসগুলি দ্বারা ইস্তিঞ্জা অস্তিত্বই লাভ করে না একথা বলা ভুল। কেননা, কোনো কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এখন ঐ বস্তু অস্তিত্বই লাভ করবে না। বরং অস্তিত্ব লাভ করে। তবে নিষেধের কারণে কারাহাত এসে যায়। যেমন, কুরবানীর দিন রোযা রাখা হারাম বলা হয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সেদিন রোযা রেখে ফেলে তাহলে অস্তিত্ব লাভ করে ফেলে। এখানেও এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, এই জিনিসগুলি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যদিও মাকরূহ, তবে কোনো ব্যক্তি করে ফেললে হয়ে যাবে। আর দারা কুতনীর হাদীসের জবাব হলো,

---

৬৭. সুনানে আবু দাউদ : ১/৬।

৬৮. নসবুব রাযা : ১/২২০।

তাতে সালামা বিন রজা কূফী নামক একজন আপত্তিকর রাবী রয়েছে।[৬৯] তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **ইমাম মালেক** রহ. : তারা বলেন, নাপাক বস্তু যদি শুকনা হয়, তাহলে তার দ্বারা ইস্তিঞ্জা অস্তিত্ব লাভ করে। তবে কারাহাতের সাথে। আর যদি তা হারাম প্রাণীর গোবর বা লেদা হয় তাহলে ইমাম মালেক রহ.এর মতে ইস্তিঞ্জা মাকরূহে তাহরিমীর সাথে অস্তিত্ব লাভ করবে। তবে ইস্তিঞ্জা হয়েই যাবে।

দলীল : এই জিনিসগুলি সম্পর্কে যে নিষিদ্ধতা এসেছে তা একারণে নয় যে, এগুলি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় না। বরং এ কারণে যে এই জিনিসগুলি জিন জাতি ও তাদের জীব-জন্তুর খাবার। তাই ইস্তিঞ্জা তো হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।

الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِيْنِ

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা

যাহেরিয়া বলে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহে তানযিহী।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত ভালো কাজে ব্যবহার করতেন। সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাবারের জন্য ছিলো।"[৭০]

ইমাম আযম রহ. বলেন, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহে তাহরিমী।

---

৬৯. নসবুর রাযা : ১/২৩০।

৭০. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫।

দলীল : হাদীসে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ

"তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে, কখনো পুরুষাঙ্গকে ডান হাতে ধরবে না, এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করবে না।"[৭১]

হাদীসের শেষাংশ স্পষ্ট বুঝায় যে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা নিষিদ্ধ।

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِيْ الْمُغْتَسَلِ

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

জামহুর বলে, গোসলখানার মাটি কাঁচা হলে পেশাব করা মাকরূহ। আর পাকা হলে মাকরূহ নয়।

দলীল : মাটি কাঁচা হলে পানি সঙ্গে সঙ্গে টেনে তো নেয় না। তাই ময়লা পানি জমে যাবে। আর তাতে পেশাবের ফোঁটা মিশে যাবে। এরপর তা গোসল করার সময় ছিটে উঠে শরীরে লেগে যাবে। ফলে অসঅসার রোগ সৃষ্টি হবে। আর জমিন পাকা হলে, পেশাব করে পানি ঢেলে দিলে পেশাব বয়ে চলে যাবে। আর জমিন পাক হয়ে যাবে। এবার তাতে গোসল করলে কোনো অসঅসা সৃষ্টি হবে না।

ইমাম নভভী রহ. : তার উক্তি জামহুরের সম্পূর্ণ উল্টা। অর্থাৎ গোসলখানার জমিন কাঁচা হলে পেশাব করতে কোনো অসুবিধা নেই, পাকা হলে পেশাব করা মাকরূহ।

দলীল : জমিন কাঁচা হলে পেশাব শুষে নিবে এবং জমিনের নীচে চলে যাবে। তখন গোসল করতে কোনো অসঅসা সৃষ্টি হবে না। কেননা, পেশাব উপরে থাকেইনি। আর জমিন পাকা হলে পেশাব উপরে থেকে

---

[৭১] . সহীহ বুখারী : ১/২৭।

যাবে এবং গোসলের সময় ছিটা এসে লেগে যাবে। ফলে অসঅসা সৃষ্টি হবে।

জবাব : কাঁচা মাটিতে সাথে সাথে পানি শুষে নেয় একথা আমরা মানি না। আর যদি মেনেই নেই, তাহলে জমিনের উপরিভাগে পেশাবের কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই বাকি থাকবে। আর সেই অংশটি গোসলের সময় শরীরে লেগে অসঅসার কারণ হবে। আর জমিন যদি পাকা হয় তাহলে গোসলের পূর্বে পানি ঢেলে পেশাব দূর করা যেতে পারে। তখন অসঅসার কোনো উৎস বাকি থাকবে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.ও এরই প্রবক্তা।

الْبَوْلُ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে পেশাব করা

ইমাম মালেক রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, ছিটা আসা এবং লজ্জাস্থানে অন্যের দৃষ্টি পড়ার যদি আশঙ্কা না থাকে তাহলে কারাহাত ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয।

দলীল : হযরত হুযায়ফা রাযি.এর হাদীস, যাতে আছে,

أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এলাকার নর্দমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।[৭২] এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা কারাহাত ছাড়া জায়েয।

জবাব : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন যে, তাঁর হাঁটুতে ব্যথা ছিলো। যার কারণে বসা কষ্টকর ছিলো। যেমন, বায়হাকী কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর বর্ণনায় আছে,

---

৭২. সুনানে আবু দাউদ : ১/৪।

فَبَالَ قَائِمًا لِجُرْحٍ كَانَ فِيْ مَأْبَضِهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাঁটুতে ক্ষত থাকার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।" বুঝা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এই আমল ওযরের কারণে ছিলো। তাই অন্যদের এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **শাফেয়ী** রহ. বলেন, ওযর ছাড়া দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহে তানযিহী।

দলীল : বিভিন্ন হাদীসে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব করার ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যদিও সেসব হাদীস দুর্বল, তবে সেগুলি দ্বারা কমপক্ষে মাকরূহে তানযিহী অবশ্যই প্রমাণিত হবে। তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে **مطلقًا** জায়েয বলা সঠিক নয়।

নোট : বর্তমান যুগে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে মাকরূহে তাহরিমীর ফত্ওয়া দেওয়া হয়েছে।

بَوْلُ الصَّبِيِّ قَبْلَ الطَّعَامِ

খাদ্য গ্রহণের পূর্বে বাচ্চার পেশাব

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ্. বলেন, দুধপানকারী বাচ্চা যদি পেশাব করে দেয়, তার ওপর পানির ছিটা দেওয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়। ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

দলীল :

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ

"উম্মে কইস বিনতে মিহসন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার একটি দুধের বাচ্চা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে

গেলাম। বাচ্চাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি আনতে বললেন এবং তার ওপর ছিটা দিলেন।[৭৩]

তাছাড়া যে সকল হাদীসে বাচ্চার পেশাবের ক্ষেত্রে نضح বা رش শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি তাদের দলীল।

ইমাম আযম রহ. ও মালেক রহ. বলেন, মেয়ের পেশাবের মতো ছেলের পেশাবও ধোয়া জরুরী। তবে বেশি ধৌত করতে হবে না। হালকা ধোয়া যথেষ্ট।

দলীল

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَـأُتِيَ بِصَبْيٍ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে ছোট বাচ্চা নিয়ে আসা হতো। একবার একটি বাচ্চা নিয়ে আসা হলো। বাচ্চাটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলো। অতঃপর তিনি বললেন এর ওপর ভালোভাবে পানি ঢেলে দাও। তাছাড়া যেসকল হাদীসে পেশাব ছিটা থেকে বাঁচার কথা বলা হয়েছে। সেগুলিও আমাদের দলীল।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর দলিলের জবাব : অন্যান্য হাদীসে যেহেতু পানি বয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাই نضح ও رش শব্দের এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, যা অন্যান্য হাদীসের সাথে মিল থাকে। আর সেটা হচ্ছে হালকা ধৌত করা। ইমাম শাফেয়ী রহ.ও কোনো কোনো জায়গায় এমন শব্দের এই ধরনের ব্যাখ্যা লিখেছেন।

ফায়েদা : এই ইখতিলাফ শুধু ছেলে বাচ্চার ক্ষেত্রে, মেয়ে বাচ্চার ব্যাপারে সকল ইমাম ধৌত করার প্রবক্তা।

---

৭৩. জামে তিরমিযী : ১/২১।

[নোট: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কোলে ৫ জন বাচ্চা পেশাব করেছে। এটাকে জনৈক কবি কবিতায় বর্ণনা করেছেন:

وبال في حجر النبي أطفال – حسن حسين وابن الزبير بالوا

وكذا سليمان بن هشام – وجاء ابن ام قيس في الختام

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কোলে কতগুলি বাচ্চা পেশাব করেছে। হাসান, হুসাইন, ইবনে যুবায়ের, সুলাইমান বিন হিশাম ও ইবনে উম্মে কইস।" অনুবাদক]

بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُه

হালাল প্রাণীর পেশাব

ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যে জন্তুর গোশত হালাল, সেগুলির পেশাব পাক।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওরায়না গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলেন, اشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا "তোমরা উটের দুধ ও পেশাব পান করো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় হালাল প্রাণীর পেশাব পাক। কেননা, পাক না হলে তিনি ওদেরকে পান করতে বলতেন না।

জবাব-১ : পেশাব পান করার এই নির্দেশ তাদেরকে চিকিৎসা হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের চিকিৎসা এবং বেঁচে থাকা ঐ পেশাব পান করার মধ্যে নিহিত। অন্যদের জন্য পেশাব পান করার অনুমতি নেই।

জবাব-২ : এরা অপারগ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, আর অপারগ অবস্থায় নাপাক জিনিস ব্যবহার জায়েয হয়।

ইমাম আযম রহ. ও **ইমাম শাফেয়ী** রহ. বলেন, হালাল প্রাণির পেশাব নাপাক।

দলীল–১ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস,

اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"তোমরা পেশাব থেকে বাঁচো। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের কারণে হয়।"[৭৪]

দলীল–২ : হযরত সা'আদ বিন মুআয রাযি.এর কবর তাকে সজোরে চাপ দিয়েছে। এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেলেন। তখন তিনি বললেন, এটা পেশাব থেকে না বাঁচার কারণে হয়েছে। যখন তার স্ত্রীকে বলা হলো, তখন তিনি বললেন, তিনি জীব-জন্তু পালতেন। আর সেগুলির পেশাব থেকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। বুঝা গেলো হালাল জীব-জন্তু পেশাবও নাপাক।

حُكْمُ الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ

মনি, মযি ও অদির বিধান

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, মনি পাক।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْه أَنْ يَفْرُكَه بِأَصَابِعِه وَرُبَمَا فَرَكْتُه مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَصَابِعِيْ

"মনি পাক করার জন্য যথেষ্ট যে, আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলবে। অনেক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাপড় থেকে আঙ্গুল দিয়ে ঘষে তুলেছি।"[৭৫] তারা বলেন, উল্লিখিত হাদীসে মনি পাক

---

[৭৪]. মুসতাদরাক : ১/১৮৩, ইবনে মাজাহ : ১/২৯, দারাকুতনী : ৪৭, মাআরেফুস সুনান : ১/২৭৫।

[৭৫]. জামে তিরমিযী : ১/৩১।

করার জন্য ঘষে তোলাকে যথেষ্ট বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় মনি পাক। কারণ মনি পাক না হলে শুধু ঘষে তোলার ওপর ক্ষান্ত করা হতো না। বরং ধোয়ারও নির্দেশ দেওয়া হতো। এছাড়া আরো যেসব হাদীসে ঘষার কথা রয়েছে সেগুলি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে।

জবাব : নাপাক বস্তু পাক করার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে। কখনো পাক করার জন্য ধৌত করা জরুরী হয়। কোথাও ধোয়া লাগে না। যেমন– তুলা পাক করার পদ্ধতি হলো তা ধুনা। জমিন শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যায়। তেমনি মনি থেকে পবিত্রতা অর্জন করার একটি পদ্ধতি হলো ঘষে তুলে ফেলা।[৭৬]

[কোনো হাদীসে যদি এমন পাওয়া যেতো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড়ে মনি নিয়ে না ধুয়ে কিংবা ঘষে নামায আদায় করেছেন, তাহলে মনি পাক বলা যেতো। অথচ এমন কোথাও পাওয়া যায় না। অনুবাদক]

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও **মালেক** রহ. বলেন, মনি নাপাক। তবে ইমাম মালেক রহ.এর মতে সর্বাবস্থায় ধোয়া জরুরী। হানাফীদের মতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে যে, মনি ভিজা হলে ধোয়া জরুরী। শুকিয়ে গেলে ঘষে তোলা যথেষ্ট।

দলীল : হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি.এর বর্ণনা যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে জিজ্ঞাসা করলো, যেই কাপড় পরিধান করে স্ত্রীর সাথে মিলন করেছি তা নিয়ে কি নামায আদায় করতে পারবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন,

نَعَمْ إِن تَرَى فِيْهِ شَيْئًا فَتَغْسِلُهُ

"হ্যাঁ পড়তে পারবে। তবে তাতে যদি কোনো কিছু লেগে থাকে দেখো, তাহলে তা ধুয়ে ফেলো।"[৭৭]

---

৭৬. দরসে তিরমিযী : ১/৩৪৯।

৭৭. মাওয়ারিদুয যামআন : ১/৮২।

হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনি ধৌত করতেন। অতঃপর সেই কাপড় পরে নামাযে যেতেন। আমি কাপড়ে ধোয়ার চিহ্ন দেখতাম।[৭৮]

এই সকল বর্ণনাগুলিতে ধোয়ার শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, মনি নাপাক। নতুবা ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো না।

মযি : সকল ইমামদের মতে নাপাক। পাক করার পদ্ধতিতে সামান্য ইখতিলাফ আছে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এমন কাপড়ে ছিটা মেরে দেওয়া যথেষ্ট।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ইরশাদ হলো,

يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ

"তোমার জন্য এটা যথেষ্ট যে, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিবে।[৭৯] উক্ত হাদীসের কারণে ইমাম আহমদ রহ. ছিটা দেওয়ার প্রবক্তা।

জবাব : উক্ত হাদীসে نضح শব্দ দ্বারা ধোয়া কিংবা হালকা ধোয়া উদ্দেশ্য। ছিটা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

তিন ইমাম বলেন, মযি থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধৌত করা জরুরী। ধোয়া ছাড়া পবিত্রতা অর্জন হবে না।

দলীল : বুখারী শরীফের হাদীস। তাতে আছে, واغسل ذكرك অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের মযি লেগে গেলে ধুয়ে ফেলো। মযি লাগলে যখন পুরুষাঙ্গ

---

৭৮. সহীহ মুসলিম : ১/১৪০।

৭৯. জামে তিরমিযী : ১/৩১।

ধুতে বলেছেন, তাহলে কাপড়ে লাগলেও ধোয়ার বিধান হবে। পানি ছিটা যথেষ্ট হবে না।

অদি : সর্বসম্মতক্রমে এটা নাপাক। এটা কাপড়ে লাগলে ধোয়া জরুরী।

أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهَا

হায়েযের সর্বোচ্চ সময় ও সর্বনিম্ন সময়

ইমাম আযম রহ.এর মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন, তিনরাত। আর সর্বোচ্চ সময় দশ দিন।

দলীল : এই মাসআলায় হানাফীদের দলীল কয়েকটি হাদীস। তা যদিও যয়ীফ, তবে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাসানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যার একটি হাদীস হলো,

عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيض ثلاثة أيام واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة فاذا جاوزت العشر فهى اسْتِحَاضَةٌ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়েয কমপক্ষে তিনদিন। সর্বোচ্চ চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশদিন। দশদিনের বেশি হলে সেটা মুস্তাহাযা।[৮০]

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় একদিন, একরাত। আর সর্বোচ্চ সময় পনের দিন।

দলীল : উক্ত মাসআলায় তাদের কিছু হাদীস আছে,

تَمْكُثُ إِحْدَا كُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي

"তোমাদের প্রত্যেকে জীবনের অর্ধেক বসে থাকো, নামায পড়তে পারো না।"[৮১]

---

৮০. নাসবুর রায়া : ১/১৯২।

এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহিলা জীবনের অর্ধেক নামায পড়ার যোগ্য থাকে না। আর এটা তখনি হতে পারে, যদি প্রতি মাসে পনের দিন হায়েযের সময় মেনে নেওয়া হয়। বুঝা গেলো, হায়েযের সর্বোচ্চ সময় সীমা পনের দিন।

জবাব : আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, حديث لا يعرف "অপরিচিত হাদীস"। ইমাম বায়হাকী বলেন, لم نجده "আমি এটি পাইনি।" ইমাম নভভী শাফেয়ী বলেন, حديث باطل لا يعرف অপরিচিত বাতিল হাদীস। এ কারণেই তিনি এই মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ.এর ভাষ্যকার হয়ে এই হাদীস বাদ দিয়ে কিয়াস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, হায়েযের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নেই। শুধু একবার এসে বন্ধ হয়ে গেলে তাও হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। তবে সর্বোচ্চ সময় ১৭ দিন।

নেফাসের সময় : নেফাসের সর্বনিম্ন সময় নির্ধারিত নেই। তবে শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের আলেমগণ অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বোচ্চ সময় ৬০ দিন বলেন। আর হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবীগণ উম্মে সালমা রাযি.এর হাদীসের আলোকে চল্লিশ দিন নির্ধারণ করেছেন।

أَلْوَانُ الْحَيْضِ

হায়েযের বিভিন্ন রং

মুস্তাহাযা মহিলা হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মাঝে কিভাবে পার্থক্য করবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, হায়েযের রং শুধু দুই ধরনের। কালো ও লাল। হায়েযের দিনগুলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রঙের

---

৮১. তালখীসুল হাবীর : ১/১৬৩।

রক্ত আসবে হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর রক্তের রং পরিবর্তন হয়ে গেলে তখন হায়েয বলে গণ্য হবে না। অথবা দিনের মাধ্যমে নির্ণয় করবে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

فَإِنَّه دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذلِكَ فَامْسِكِيْ عَنِ الصَّلَاةِ

"অর্থাৎ হায়েযের রক্ত বিশেষ এক ধরনের কালো, যা চিনা যায়। সুতরাং এমন হলে নামায পড়বে না।[৮২]

দেখুন, এই হাদীসে হায়েযের ভিত্তি রঙকে বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রঙের দ্বারাও পার্থক্য করা যায়।

জবাব : এটা কোনো সামগ্রিক ছুরত নয় যে, সকল মহিলার কালো রক্তই আসবে। বরং মেজায ও দেশের পরিবর্তনের কারণে হায়েযের রঙ বিভিন্ন হতে পারে। তাই রঙের ওপর হায়েযের শুরু শেষের ভিত্তি রাখা যায় না। তবে রঙের পরিবর্তনের দ্বারা সমর্থন হতে পারে।

ইমাম আযম রহ. বলেন, হায়েয শুরু হওয়া এবং শেষ হওয়া ভিত্তি দিনের ওপর। রঙের ধর্তব্য নেই। প্রত্যেক রঙের হায়েয আসতে পারে। হায়েযের রঙ ৬টি। কালো, লাল, হলুদ, কাদা, সবুজ, মেটে।

দলীল : ঐ হাদীস যাতে আছে, মহিলারা তাদের কাপড় পাঠিয়ে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে জেনে নিতো যে, হায়েয শেষ হয়েছি কি না। হযরত আয়েশা রাযি. দেখে বলতেন, তাড়াহুড়া করো না।

حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ পিওর সাদা রঙ দেখা পর্যন্ত। (যা হায়েয শেষ হওয়ার চিহ্ন) এই হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় রঙের কোনো ধর্তব্য নেই। বরং সকল রঙ হায়েযের হতে পারে। তাই সাদা আর্দ্রতা আসা পর্যন্ত হায়েয বলে গণ্য হবে। এর আগে যে রঙেরই রক্ত আসুক, তা ধর্তব্য নয়।

ইমাম মালেক রহ.এর মতে হায়েযের রক্ত চারটি। কালো, লাল, হলুদ, মেটে।

---

৮২. সুনানে আবু দাউদ : ১/৪৩।

أَقْسَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ

মুস্তাহাযার প্রকার

হানাফীদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাযা তিন প্রকার। ১. মুবতাদিয়া ২. মু'তাদা ৩. মুতাহায়্যিরা। একে যল্লা, মুযিল্লা ও নাসিয়াও বলে।

তিন ইমাম : তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাযা চার প্রকার। ১. মুবতাদিয়া ২. মু'তাদা ৩. মুতাহায়্যিরা ৪. মুমায়্যিযা।

মুবতাদিয়া : ঐ বালেগ মেয়ে যার জীবনে প্রথমবার হায়েয এসেছে এবং এরপর লাগাতার চালু হয়ে গেছে।

বিধান : সর্বসম্মতক্রমে এর বিধান হলো, এমন মহিলা হায়েযের সময় পার হওয়া পর্যন্ত রক্তকে হায়েয মনে করবে। আর সে সময়ে নামায রোযা ছেড়ে দিবে। পূর্ণ সময় (দশ দিন) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায শুরু করবে। এরপর বিশ দিন শেষ হলে আবার হায়েযের দিন গণনা করা হবে।

মু'তাদা : ঐ মহিলা যার কিছুকাল পর্যন্ত প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিন হায়েয আসার স্বভাব হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে রক্ত আসার দিন বেড়ে যায়।

বিধান : এমন মহিলার বিধান হলো, স্বভাবগত দিনগুলি শেষ হওয়ার পর যে রক্ত আসবে তা যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। আর মনে করা হবে তার স্বভাব পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর দশদিনের পরও যদি রক্ত চালু থাকে তাহলে স্বভাবগত দিনগুলির পরবর্তী রক্ত ইস্তিহাযার রক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। আর স্বভাবগত দিনগুলির যত নামায সে ছেড়ে দিয়েছে তার কাযা আবশ্যক হবে।

মুতাহায়্যিরা : সে মহিলা যে প্রথমে মু'তাদা ছিলো। এরপর লাগাতার রক্ত আসতে থাকে। সাথে সাথে নিজের সাধারণ স্বভাবও ভুলে গিয়েছে। এমন মহিলা তিন প্রকার।

মুতাহায়্যিরা বিল আদদ : যে মহিলার হায়েযের দিনগুলির সংখ্যা স্মরণ নেই যে, পাঁচদিন আসতেন। নাকি সাতদিন আসতেন। নাকি অন্য কিছু।

বিধান : যে দিন থেকে হায়েয আসা শুরু হবে, সেদিন থেকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত নামায ছেড়ে দিবে। কেননা তিনদিন হায়েয হওয়া নিশ্চিত। তিনদিন পর হায়েযের সর্বোচ্চ সময়ের যে সাতদিন বাকি আছে, সেদিনগুলির প্রতি ওয়াক্ত নামায গোসল করে পড়বে। কেননা, প্রতি নামাযের সময় এই সম্ভাবনা আছে যে, হায়েয থেকে পাক হয়ে গেছে। দশদিন পর পরবর্তী নামাযগুলি প্রতি ওয়াক্তে উযু করে পড়বে।

মুতাহায়্যিরা বিল ওয়াক্ত : ঐ মহিলা যার হায়েযের সময় মনে নেই যে, মাসের শুরুতে আসতো নাকি মাঝে, নাকি শেষে।

বিধান : এমন মহিলার বিধান হলো, রক্ত আসা শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে স্বভাবের দিনগুলি শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামায নতুন উযু দ্বারা পড়বে। আর মাসের বাকি দিনগুলি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে।

মুতাহায়্যিরা উভয়টির সাথে : ঐ মহিলা যিনি সময় ও সংখ্যা দুটি'ই ভুলে গেছে।

বিধান : এমন মহিলা প্রতি মাসে প্রথম তিনদিন প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। আর বাকি সাতাশ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে।

الحَائِضَةُ لَا تَقْضِيْ الصَّلَاةَ

হায়েযা মহিলার নামাযের কাযা নেই

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, হায়েযা মহিলা রোযার কাযা করবে, কিন্তু নামাযের কাযা করবে না। হায়েয চলাকালীন সময়ের নামায তার জন্য মাফ। কিন্তু রাফেযীতের মতে হায়েযা মহিলার ওপর রোযার মতো নামাযেরও কাযা আবশ্যক। কারণ হচ্ছে, এই মাসআলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর রাফেযীরা সুন্নাহকে দলীল মানে না।

২. হায়েযা মহিলার নামায মাফ হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উক্তি আছে।

ইমামুল হারামাঈন : তিনি বলেন, এটা যুক্তি বহির্ভূত বিধান। ইমাম নভভী রহ. বলেন, যেহেতু এতগুলি নামায কাযা করতে তার কষ্ট হবে তাই শরীআত প্রবর্তক এর কাযা মাফ করে দিয়েছেন।

বাদায়ে' প্রণেতা : তিনি বলেন, মহিলার ওপর নামায ওয়াজিব হওয়া ও আদায় হওয়া উভয়ের জন্য হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। হায়েয অবস্থায় সে পাক থাকে না। তাই তার ওপর নামায ওয়াজিব হয় না। আর নামায ওয়াজিব না হলে কাযা কিসের? আর রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তবে আদায়ের জন্য শর্ত। এ কারণে পবিত্রতা ব্যতীত হায়েয অবস্থায় রোযা ওয়াজিব হয়। কিন্তু আদায় হওয়ার জন্য যেহেতু পবিত্রতা শর্ত তাই হায়েয অবস্থায় আদায় করা যাবে না, পরে কাযা করতে হবে।

اِسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ

হায়েযা মহিলা থেকে উপকৃত হওয়া

এর তিনটি ছুরত।

১. استمتاع بالجماع (মিলন করে উপকৃত হওয়া) এটা উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে হারাম।

২. استمتاع بما فوق الإزار (কাপড়ের উপর থেকে উপকৃত হওয়া)। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এটা জায়েয।

৩. استمتاع بما تحت الازار (কাপড়ের নীচ থেকে উপকৃত হওয়া) এতে ইখতিলাফ আছে।

ইমাম আহমদ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. বলেন, কাপড়ের নীচ থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ "মিলন ছাড়া সব কিছু করো।"[৮৩] বুঝা গেলো, মিলনের স্থান ছাড়া সর্ব জায়গা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে মিলনের স্থান থেকে যে উপকৃত হওয়া নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে আশ-পাশের অংশ অন্তর্ভুক্ত এবং তা নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত।

তিন ইমাম বলেন : কাপড়ের নীচে কোনো জায়গা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নেই।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা যদিও স্পষ্টভাবে বুঝায় না। কিন্তু উদ্দেশ্যগতভাবে বুঝায়। সুতরাং একজন প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে জিজ্ঞেস করেছে। হায়েয অবস্থায় আমার জন্য স্ত্রীর সাথে কোন কাজটি জায়েয? তিনি বলেন, لك ما فوق الإزار "কাপড়ের উপরে তোমার জন্য সবকিছু জায়েয।[৮৪] উল্লিখিত হাদীসে 'উপরে' শব্দ এসে 'নীচে' শব্দকে বের করে দিয়েছে। এখন উদ্দেশ্য হবে কাপড়ের নীচে জায়েয নেই। এটাই আমাদের মাযহাব।

دُخُوْلُ الْحَائِضَةِ وَالْجُنُبِ الْمَسْجِدَ

হায়েযা মহিলা ও জুনুবী মসজিদে প্রবেশ করা

ইমাম আযম রহ. ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, হায়েযা মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করা এবং পার হওয়া জায়েয নেই।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,

---

৮৩. সহীহ মুসলিম : ১/১৪৩; সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৪।

৮৪. সুনানে আবু দাউদ : ১/৩০।

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"আমি হায়েযা মহিলা ও জুনুবীর জন্য মসজিদে প্রবেশ হালাল মনে করি না।[৮৫] উক্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হায়েযা মহিলা ও জুনুবী মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। অন্য এক হাদীসে আছে,

يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ

"হে আলী, আমি আর তুমি ছাড়া কারো জন্য জুনুবী অবস্থায় এই মসজিদে প্রবেশ জায়েয নেই।[৮৬]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, হায়েযা মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করা বা অবস্থান করা জায়েয নেই। তবে পার হওয়া জায়েয আছে।

দলীল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

উক্ত আয়াতে ইমাম শাফেয়ী রহ. صلاة শব্দ থেকে নামাযের স্থান এবং عابرى سبيل শব্দ দ্বারা মসজিদ অতিক্রমকারী উদ্দেশ্য নেয়। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে, নামাযের স্থান অর্থাৎ মসজিদে নেশাগ্রস্থ এবং জানাবাত অবস্থায় প্রবেশ করা জয়েয নেই। তবে অতিক্রমকারীর জন্য জায়েয আছে।

জবাব : উক্ত আয়াতে صلاة শব্দ দ্বারা বাহ্যিক অর্থ নামায উদ্দেশ্য। নামাযের স্থান উদ্দেশ্য নয়। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, নেশাগ্রস্থ ব্যক্তি নেশা দূর হওয়া ছাড়া এবং জুনুবী ব্যক্তি গোসল ছাড়া নামাযের কাছেও যেও না। عابرى سبيل বলে মুসাফিরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মুসাফির জুনুবী হলে, আর পানি না থাকলে গোসল ছাড়া তায়াম্মুম

---

[৮৫]. সুনানে আবু দাউদ : ১/২৮।

[৮৬]. জামে তিরমিযী : ২/২১৪।

করে নামায আদায় করা জায়েয। আর শুধু মুসাফিরের উল্লেখ এজন্য যে, সাধারণত পানি না পাওয়ার ছুরত সফরের মধ্যে সামনে আসে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, হায়েযা মহিলার জন্য কখনো মসজিদে প্রবেশ করা জয়েয নেই। তবে জুনুবী ব্যক্তি হাদাস দূর করার উদ্দেশ্যে যদি উযু করে তাহলে তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয আছে।

تَطْهِيرُ الْأَرْضِ مِنَ النَّجَاسَةِ

নাপাকী থেকে জমিন পাক করা

নাপাকীর অংশ যদি জমিনের মধ্যে ছড়িয়ে না যায়, তাহলে নাপাকী দূর করার দ্বারা সর্বসম্মতক্রমে জমিন পাক হয়ে যায়। আর যদি নাপাকীর অংশ জমিনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়, তাহলে পবিত্রকরণ পদ্ধতিতে ইখতিলাফ আছে।

জামহুর ইমামগণ বলেন, এমন জমিন শুধু পানি বয়ে দেওয়ার দ্বারা পাক হবে।

দলীল : ঐ হাদীস যাতে আছে, এক বেদুইন মসজিদে এসে পেশাব করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন,

صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ "তার ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"[৮৭]

বুঝা গেলো, জমিন পবিত্র করার জন্য পানি বয়ে দেওয়া জরুরী। শুধু শুকানোর দ্বারা জমিন পাক হবে না।

জবাব : শুধু পানি ঢালার দ্বারা জমিন পাক হয় এমন কথা বলা ভুল। কেননা হাদীসের মধ্যে অন্য পদ্ধতিও বর্ণিত আছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর এক হাদীস থেকে খনন করা এবং আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর এক হাদীস থেকে শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা পবিত্র হওয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৮৭. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫৪।

ইমাম আযম রহ. বলেন, জমিন পাক করার তিন পদ্ধতি আছে। তিনটির প্রমাণ হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

১. صب الماء পানি ঢেলে দেওয়া। উল্লিখিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, তাতে পানি ঢালার কথা উল্লেখ আছে।

২. **جفاف** শুকিয়ে যাওয়া। আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে আছে,

كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ

"কুকুর মসজিদে আসা-যাওয়া করতো এবং পেশাব করতো কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (তার ওপর পানি ইত্যাদি) কিছু ছিটাতেন না।[৮৮] বুঝা গেলো শুধু শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা জমিন পাক হয়ে যায়।

৩. حفر খনন করা। এর প্রমাণ ঐ হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً

"যেখানে সে পেশাব করেছে সেখান থেকে মাটি তুলে ফেলে দাও এবং সে জায়গায় পানি ঢেলে দাও।"[৮৯] এই হাদীস থেকে খনন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ হলো, জমিন পাক করার পদ্ধতি তিনটি।

الْوُضُوْءُ مِنَ الرِّيْحِ

বাতাসের কারণে উযু নষ্ট হওয়া

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও আহমদ রহ. বলেন, সামনের রাস্তার বাতাস সর্বাবস্থায় উযু ভঙ্গকারী।

---

৮৮. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫৫।
৮৯. সুনানে আবু দাউদ : ১/৫৪।

দলীল : তাদের একটি মূলনীতি আছে,

مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ فَهُو نَاقِضٌ

"দুই রাস্তা থেকে যাই বের হবে তাতে উযু ভেঙে যাবে।" ইমাম আযম ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, সামনের রাস্তার বাতাস সর্বাবস্থায় উযু ভঙ্গকারী নয়।

দলীল : সামনের রাস্তার বাতাস মূলত বায়ুই নয়। বরং শরীরের ইহতিলাজ। আর যদি বায়ু মেনেও নেওয়া হয় তবুও হেদায়া প্রণেতার উক্তি মতে তা নাপাকীর স্থান থেকে আসে না। তাই উযু ভঙ্গকারী নয়। তবে মহিলা যদি মুফযাত (যে মহিলার পেশাব-পায়খানার রাস্তা মিলে গেছে এমন) হয় তাহলে তার জন্য উযু করা মুস্তাহাব।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ النَّوْمِ

ঘুমের দ্বারা উযু ভঙ্গ হওয়া

ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, সর্বাবস্থায় ঘুম উযু ভঙ্গকারী। কম হোক কিংবা বেশি হোক। হাসান বসরী রহ. এর মত এটাই।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়। হযরত আবু মূসা আশায়ারী রাযি. এর মতও এমনি।

দলীল

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ.

"সাহাবায়ে কেরাম ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার উযু করতেন না।[৯০]

তারা বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়।

---

৯০. জামে তিরমিযী : ১/২৪১।

জবাব : এই ঘটনা সে সব সাহাবাদের যারা নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন এবং হালকা তন্দ্রা এসে যেতো।[৯১]

এমন হালকা ঘুম বাস্তবে উযু ভঙ্গকারী নয়। এটা আমরাও বলি। মোটামুটি উল্লিখিত হাদীস দ্বারা হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী না হওয়া প্রমাণ হচ্ছে। সাধারণ ঘুম নয়। তাই উক্ত হাদীস দিয়ে সাধারণ ঘুম উযু ভঙ্গকারী না হওয়ার ওপর দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

চার ইমাম : তাদের দৃষ্টিতে ভারি ঘুম উযু ভঙ্গকারী। আর হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়।

দলীল : হাদীসে উযু ভঙ্গের ভিত্তি জোড়াগুলি ঢিলা হওয়ার ওপর রাখা হয়েছে।[৯২] আর জোড়া ঢিলা হওয়া যেহেতু ভারি ঘুমের মধ্যে হয়, তাই ভারি ঘুম উযু ভঙ্গকারী। তবে হালকা ঘুমে জোড়া ঢিলা হয় না। তাই হালকা ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়।

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

আগুনে পাকানো জিনিসে উযু ভঙ্গ হওয়া

সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একথার ওপর ইজমা হয়ে আছে যে, আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় না। তবে সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক যুগে এই মাসআলায় কিছুটা ইখতিলাফ ছিলো। কিছু সাহাবী যেমন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবু তালহা, আবু হুরায়রা আনাস বিন মালেক, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা, উম্মে হাবীবা রাযি. আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু ভঙ্গ হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।

দলীল : তারা দলীল হিসেবে কিছু কওলী ও ফে'লী হাদীস পেশ করতেন। যার মধ্য থেকে কোনো কোনোটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৯১. দরসে তিরমিযী : ১/২৯৬ সংক্ষেপিত।

৯২. জামে তিরমিযী : ১/২৪।

ওয়া সাল্লাম আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত[৯৩]

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

জবাব : জামহুর এই জাতীয় রেওয়ায়েতের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

১. আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার দ্বারা উযু ভঙ্গ হওয়ার বিধান রহিত হয়েছে। তার দলীল হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস,

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আমলের সিলসিলায় শেষ আমল ছিলো আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু না করা।[৯৪]

২. যে সকল হাদীস দ্বারা উযুর প্রমাণ মিলে তার মধ্যে উযু থেকে শরয়ী উযু উদ্দেশ্য নয়। বরং শাব্দিক উযু উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হাত, মুখ ধৌত করা। এর দলীল হযরত ইকরাশ রাযি.এর হাদীস। যাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দাওয়াতে খাবার শেষ করে হাত ধৌত করলেন এবং হাতের ভিজা দিয়ে চেহারা হাত ও মাথা মুছলেন। এরপর বললেন,

يَا عِكْرَاشُ هٰذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ

ইকরাশ, এটাই আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পরের উযু।[৯৫]

৩. এই নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে ছিলো না। বরং মুস্তাহাব হিসেবে ছিলো। এর প্রমাণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উযু করা ও না করা উভয়টি প্রমাণিত। এটা মুস্তাহাব হওয়ার আলামত।

---

৯৩. তহাবী : ৫০।

৯৪. সুনানে আবু দাউদ : ১/২৫।

৯৫. জামে তিরমিযী : ২/৭।

الْوُضُوْءُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ

উটের গোশত খেলে উযু ভঙ্গ হওয়া

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, উটের গোশত খেলে উযু ভেঙ্গে যায়। কাঁচা খায় কিংবা রান্না করে।

দলীল : হযরত বরা বিন আযেব রাযি.এর বর্ণনা। তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে উটের গোশত খেলে উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, তা খেলে উযু করো।[৯৬] বুঝা গেলো, উটের গোশত উযু ভঙ্গকারী।

জবাব- ১ : উক্ত হাদীসে উযুর নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং মোস্তাহাব হিসেবে। যার প্রমাণ হলো, মু'জামে তবরানী ও কবীরের সে বর্ণনা, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের গোশতের সাথে উটের দুধ খাওয়ার দ্বারা উযু ভঙ্গ হওয়ার কথা বলেছেন।[৯৭] আর উটের দুধ খেলে ইমাম আহমদ রহ.এর দৃষ্টিতেও উযু ওয়াজিব নয়। তাহলে উটের গোশত খাওয়ার কারণেও উযু ওয়াজিব হবে না।

জবাব-২ : এখানেও উযু থেকে শরয়ী উযু উদ্দেশ্য নয়; শাব্দিক উযু অর্থাৎ হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য।

তিন ইমাম : তাদের মতে উটের গোশত খেলে উযু ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব।

---

৯৬. জামে তিরমিযী : ১/২৫।

৯৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ২/২৫০।

الْوُضُوْءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হওয়া

তিন ইমামের মতে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা উযু ভঙ্গের কারণ। ইমাম আহমদ রহ.এর মতে সর্বাবস্থায় এবং ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে যখন হাতের পেট দিয়ে হবে। মালেকী মাযহাবের কিতাব বেদায়াতুল মুজতাহিদে ফত্ওয়াযোগ্য উক্তি হলো, এক্ষেত্রে উযু সুন্নাত।

দলীল : হযরত বুসরা রাযি.এর হাদীস।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

" রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলো সে যেন উযু না করে নামায আদায় না করে।[৯৮]

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষাঙ্গকে স্পর্শ করা উযু ভঙ্গের কারণ।

ইমাম আযম রহ. বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা উযু ভঙ্গের কারণ নয়।

দলীল : হযরত তলাক বিন আলী রাযি.এর হাদীস,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

"রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা মাত্র শরীরের একটি গোশতের টুকরা অথবা (বলেছেন) একটি অংশ।"[৯৯]

তাছাড়া কিতাবে এই হাদীস বিস্তারিতও বর্ণিত আছে। তাতে আছে, এক ব্যক্তি বললো, কোনো ব্যক্তি নামাযের মাঝে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তাকে কি উযু করতে হবে? রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لَا إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ না। কেননা ওটা তোমার শরীরের একটি টুকরা।[১০০]

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে উযু ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণ হচ্ছে।

---

[৯৮]. জামে তিরমিযী : ১/২৫।

[৯৯]. জামে তিরমিযী : ১/২৫।

[১০০]. সুনানে আবু দাউদ : ১/২৪।

বিরোধ নিরসন : সনদের দিক থেকে উভয় দলের হাদীস দলীলযোগ্য। প্রত্যেকটি নিজস্থানে বহাল আছে। এমন সময় দুই হাদীসের মাঝে তাতবীক (সমম্বয় সাধন) দিতে হয়। অথবা কোনো একটিকে তারজীহ (প্রাধান্য) দিতে হয়। সুতরাং এখানে হযরত তলাক বিন আলীর হাদীসকে কয়েক কারণে প্রাধান্য প্রদান করা হলো।

১. হযরত তলাক বিন আলী রাযি.এর হাদীস স্পষ্ট। পক্ষান্তরে বুসরা রাযি.এর হাদীস অস্পষ্ট। একথা স্পষ্ট নেই যে, শাহওয়াতের সাথে স্পষ্ট করলে উযু ভঙ্গ হবে, নাকি শাহওয়াত ছাড়াও। পর্দাসহ ছুলে নাকি পর্দা ছাড়া ইত্যাদি।

২. অধিকাংশ বড় বড় সাহাবীদের উক্তি দ্বারা হযরত তলাক বিন আলী রাযি.এর হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। অথচ বুসরা রাযি.এর হাদীসের সমর্থনে শুধু হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর উক্তি পাওয়া যায়।

৩. কিয়াসও হানাফীদের সমর্থন করে। কারণ পেশাব পায়খানা যা মূলেই নাপাক, তা স্পর্শ করলে কারো দৃষ্টিতে উযু ভঙ্গ হয় না। তাহলে বিশেষ অঙ্গ যা সকলের মতে পাক, তা ধরলেও উযু ভঙ্গ হবে না।

[টিকা : লেখক উভয় হাদীসকে দলীলযোগ্য বলেছেন। কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ বুসরার হাদীসের সনদে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আছে। কারণ এই হাদীসের বর্ণনাকারী মারোয়ান। তিনি যখন ওরওয়া রহ. এর সামনে হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তিনি আমি শুনিনি বলে দিলেন। তখন মারোয়ান সত্যায়নের জন্য তার এক পুলিশকে বুসরার কাছে পাঠালেন। পুলিশ ফিরে এসে বললেন, বুসরা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই পুলিশ কে তা জানা যায়নি। তাছাড়া মারোয়ান তিনিও গ্রহণযোগ্য নয়। কিতাবে হাদীসটি সরাসরি ওরওয়ার সনদে বর্ণিত হলেও মাঝে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যম রয়েছে। বিষয়টি তোহফাতুল অলমায়ী ১/৩৩৯ তে তহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদ]

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الْقُبْلَةِ

চুমু দিলে উযু ভঙ্গ হওয়া

ইমাম মালেক রহ.এর মতে মহিলা স্পর্শ করা তিন শর্তসহ পাওয়া গেলে উযু ভঙ্গকারী। পূর্ণবয়স্ক, আজনবী, শাহওয়াতের সাথে স্পর্শকরণ।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে মহিলা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় উযু ভঙ্গকারী। বড় কিংবা ছোট, মাহরাম কিংবা আজনবী, শাহওয়াতের সাথে কিংবা শাহওয়াত ছাড়া। শুধু শর্ত হলো, পর্দাবিহীন হতে হবে।

দলীল : এই মাসয়ালায় কোনো হাদীস তাদের দলীল হিসেবে নেই। তবে তায়াম্মুমের বিধান সংক্রান্ত আয়াতের একটি অংশ اولامستم النساء যা অন্য এক কেরাতে لمستم আছে। এটাকে তারা দলীল বানিয়েছেন। তারা বলেন, এখানে হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য।

জবাব : উল্লিখিত আয়াতে لمستم শব্দ থেকে জেমা উদ্দেশ্য। হাতে স্পর্শ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং রইসুল মুফাস্‌সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. لمستم শব্দ থেকে জেমা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর এর সমর্থনে অন্য একটি আয়াত পেশ করেন,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

مس ও لمس শব্দ দুটির একই অর্থ। সুতরাং এই আয়াতে مس শব্দ থেকে যেমন জেমা উদ্দেশ্যে তেমনি لمس শব্দ থেকেও জেমা উদ্দেশ্য। তাছাড়া لامستم এর কেরাতও আমাদের সমর্থক। কারণ এই শব্দটি বাবে মুফাআলা থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেই ফেয়েল বাবে মুফাআলা থেকে আসে তার বাস্তবায়ন দুই পক্ষ থেকে হয়। আর এই ছুরত জেমার মধ্যেই হতে পারে। হাতে স্পর্শ করার মধ্যে হতে পারে না।

ইমাম আযম রহ. **বলেন,** মহিলাকে স্পর্শ করা উযু ভঙ্গকারী নয়। তবে যদি مباشرت فاحشه হয়।

দলীল : হযরত আয়েশা (রাযি.)এর হাদীস,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَاءِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোনো এক স্ত্রীকে চুমু দিলেন। এরপর উযু না করে নামাযের জন্য চলে গেলেন।" এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মহিলাকে স্পর্শ করা উযু ভঙ্গকারী নয়।

ইমাম আহমদ রহ. থেকে এই মাসয়ালায় পূর্বের তিন মতই আছে ।

الْوُضُوْءُ مِنَ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ

বমি ও নাকের রক্তের কারণে উযু ভঙ্গ হওয়া

ইমাম মালেক রহ.এর মতে বমি ও নাকের রক্ত উযু ভঙ্গকারী নয়।

দলীল : তার একটি উসূলী মাসআলা আছে। স্বভাবগত নাপাকী (অর্থাৎ যে নাপাকী সাধারণ প্রত্যেক মানুষের শরীর থেকে বের হয়। যেমন, পেশাব ও পায়খানা) স্বাভাবিক রাস্তা (অর্থাৎ পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা) থেকে বের হলে উযু ভঙ্গ হবে। নতুবা উযু ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং বমি ও নাকের রক্ত স্বভাবগত নাপাকীও নয় এবং যেখান থেকে বের হয় সেটা স্বাভাবিক রাস্তাও নয়। তাই উযু ভঙ্গ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে বমি এ নাকের রক্ত উযু ভঙ্গকারী নয়।

দলীল : তার মূলনীতি হলো, শুধু দুই রাস্তা থেকে যা বের হবে তাই উযু ভঙ্গকারী। আর বমি এ নাকের রক্ত দুই রাস্তা থেকে বের হয় না, তাই উযু ভঙ্গকারীও নয়। তাছাড়া হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেন যে, এক আনসারী সাহাবী নামায পড়ছিলেন। শত্রু নামাযের

মধ্যে তাকে তিনটি তীর মারে। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারপরও নামায পড়েছিলেন।[১০১]

বুঝা গেলো, দুই রাস্তা ছাড়া অন্য জায়গা থেকে যে নাপাকী বের হবে তা উযু ভঙ্গকারী নয়।

জবাব : এই সাহাবী (হযরত ওবাদা বিন বিশির রাযি.) প্রেমসাগরে ডুবে ছিলেন। অথবা তার এই মাসআলা জানা ছিলো না যে, শরীর থেকে রক্ত বের হলে উযু ভেঙ্গে যায়। নতুবা তিনি অবশ্যই নামায ছেড়ে দিতেন। তৃতীয়ত, এক সাহাবীর বিশেষ ঘটনা স্পষ্ট হাদীসের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ.এর মতে কফবিহীন বমি মুখ ভরে হলে উযু ভেঙ্গে যাবে। তেমনি শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত বের হলে উযু ভেঙ্গে যাবে। চাই তা নাক দিয়ে বের হোক কিংবা শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে।

اَلتَّسْمِيَةُ عَلَى الْوُضُوْءِ

উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা

আসহাবে যাওয়াহির বলে, উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ রহ. থেকে এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হাদীস,

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিবে না তার উযু হবে না।"[১০২] এছাড়া এই জাতীয় আরো কিছু হাদীস তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

জবাব : উল্লিখিত হাদীস لا শব্দটি পূর্ণতা নাকচ করার জন্য। উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে না তার উযু পূর্ণ হয় না। এখানে শুদ্ধতার নাকচ নয়। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন :

---

[১০১]. সুনানে আবু দাউদ : ১/২৬, সহীহ বুখারী : ১/২৯।

[১০২]. জামে তিরমিযী : ১/১৩, সুনানে আবু দাউদ : ১/১৪।

لَا صِيَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَه .

জামহুর ইমামগণ রহ. বলেন, সঠিক উক্তি মতে উযুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। চার ইমামের এক বর্ণনায় মুস্তাহাব হওয়ার কথাও আছে।

দলীল : বিসমিল্লাহ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর খবরে ওয়াহেদ দিয়ে কিতাবুল্লাহের ওপর যিয়াদাতী চলে না। দ্বিতীয়তঃ উযুর মাসআলা বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা ২২জনের অধিক। কিন্তু তাদের কেউ বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেননি। বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হলে তারা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। তৃতীয়তঃ কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহর সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলেছেন।[১০৩] অথচ আলহামদুলিল্লাহকে কেউ ওয়াজিব বলেননি। তারপরও বিসমিল্লাহ কিভাবে ওয়াজিব হলো।

الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

ইমাম আহমদ রহ. এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব।

দলীল : হযরত লাকিত বিন ছরিরার হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ "যখন তুমি উযু করবে তখন কুলি করো।"[১০৪]

---

১০৩. আসারুস সুনান : ৩০ মু'জামে তরবানী সগীর এর উদ্ধৃতিতে, মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ১/২২০।

১০৪. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৯।

হযরত সালমা বিন কইস রাযি.এর হাদীস । إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ "যখন তুমি উযু করবে, তখন নাক ঝেড়ে নাও ।"[১০৫]

উভয় রেওয়ায়েতে আমরের সিগাহ ব্যবহার করেছেন। যা ওয়াজিবের জন্য আসে। সুতরাং প্রমাণ হলো, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি ওয়াজিব।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ে যে আমরের সিগাহ ব্যবহার হয়েছে এটা ওয়াজিবের জন্য নয়। বরং মুস্তাহাবের জন্য। এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গ্রাম্য লোককে বলেছিলেন, تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ "আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি উযু করো।"[১০৬]

আর কুরআনের যেখানে উযুর আলোচনা আছে, সেখানে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা নেই । বুঝা গেলো, এ দুটি ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রহ.এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে সুন্নাত।

দলীল : তাদের দলীল হলো, হযরত আয়েশা (রাযি.)এর প্রসিদ্ধ হাদীস, عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ "দশটি কাজ সুন্নাত।"[১০৭] যার মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত আছে। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.এর হাদীস।[১০৮]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ

ইমাম আযম রহ. বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উযুতে সুন্নাত এবং গোসলে ফরজ।

---

১০৫. জামে তিরমিযী : ১/১৪।
১০৬. জামে তিরমিযী : ১/৬৬।
১০৭. সুনানে আবু দাউদ : ১/৮।
১০৮. সুনানে আবু দাউদ : ১/৮।

দলীল : উযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত হওয়ার দলীল সেই হাদীসগুলি যা শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের দলীল। আর এই দুটি বিষয় গোসলে ফরয হওয়ার দলীল কুরআনেই আছে।

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "তোমরা জুনুবী হলে খুব ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো।" এখানে গোসলের বিবরণে মুবালাগার সিগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো, জানাবাতের গোসলে উযুর চেয়ে মুবালাগা (অধিক) করতে হবে। আর মুবালাগার অনেক ছুরত হতে পারে। সেখানে এটাও আছে যে, যে সকল কাজ উযুতে সুন্নাত তা জানাবাতের গোসলে ফরযের মান দেওয়া হবে। মুহাম্মদ বিন সিরীনের বর্ণনা আছে,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবাতের গোসলে তিনবার নাকে পানি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[১০৯]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। তৃতীয়ত গোসলের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া এবং কখনো পরিহার না করা প্রমাণিত আছে। যা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হবে।

السِّوَاكُ

মেসওয়াক

মেসওয়াক নামাযের সুন্নাত নাকি উযুর সুন্নাত, এতে সামান্য ইখতিলাফ আছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে মেসওয়াক নামাযের সময়ও সুন্নাত।

দলীল : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর হাদীস,

---

১০৯. সুনানে দারাকুতনী : ১ /১১৫।

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

"আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করলে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[১১০]

জবাব : হাদীসে যেমন: عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ এসেছে এখানে একটি শব্দ উহ্য আছে। ইবারত হবে এমন : عند وضوء كل صلاة এর দলীল হলো, অন্য জায়গায় হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর বর্ণনায় مع الوضوء শব্দ বিদ্যমান আছে।[১১১] যার দ্বারা বুঝা যায়, মেসওয়াক উযুর সুন্নাত, নামাযের সুন্নাত নয়।

ইমাম আজম ও মালেক রহ. এর মতে মেসওয়াক শুধু উযুতে সুন্নাত।

দলীল : তাদের দলীল হলো, ঐ সকল হাদীস যাতে عند كل وضوء এবং مع الوضوء শব্দ আছে। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি কখনো নামাযের জন্য দাঁড়ানোর সময় মেসওয়াক করেছেন। তৃতীয়তঃ মেসওয়াক পবিত্রতার বিষয়। এর চাহিদা হলো, মেসওয়াককে উযুর সুন্নাত বলা হোক। নামাযের সুন্নাত নয়। চতুর্থতঃ নামাযের সময় মেসওয়াক করতে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হওয়ারও আশংকা আছে। যা শাফেয়ী মাযহার মতে উযু ভঙ্গকারী না হলেও পছন্দনীয় নয়।

مَسْحُ الرَّأْسِ

মাথা মাসেহ করা

উযুতে মাথা মাসেহ একবার করা হবে নাকি তিনবার?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে অন্যান্য অঙ্গের মতো মাথা মাসেহও তিনবার হবে।

---

১১০. সুনানে আবু দাউদ : ১/৭, তিরমিযী : ১ /১২।

১১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/২২১।

দলীল : হযরত ওসমান গণি রহ.এর হাদীস। যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ومسح راسه ثلاثًا "তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করলেন।"[১১২]

জবাব : এই হাদীসটি শায। কেননা, এছাড়া হযরত ওসমান রাযি.এর বাকি বর্ণনাগুলি একবার মাসাহ করার ওপর বুঝায়। যদি তার এই হাদীসকে সহীহ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এটাকে বৈধতার বিবরণ ধরে নেওয়া হবে।

তিন ইমাম : তাদের মাযহার হলো, মাথা মাসাহ একবার ।

দলীল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। যাতে আছে, فمسح براسه مرة واحدة "তিনি তার মাথা একবার মাসেহ করলেন।"[১১৩] এই হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, মাথা মাসাহ একবার। এছাড়া বহু হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া কিয়াস থেকেও এর সমর্থন মিলে। কেননা, শরীআতে অন্য যে সকল জায়গায় মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছে সেসব জায়গায় একবার বলেছে। যেমন : মোজা ও পট্টির ওপর মাসাহ করা।

مَسْحُ الأُذُنَيْنِ

দুই কান মাসাহ করা

কান মাসাহ করার জন্য কি নতুন পানি নিতে হবে? নাকি মাথা মাসাহ করার পর বেঁচে থাকা পানি যথেষ্ট হবে?

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া ওয়াজিব।

---

[১১২]. সুনানে আবু দাউদ : ১ / ১৪।

[১১৩]. সুনানে আবু দাউদ : ১/১১১।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর রেওয়ায়েত। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাসাহের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وأخذ ماءً جديدا لصماخيه فمسح صماخيه

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন এবং নতুন পানি দিয়ে দুই কান মাসাহ করেছেন।" [১১৪]

জবাব : উক্ত হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। কেননা, এতে আমর বিন আবান নামক একজন রাবী আছে। যিনি অপরিচিত। অথবা এটা ঐ সময়ের কথা যখন হাতের পানি একেবারে শুকিয়ে গেছে এবং মাথা মাসাহ করার পর হাতের ভিজা বাকি নেই। তখন আমাদের মতেও নতুন পানি নেওয়া সুন্নাত।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ. বলেন, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া জরুরী নয়। বরং মাথা মাসাহ করার পর বেঁচে থাকা পানি দিয়ে মাসাহ করা সুন্নাত। ইমাম মালেক রহ. থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হাদীসে আছে, الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ। কান মাথার অন্তর্ভুক্ত।"[১১৫]

একথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উদ্দেশ্য সৃষ্টির বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। বরং হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, কান মাথার অনুগামী। তাই কান মাসাহও মাথার সাথে একই পানি দিয়ে করতে হবে। আলাদা পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উযুর বিবরণদাতা বিভিন্ন সাহাবী একথা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা ও কান এক সাথে মাসাহ করেছেন। এটাও একথার স্পষ্ট দলীল যে, কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

---

[১১৪]. মা'আরেফুস সুনান : ১/১৮২।

[১১৫]. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৮, জামে তিরমিযী : ১/১৬।

اَلْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

পাগড়ীর ওপর মাসাহ

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, পাগড়ীর ওপর মাসাহ করা জায়েয আছে। ইমাম আওযায়ী ও ইসহাকের এটাই মত।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাতে আছে,

وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজা এবং পাগড়ীর ওপর মাসাহ করেছেন।" তাছাড়া হযরত সাওবান রাযি.এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোটদল অভিযানে পাঠালেন। তাদের ঠাণ্ডা লেগেছে। এরপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন, তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার ওপর মাসাহ করার নির্দেশ দিলেন।[১১৬]

জবাব : যে সকল হাদীসে পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার প্রমাণ পাওয়া যায়, জামহুরের পক্ষ থেকে তার বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার হাদীসগুলি খবরে ওয়াহেদ। যা দিয়ে কিতাবুল্লাহের ওপর যিয়াদাতী করা যায় না। আর কুরআনে শুধু মাথা মাসাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. যেই রেওয়ায়াতগুলিতে পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার কথা আছে, তা সংক্ষিপ্ত। মূলে ছিলো এমন مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِه وَعَمَامِته যেমনটি অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায়।[১১৭]

---

[১১৬]. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৯।

[১১৭]. জামে তিরমিযী-১/২৯।

৩. পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার বর্ণনাগুলির একটি জবাব ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁর মুআত্তাতে এভাবে দিয়েছেন যে, এগুলি মানসুখ হয়ে গেছে।

তিন ইমাম বলেন, পাগড়ীর ওপর মাসাহ জায়েয নেই।

দলীল : কুরআনের আয়াত وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ এই আয়াত একথার ওপর অকাট্যভাবে বুঝায় যে, নির্ধারিত পরিমাণের মাসাহ (হানাফীদের মতে মাথার চার ভাগের এক ভাগ, শাফেয়ীদের মতে এক চুল বা তিন চুল) মাথার ওপরই হতে হবে। অন্য কিছুর ওপর হলে চলবে না।

তবে ফরয পরিমাণ মাসাহ করার পর বাকি মাথা মাসাহ করা সুন্নাত। বাকিটুকু পাগড়ীর ওপর করলে আদায় হবে কিনা? ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে বাকি মাসাহ পাগড়ীর ওপর করলে আদায় হবে। হানাফিয়া ও মালিকিয়াদের মতে আদায় হবে না।

ওড়না : মহিলাদের ওড়নার ওপর মাসাহ করার ক্ষেত্রে একই ইখতিলাফ।

الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোজার ওপর মাসাহ

মোজার ওপর মাসহের মাসআলা তাওয়াতুর দ্বারা প্রমাণিত। রাফেযী ও খারেজীরা ছাড়া কেউ এটা অস্বীকার করে না। তবে এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে যে, মুসাফির ও মুকীম মোজার ওপর কতদিন পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, মোজার ওপর মাসাহ করার জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। বরং মানুষ যতদিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারবে।

দলীল : হযরত খোযায়মা রাযি.এর হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

এরপর বর্ণনায় আছে, ولواستزدنا لزادنا "আমরা বেশির আবেদন করলে বাড়িয়ে দিতেন।[১১৮] বুঝা গেলো, মাসাহের এই সময় সুনির্দিষ্ট নয়। বরং এর মধ্যে বাড়ানোর সুযোগ আছে। অন্য এক হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। যাতে আছে, এক সাহাবী মাসাহের সময় জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সাত দিন পর্যন্ত পৌঁছলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাঁ বলেছেন। সাথে সাথে অতিরিক্তেরও অনুমতি দিয়েছেন। এভাবে বলেছেন, ما بدالك তুমি যতদিন চাও (মাসাহ করতে পারো)[১১৯]

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো, তাতে যে অতিরিক্ত আছে, ولواستزدنا لزادنا আমরা বাড়িয়ে চাইলে বাড়িয়ে দিতেন। এই অতিরিক্ত অংশ সহীহ নয়। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, সনদের দিক থেকে এই হাদীস দুর্বল। তাই দলীলযোগ্য নয়।

তিন ইমামের মতে, মাসহের সময় নির্দিষ্ট। যা মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত।

দলীল : হযরত খুযায়মা বিন সাবেত রাযি.এর হাদীস।

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ.

---

১১৮. সুনানে আবু দাউদ : ১/২১।
১১৯. সুনানে আবু দাউদ : ১/২১।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে মাসাহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তখন তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য তিনদিন, মুকীমের জন্য একদিন। (মাসাহ করা জায়েয)[১২০]

হাদীসটি সহীহ এবং জামহুরের মাযহাবের বিষয়ে স্পষ্ট। এছাড়া হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আলী রাযি. প্রমুখ সাহাবীর হাদীসও তাদের দলীল।

اَلْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

জাওরাবের ওপর মাসাহ করা

উলের মোজাকে জাওরাব বলে। এটা দুই প্রকার। মোটা ও পাতলা। মোটা বলতে এমন মোজা যার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে। ১. তার মধ্যে সহজে পানি ঢুকে না। ২. কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা ছাড়া নলার সাথে লেগে থাকে। ৩. এটা পরিধান করে দুই তিন মাইল চলা যায়। পাতলা বলতে সে সকল মোজা যাতে এই শর্তগুলি পাওয়া যাবে না। এরপর এই দুই প্রকারের প্রত্যেকটি তিন প্রকার। ১. **মুজাল্লাদ :** যে মোজার উপরে নীচে চামড়া লাগানো থাকে। ২. **মুনা'আল :** যে মোজার শুধু নীচে চামড়া লাগানো থাকে। ৩. **খালি :** যে মোজার কোথাও চামড়া লাগানো নেই।

বিধান : মোটার তিন প্রকার (মুজাল্লাদ, মুনা'আল, খালি) সবগুলির ওপর সর্বসম্মতক্রমে মাসাহ করা জায়েয। (মোটা খালি মোজার ওপর মাসাহ সম্পর্কে প্রথমে ইমাম আযম রহ. নাজায়েয হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন) আর পাতলা মোজার এক প্রকার হচ্ছে মুজাল্লাদ। এর ওপর সর্বসম্মতক্রমে মাসাহ জায়েয। আরেক প্রকার খালি। এর ওপর সকলের মতে মাসাহ জায়েয নেই। তৃতীয় প্রকার মুনা'আল। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

---

১২০. জামে তিরমিযী : ১/২৭।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর ওপর মাসাহ্ জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এর ওপর মাসাহ্ জায়েয নেই।

মুতাকদ্দিমীন হানাফীদের ইবারত এ বিষয়ে নীরব। তবে মুতাআখখিরীন আলেমদের অধিকাংশের মত হলো, এর ওপর মাসাহ নাজায়েয। (মুহতারাম উস্তাদের কাছে অধিকাংশ দারুল ইফতা থেকে এমন ফত্ওয়া এসেছে)।

ফায়েদা : জাওরাবের ওপর মাসাহ্ সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা আছে। হযরত আবু মূসা আশআরী, হযরত বেলাল ও হযরত মুগীরা বিন শো'বা রাযি. থেকে বর্ণিত। যার মধ্যে দুটি যয়ীফ, আর তৃতীয়টি ইখতিলাফপূর্ণ।[১২১]

মোটকথা কোনো হাদীস এ কথার যোগ্য নয় যে, যার ওপর ভিত্তি করে কিতাবুল্লাহর বিবরণে সংযোজন করা যাবে। তবে মোজার ওপর মাসাহ তাওয়াতুরের দ্বারা প্রমাণিত। তাই জাওরাবের যে সকল প্রকারের মধ্যে মোজার শর্ত পাওয়া যাবে সেগুলি ইল্লাতের মধ্যে শরিক হওয়ার ভিত্তিতে মোজার বিধান লাগানো হবে এবং তার ওপর মাসাহ্ জায়েয হবে। আর যেগুলির মধ্যে মোজার শর্ত পাওয়া যাবে না। সেগুলিতে মোজার বিধান লাগানো হবে না। তাই তার ওপর মাসাহও জায়েয হবে না।

غُسْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

পুরুষ ও মহিলার গোসল

মহিলা ও পুরুষের গোসলে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রহ. বলেন, মহিলা ও পুরুষের গোসলে কোনো পার্থক্য নেই। চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে গেলে চুল খোলা জরুরি নয়।

---

[১২১]. দুরুসে মাদানিয়া : ১/১৭৬।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, জানাবতের গোসলের সময় উভয়ের জন্য চুল খোলা জরুরি নয়। তবে হায়েয ও নেফাসের গোসলে মহিলার জন্য চুল খোলা জরুরি।

ইমাম আযম রহ. বলেন, মহিলার চুলের গোড়া পর্যন্ত যদি পানি পৌঁছে যায় তাহলে চুল খোলা জরুরি নয়। জানাবতের গোসল হোক, কিংবা হায়েয, নেফাসের গোসল হোক। কিন্তু পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় চুল খোলা জরুরি।

দলীল : পুরুষ ও মহিলার গোসলের মধ্যে এই পার্থক্য হযরত সাওবান রাযি. এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

যাতে আছে, أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পুরুষ চুল খুলে গোসল করবে। বুঝা গেলো পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় চুল খোলা জরুরি। আর মহিলাদের সম্পর্কে বলেছেন, وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا "মহিলা খুলতে হবে না।[১২২] বুঝা গেলো, মহিলাদের জন্য (চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছলে) চুল খোলা জরুরি নয়। এটাই আমাদের মাসলাক।

غُسْلُ الْجُمْعَةِ

জুমার গোসল

যাহেরিয়া : তাদের মতে জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব।

দলীল : তারা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

[১২২]. সুনানে আবু দাউদ : ১/৩৪।

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"জুমার দিন গোসল করা প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির জন্য জরুরি।"[১২৩]

জবাব : উক্ত হাদীসে ওয়াজিব শব্দ তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ফোকাহাদের পরিভাষার প্রসিদ্ধ ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়। আল্লামা খত্তাবী রহ. বলেন, এখানে উজুব দ্বারা ঐচ্ছিক ও মুস্তাহাব উজুব উদ্দেশ্য। ফরয উজুব উদ্দেশ্য নয়।[১২৪]

জামহুর : তারা বলে জুমার দিনের গোসল সুন্নাত।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

"জুমার দিন যে উযু করলো এটা ভালো, আর যে গোসল করলো, গোসল উত্তম।"[১২৫]

উল্লিখিত হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জুমার দিন গোসল ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত ও মুস্তাহাব। তাছাড়া একদিন হযরত ওসমান রাযি. গোসল না করে জুমার নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলেন। হযরত ওমর রাযি. খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি হযরত ওসমান রাযি.এর ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। এরপরও তিনি সেভাবেই নামায আদায় করলেন। বুঝা গেলো জুমার গোসল ওয়াজিব নয়।

চার ইমামের দৃষ্টিতে, এই গোসল নামাযের জন্য। তাই নামাযের পরে গোসল করলে ফযিলত পাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ ও দাউদ যাহেরীর মতে দিনের জন্য। সুতরাং তাদের মতে নামাযের পরেও গোসল করা সাওয়াবের কারণ।

---

[১২৩]. আবু দাউদ : ১/৪৯।

[১২৪]. বযলুল মাজহুদ : ১/২০৮।

[১২৫]. জামে তিরমিযী : ১/১১১।

اَلْغُسْلُ بَعْدَ الإِسْلَامِ

ইসলাম গ্রহণের পর গোসল করা

ইমাম আহমদ রহ.এর **মতে,** ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব।

তিন ইমামের মতে, জানাবাত অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে গোসল করা ওয়াজিব। নতুবা গোসল করা মুস্তাহাব।

ফায়েদা : হানাফিয়াদের মতে জানাবাতের গোসল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করে ফেললে, ইসলাম গ্রহণের পর তা গ্রহণযোগ্য হবে। জামহুর ইমামদের মতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তাদের মতে জানাবাতের গোসলের জন্য নিয়াত জরুরী। তাই তাদের মতে ইসলাম গ্রহণের পর তাকে পুনরায় গোসল করতে হবে।

بَحْثُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুমের আলোচনা

এখানে দুটি মাসআলা। ১. তায়াম্মুমের জন্য হাত মারা কতবার? ২. মাসাহ কোন পর্যন্ত করা হবে?

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, তায়াম্মুমে শুধু একবার হাত মারবে। আর হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে।

দলীল : হযরত আম্মার রাযি.এর হাদীস,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চেহারা এবং হাত মাসাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[১২৬]

---

[১২৬]. জামে তিরমিযী : ১/৩৬।

এই হাদীসে হাতের জন্য كفين শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার ব্যবহার শুধু কব্জির জন্য হয়। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা কব্জি পর্যন্ত মাসাহ প্রমাণিত হয়। এভাবে হযরত আম্মার রাযি.এর অন্য হাদীস থেকে একবার হাত মারার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২৭]

জবাব : হযরত আম্মার রাযি.এর যেহেতু একথা জানা ছিলো না যে, জানাবাতের তায়াম্মুমও সেটাই যেটা হদসে আসগরের তায়াম্মুম। তাই তিনি জানাবাত অবস্থায় তায়াম্মুমের ইচ্ছায় পূরা শরীরে মাটি মেখেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানতে পেরে তাকে পূর্ণ তায়াম্মুম করে দেখাননি। শুধুমাত্র আমলীভাবে সামান্য তায়াম্মুমের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। এই ইঙ্গিতের কথাই হযরত আম্মার রাযি.এর হাদীসে উল্লেখ আছে। এখন যদি সেই ইঙ্গিত হিসেবে করা তায়াম্মুম (অর্থাৎ একবার হাত মারা ও কব্জি পর্যন্ত মাসাহ)কে কেউ পূর্ণ তায়াম্মুম মনে করে তাহলে এটা কিভাবে সহীহ হতে পারে।

তিন ইমাম বলেন, তায়াম্মুমের জন্য দুইবার হাত মারতে হবে। একটি চেহারার জন্য আরেকটি হাতের জন্য। আর হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

عن جابر عَن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضَرْبَةٌ للوجه وضربة للذرا عين إلى المرفقين .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তায়াম্মুমে একবার হাত মারবে চেহারার জন্য, আরেকবার হাত মারবে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য।[১২৮]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর মারফু হাদীস[১২৯]

---

[১২৭]. সহীহ মুসলিম : ১/১৬১।

[১২৮]. দারা কুতনী : ১/১৮১।

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضَرْبَةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين .

এই হাদীসগুলি স্পষ্ট একথা প্রমাণ করে যে, তায়াম্মুমে হাত মারা দুইবার এবং দুইহাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। কব্জি পর্যন্ত নয়।

حُكْمُ فَاقِدِ الطُّهُوْرَيْنِ

পবিত্রতা অর্জনের বস্তু দুটি না পাওয়ার বিধান

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাক পানি ও পাক মাটি উভয় জিনিস পাবে না, সে কী করবে? পবিত্রতা ছাড়াই নামায আদায় করবে, নাকি কাযা করবে? এক্ষেত্রে চার ইমামের ভিন্ন ভিন্ন মত।

ইমাম মালেক রহ. **বলেন**, এমন ব্যক্তি নামায পড়বেও না, কাযাও করবে না।

দলীল : এমন ব্যক্তি নামাযের যোগ্যই নয়। কেননা নামাযের যোগ্যতা পবিত্রতার সাথে। পবিত্রতা যখন নেই তাহলে আদায় রহিত হয়ে যাবে। আর তার পক্ষ থেকে যেহেতু কোনো অবহেলা নেই তাই কাযাও রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. **বলেন,** এমন ব্যক্তি তখন তো পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায় করবে। পরে যখন পবিত্রতা অর্জন হবে তা কাযা করবে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের নির্দেশ দিবো, তখন সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো।"[১৩০] আর এখানে এই ব্যক্তির পবিত্রতা

---

১২৯. দারা কুতনী : ১/১৮০, মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/১৭৯।

১৩০. সুনানে ইবনে মাজাহ।

ছাড়াই পালন করার সামর্থ আছে। তাই তখন পবিত্রতা ছাড়াই নামায আদায় করবে। পরে নিয়ম অনুসারে কাযা করবে।

ইমাম আহমদ রহ. **বলেন,** এমন ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়াই নামায আদায় করবে, পরে কাযা করবে না।

দলীল : সে এতটুকুরই শক্তি রাখে। এর চেয়ে বেশি শক্তি রাখে না। তাই ঐ অবস্থাতেই তার নামায গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। নামায যখন গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলো, এখন আর কাযা করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আযম রহ. **বলেন,** এমন ব্যক্তি নামায আদায় করবে না। বরং কাযা করবে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ "পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায় হয় না।"[১৩১] এর দ্বারা বুঝা গেলো, এমন ব্যক্তি নামায আদায় করবে না। তবে যখন পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে তার ওপর কাযা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ছাহেবাঈন : তারা বলেন, সে যদিও তখন নামাযের যোগ্য নয়। তবে নামাযীর মতো সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। তাতে কেরাত ইত্যাদি কিছুই পাঠ করবে না। পরবর্তীতে পবিত্রতা অর্জন হলে কাযা করবে। এই উক্তিটি ফিকহের দৃষ্টিতে বেশি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। ইমাম আযম রহ. এই উক্তি গ্রহণ করার কথা প্রমাণিত আছে। হানাফীদের কাছে এটাই ফত্ওয়াযোগ্য উক্তি।

দলীল : এমন ব্যক্তিকে অন্য ইবাদতের ওপর কেয়াস করে মুসল্লীর সাদৃশ্য অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হবে। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, রমযান মাসের দিনে বেলায় বাচ্চা বালেগ হলো অথবা কাফের ইসলাম গ্রহণ করলো অথবা হায়েয়া মহিলা পাক হলো, তাহলে এদের

---

[১৩১]. জামে তিরমিযী : ১/৩, সহীহ মুসলিম : ১/১১৯।

বাকি দিন রোযাদারের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা অর্থাৎ বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৩২]

এখানেও এমনি ছুরত, তাই তাকে মুসল্লীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হবে।

كَلِمَاتُ الأَذَانِ

আযানের বাক্য

আযানের বাক্যের সংখ্যার মধ্যে ইখতিলাফ আছে। যার ভিত্তি হলো তারজীর ওপর। তারজীর অর্থ হলো আযানের মধ্যে সাক্ষ্য সংক্রান্ত যেই ৪টি বাক্য আছে, সেগুলির প্রত্যেকটি দুই দুই বার বলা। প্রথমে নিম্ন আওয়াজে বলবে পরে উচ্চ আওয়াজে বলবে। এভাবে বাক্যগুলি ৪টির স্থানে ৮টি হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে, আযানে তারজী উত্তম। তাই আযানের বাক্য যা ১৫টি ছিলো এখন তারজীসহ তাদের দৃষ্টিতে ১৯টি হয়ে যাবে।

দলীল : হযরত আবু মাহযুরা রাযি.এর হাদীস। যাতে আছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযানে তারজী' শিক্ষা দিয়েছেন।"[১৩৩]

জবাব : এই হাদীসের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। ১. সেটা তারজী ছিলো না বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালীমের উদ্দেশ্যে বারবার পুনরাবৃত্তি করে ছিলেন। ২. প্রথমবার যখন হযরত আবু মাহযুরাকে ৪ বাক্য বলিয়ে ছিলেন সেটা আযানের জন্য ছিলো না। বরং এটা তো তাকে মুসলমান বানানোর জন্য ছিলো। তবে দ্বিতীয়বার আযানের জন্য বলিয়েছিলেন। তাই আযানের বাক্য চারটিই আছে। ৩.

---

১৩২. মাআরেফুস সুনান : ১/৩২।

১৩৩. সহীহ মুসলিম : ১/১৬৫, জামে তিরমিযী : ১/৪৮।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ রহ. বলেন, আযানের এই ইখতিলাফ কুরআনের সাত কেরাতের ইখতিলাফের মতো। এগুলির মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পড়া জায়েয আছে। এখানেও সেই ছুরত। তারজী ও তারজী বিহীন দুটিই জায়েয আছে। তবে আমরা তারজী বিহীন এজন্য গ্রহণ করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মুয়াযযিন হযরত বেলাল রাযি. এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ রাযি.এর বর্ণনা যা আযানের অধ্যায়ে মূলের স্থান রাখে তা তারজী' বিহীন বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালেক রহ.**এর মতেও** আযানে তারজী উত্তম। কিন্তু তিনি শুরুর চার তাকবীরের মধ্যে দুই তাকবীর বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই তার মতে আযানের বাক্য ১৭টি।

দলীল : তারজীর প্রমাণের জন্য তার দলীল সেটিই যেটা ইমাম শাফেয়ী রহ.এর দলীল।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ. **বলেন,** আযানের তারজী উত্তম নয়। তাই আযানের বাক্য শুধু পনেরটি।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বিন আবদে রাব্বিহী রাযি.কে স্বপ্নে যেই আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো তাতে তারজী ছিলো না।[১৩৪] তাছাড়া হযরত বেলাল রাযি.এর শেষ আমলও তারজী বিহীন।[১৩৫]

[শায়খুল হাদীস পালনপুরী দা. বা. বলেন, আযানের তারজীর ইখতিলাফ এখন শুধু আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। এখন শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের আযানেও তারজী নেই। তিনি আরো বলেন, তারজী হযরত আবু মাহযুরা রাযি.এর ব্যক্তিগত বিশেষ আমল। কারণ সাহাবায়ে কেরামের নীতি ছিলো, তারা যে কারণে ইসলামের দৌলত লাভ করেছেন, তারা সেটাকে স্মৃতি হিসেবে চিরদিন ধরে রেখেছেন। আবু মাহযুরা রাযি. এর ভাগ্যাকাশে যেহেতু তারজীর কারণে চাঁদ উঠেছে, তাই তিনি মরণ

---

[১৩৪]. সুনানে আবু দাউদ : ১/৭২।

[১৩৫]. শরহে মাআনিল আসার।

পর্যন্ত তারজীসহ আযান দিয়েছেন। এমনকি তাঁর বংশের সকলে তারজীসহ আযান দিতেন।- অনুবাদক]

كَلِمَاتُ الإِقَامَةِ

ইকামতের বাক্য

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে, ইকামতের বাক্য ১১টি। কেননা তাদের মতে শুরুতে তাকবীর শুধু দুইবার। শাহাদাতাইন ও হাইআলাতাইন এক একবার।

ইমাম মালেক রহ.এর মতে, ইকামতের বাক্য শুধু ১০টি। কেননা তার মতে, قدقامت الصلاةও একবার।

দলীল : তারা ইকামতের বাক্য একবার একবার হওয়ার পক্ষে হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস পেশ করে। যাতে আছে,

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ

"এই হাদীসে ইকামত বেজোড়া বাক্য দিয়ে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুধু একবার করে বলা হবে।[১৩৬]

জবাব : আল্লামা ওসমানী রহ. বলেন, সহীহ কথা হলো, সহীহ হাদীসসমূহে تشفيع (দুইবার করে বলা) এবং ايتار (একবার করে বলা) উভয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই একবার করে বলা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মাসআলা হলো, কোনটি প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং হানাফীরা تشفيعকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ ও হযরত বেলালের শেষ আমল এটাই বর্ণিত আছে।

---

১৩৬. জামে তিরমিযী : ১/৪৮, সহীহ মুসলিম : ১/১৬৪।

ইমাম আযম রহ.এর মতে, ইকামতের বাক্য ১৭টি। যার ১৫টি আযানের বাক্য। আর দুইবার قد قامت الصلاة যুক্ত হবে।

দলীল : ইমাম আযম রহ. ঐ সকল হাদীসগুলি গ্রহণ করেছেন, যাতে مثنى مثنى ও شفعا شفعا শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ইকামতের বাক্যগুলি দুই দুইবার বলা হবে। তখন ইকামতে বাক্য قدقامت الصلاة সহ ১৭ বাক্য হয়ে যাবে। এটাই আমাদের মত।

كِتَابُ الصَّلَاةِ

নামায অধ্যায়

وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযের সময়

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. বলেন, ফজরের নামায (غلس) অন্ধকারে (ফজর হওয়ার পরের অন্ধকার) পড়া উত্তম।

দলীল : হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ানোর পর মহিলারা চাদর মুড়ি দিয়ে এভাবে চলে যেতো যে অন্ধকারের কারণে চিনা যেতো না।[১৩৭] বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের অন্ধকারে পড়তেন। হযরত আবু বকর ও ওমর রাযি. অন্ধকারেই নামায পড়তেন।

জবাব : হাদীসের মধ্যে من الغلس শব্দটি হযরত আয়েশা (রাযি.) এর নয়। বরং তার কথা ما يعرفن পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তার উদ্দেশ্য ছিলো, মহিলারা চাদর মুড়িয়ে আসতো। তাই তাদেরকে চেনা যেতো না। কোনো রাবী একথা বুঝেছেন যে, না চেনার কারণ অন্ধকার ছিলো। তাই তিনি من الغلس শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং ইবনে মাযাতে (১/৪৯) এবং সহীহ মুসলিমে (১/২৩০) এই রকম একটি হাদীস আছে। যার দ্বারা উক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। বাকি থাকলো হযরত আবু বকর ও ওমরের মাসআলা। তারা অন্ধকারে নামায শুরু করা প্রমাণিত আছে। কিন্তু তারা অন্ধকারেই নামায শেষ করতেন, একথা প্রমাণিত নেই। বরং এর উল্টা প্রমাণিত আছে। তৃতীয় জবাব হলো, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১৩৭. সহীহ বুখারী : ১/৮২, সহীহ মুসলিম : ১/২৩০, জামে তিরমিযী : ১/৪০।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজস্ব আমল ছিলো, উম্মতের জন্য নির্দেশ ছিলো না। বরং তাদের জন্য ফর্সা করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আযম ও মালেক রহ. **বলেন,** ফজরের নামায ফর্সা হলে পড়া উত্তম।

দলীল : হাদীসে মারফু' أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ "তোমরা ফজরের নামায ফর্সা হলে পড়ো, কেননা এতে সাওয়াব বেশি"।[১৩৮]

বুখারী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায এমন সময় শেষ করতেন, যখন মানুষ নিজ সাথীকে চিনতে পারতো।[১৩৯] আর একে অপরকে চিনতে পারা আলোতেই হতে পারে। অন্ধকারে চেনা যায় না। বুঝা গেলো, ফজরের নামায ফর্সা হলেই পড়া উত্তম।

[*তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তোহফাতুল আলমায়ীতে উদ্ধৃত আছে, হাদীসের বিবরণের দ্বারা বুঝা যায়, মাসজিদে নববীতে ফজরের নামায গলসে হতো। কারণ সাহাবায়ে কেরাম তাহাজ্জুদের সময় মাসজিদে চলে আসতেন। তাই সেখানে গলসে ফজরের নামায পড়া সমীচিন ছিলো। যেমন আমরা রমযান মাসে গলসে ফজরের নামায পড়ি। তবে মদীনাতে আরো নয়টি মাসজিদ ছিলো। সেগুলিতে ফজরের নামায এসফারে হতো। যেমন মাসজিদে কোবা মাসজিদে নববী থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কেবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এক সাহাবী মাসজিদে নববীতে ফজরের নামায পড়ে মাসজিদে কোবাতে গেলেন। গিয়ে দেখেন কোবাবাসী নামাযরত আছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, সেখানে ফজরের নামায এসফারে শুরু হয়েছে। তাছাড়া*

---

[১৩৮]. জামে তিরমিযী : ১/৪০।

[১৩৯]. সহীহ বুখার : ১/৭৮।

অন্যান্য মাসজিদে ফজরের নামায গলসে হওয়ার কোনো দলীল নেই। - অনুবাদক]

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যোহর ও আসরের নামাযের সময়

তিন ইমাম বলেন, বস্তুর ছায়া এক মিসিল হলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাতে আছে,

ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ

"এরপর জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসরের নামায পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে গিয়েছিলো।"[১৪০] বুঝা গেলো, প্রথম মিসিলে যোহরের সময় শেষ হয়ে আসরের সময় শুরু হয়ে যায়।

জবাব : হাদীসে জিব্রাইল আসরের নামাযের ক্ষেত্রে মানসুখ। কেননা এই হাদীসটি মাক্কী। আর অন্য যেই হাদীসে দুই মিসিলের প্রমাণ পাওয়া যায় তা মাদানী। তাই মাক্কী হাদীস দলীল হতে পারে না।

ইমাম আযম রহ. **বলেন,** যোহরের সময় দুই মিসিল পর্যন্ত থাকে। তারপর আসরের সময় শুরু হয়ে যায়।

দলীল : হাদীসে আছে,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"যখন গরম প্রচন্ড হবে নামায ঠান্ডা করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের জোশের কারণে।"[১৪১]

---

[১৪০]. জামে তিরমিযী : ১/৩৮।

[১৪১]. জামে তিরমিযী : ১/৪০, সহীহ বুখারী : ১/৭৬, সহীহ মুসলিম : ১/২২৪, সুনানে আবু দাউদ : ৫৮, ৫৯।

এই হাদীসে তীব্র গরমের সময় যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আরব দেশে এক মিসিল পর্যন্ত প্রচন্ড গরম থাকে। বুঝা গেলো, যোহরের নামাযের সময় এক মিসিলের পরেও থাকে।

হযরত জাবের রাযি.এর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছাড়া দুই মিসিল হয়ে গিয়েছিলো।[১৪২] এই হাদীসটিও হানাফী মাসলাকের স্পষ্ট দলীল যে, আসরের সময় দুই মিসিলের পর শুরু হয়।

[আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি প্রয়োজন হলে সাহেবাঈনের মতানুযায়ী আমল করার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক মিসিলের পর আসরের নামায পড়তে পারবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -অনুবাদক]

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ

নামাযের তাহরীম হলো তাকবীর

তিন ইমামের মতে তাকবীর শব্দ দিয়ে নামায শুরু করা ফরয। তাকবীর শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দিয়ে যদি নামায শুরু করে তাহলে নামায হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর উক্তিও এমনি।

এরপর তিন ইমাম ও ইমাম আবু ইউসুফের মাঝে তাকবীরের সিগা নির্ধারণের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে গেছে। সুতরাং ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ.এর মতে তাকবীরের সিগা শুধু আল্লাহু আকবার। আর ইমাম শাফেয়ী আল্লাহু আকবারের সাথে আল্লাহুল আকবারকে যোগ করেন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকবীরের সিগা চারটি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহুল আকবার, আল্লাহু কাবীর, আল্লাহুল কাবীর।

---

[১৪২]. তানযীমুল আশতাত : ১/২২২।

দলীল : হাদীসে নববী تحريمها التكبير নামাযের তাহরীম হলো তাকবীর।[১৪৩] এই হাদীসে التكبير শব্দটি খবর। আর কায়েদা আছে, খবর আলিফ লাম যুক্ত হলে, হাছরের ফায়দা দেয়। সুতরাং এখানেও হাছরের অর্থ সৃষ্টি হবে। উদ্দেশ্য হবে নামায শুধু তাকবীর দ্বারাই শুরু করা যায়। অন্য কোনো শব্দ দিয়ে নয়।

জবাব : উপরোক্ত হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ। আর খবরে ওয়াহেদ দিয়ে ওয়াজিব প্রমাণিত হতে পারে। ফরয প্রমাণ হতে পারে না। তাই উল্লিখিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে তাকবীর ফরয বলা সহীহ নয়।

ইমাম আযম রহ.**এর মতে,** নামায এমন যিকিরের দ্বারা শুরু করা ফরয যা সম্মান প্রকাশমূলক হয়। তাকবীরের সিগার কোনো বিশেষত্ব নেই। যেমন– আল্লাহু আজাল, আল্লাহু আ'যম ইত্যাদি। তবে উল্লিখিত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিয়মিত আমলের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহু আকবার দিয়ে নামায শুরু করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই কেউ যদি এছাড়া অন্য কোনো শব্দ দিয়ে নামায শুরু করে তাহলে ফরয তো আদায় হয়ে যাবে, ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।

দলীল : তাকবীরের সিগা ফরয না হওয়ার ওপর হানাফীদের পক্ষ থেকে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা হয়– وذكر اسم ربه فصلى এখানে শুধু আল্লাহর নাম নিয়ে নামায শুরু করার কথা বলা হয়েছে। তাকবীরের সিগার কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া تحريمها التكبير ও যেহেতু খবরে ওয়াহেদ, তাই এর দ্বারাও ফরয না হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

[১৪৩]. জামে তিরমিযী : ১/৫৫, সুনানে আবু দাউদ : ১/৯১।

تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

নামাযের তাহলীল হলো তাসলীম

তিন ইমামের মতে السلام عليكم বলে নামায শেষ করা ফরয। তাই কোনো ব্যক্তি যদি সালামের সিগা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে নামায শেষ করে তাহলে নামায হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর উক্তিও এমনি।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, تحليلها التسليم "নামায থেকে হালালকারী বস্তু সালাম। এই বাক্যেও খবরটি আলিফ লাম যুক্ত। তাই হাছরের ফায়েদা দিবে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হবে নামায শুধু السلام عليكم বলেই শেষ করা যায়। অন্য কোনো শব্দ দিয়ে নয়।

জবাব : খবরে ওয়াহেদ দিয়ে ফরয হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না। শুধু ওয়াজিব প্রমাণিত হবে।

ইমাম আযম রহ. ও **মুহাম্মদ** রহ. বলেন, নামায এমন কাজ দিয়ে শেষ করা ফরয, যা নামাযের বিপরীত আমল। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিয়মিত আমলের কারণে সালাম শব্দ দিয়ে নামায শেষ করা ওয়াজিব বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ সালাম শব্দ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে নামায শেষ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।

দলীল : উল্লিখিত হাদীস تحليلها التسليم যেহেতু খবরে ওয়াহেদ তাই খবরে ওয়াহেদ দিয়ে ওয়াজিব প্রমাণিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.কে তাশাহ্হুদ শিখিয়ে বলেছিলেন,

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

"তুমি যখন এটা পড়ে নিয়েছো, তুমি নামায পুরা করে ফেলেছো। এবার চাইলে দাড়াতে পারো, চাইলে বসে থাকতে পারো।"[১৪৪] বুঝা গেলো তাশাহ্হুদের পর আর কিছু ফরয নেই।

التَّسْمِيَةُ فِيْ الصَّلَاةِ

নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া

ইমাম মালেক রহ.এর মতে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া শরীআত সম্মত নয়; বরং বিদআত।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রাযি.এর হাদীস। তার ছেলে যখন নামাযে বিসমিল্লাহ পড়লেন, তিনি নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন এটা বিদআত।[১৪৫]

জবাব : তিনি বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেননি; বরং উচ্চ আওয়াজে পড়তে নিষেধ করেছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, জাহরী নামাযে উচ্চ আওয়াজে এবং সিররী নামাযে নিম্ন আওয়াজে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

দলীল : এই মাসআলায় তাদের সবচেয়ে মজবুত দলীল হলো, নাঈম বিন মুজমারের হাদীস। তাতে তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা

---

১৪৪. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৯।
১৪৫. জামে তিরমিযী : ১/৫৭।

রাযি.এর পিছনে নামায আদায় করেছি, তিনি প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন, এরপর সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন।[১৪৬]

হযরত আনাস রাযি. হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি.এর ঘটনা উদ্ধৃত করেন যে, একবার হযরত মুআবিয়া রাযি. মদীনাতে নামায পড়াতে গিয়ে বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন না। তখন চারদিক থেকে আওয়াজ আসতে থাকে। আপনি নামাযে চুরি করেছেন, কিংবা ভুলে গেছেন। এরপর তিনি নিয়মিত বিসমিল্লাহ পড়তেন।[১৪৭]

জবাব : প্রথম বর্ণনাটি শায এবং দ্বিতীয়টি মা'লূল। তাই দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ.এর মতে প্রত্যেক নামাযে নিম্ন আওয়াজে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর বর্ণনা, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান রাযি.এর পিছনে নামায আদায় করেছি। কিন্তু আমি তাদের কাউকে উচ্চ আওয়াজে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি।[১৪৮] এই হাদীস স্পষ্ট বুঝায় যে, বিসমিল্লাহ উচ্চ আওয়াজে নয়; বরং নিম্ন আওয়াজে।

قراءة الفاتحة خلف الإمام

ইমামের পিছনে ক্বেরাত পাঠ

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে মুকতাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয। জাহরী নামায হোক কিংবা সিররী।

দলীল : হযরত ওবাদা বিন সামেত রাযি.এর হাদীস। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়ালেন। তাঁর ক্বেরাত পাঠ করতে কষ্ট হয়েছে। তিনি নামায শেষ করে বললেন,

---

[১৪৬]. সুনানে নাসায়ী : ১/১৪৪।

[১৪৭]. সুনানে দারা কুতনী : ১/৩১১।

[১৪৮]. সহীহ মুসলিম : ১/১৭২, সুনানে নাসায়ী : ১/১৪৪।

আমি তোমাদেরকে ইমামের পিছনে ক্বেরাত পাঠ করতে দেখছি। খবরদার! খোদার কসম ভবিষ্যতে এমন করবে না। তবে সূরা ফাতেহা ব্যতীত। কেননা সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না।[১৪৯]

জবাব : উল্লিখিত হাদীস সহীহ নয়। বরং মালূল। তাই এর দ্বারা সূরা ফাতেহা ফরয হওয়া প্রমাণ হয় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করা মাকরুহে তাহরিমী। নামায জাহরী হোক কিংবা সিররী।

দলীল : কুরআনের আয়াত।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

"যখন কুরআন পাঠ করা হবে, মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।" হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. ও হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا "যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবে তোমরা নীরব থাকো।"[১৫০] হযরত জাবের রাযি.এর হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার ইমাম থাকবে, ইমামের কেরাত তার কেরাত বলে গণ্য হবে।"[১৫১]

এই সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে ফাতেহা ইত্যাদি পড়া জায়েয নেই।

---

[১৪৯]. জামে তিরমিযী : ১/৬৯-৭০।

[১৫০]. সহীহ মুসলিম : ১/১৭৪।

[১৫১]. ইবনে মাজাহ : ৬১।

ইমাম মালেক রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে জাহরী নামাযে ইমামের পিছনে ফাতেহা পাঠ মাকরূহ। তবে সিররী নামাযে মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মতও এমনি।

امِيْنُ بِالْجَهْرِ وَالسِّرِّ

উচ্চ আওয়াজ ও নিম্ন আওয়াজে আমীন বলা

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে, আমীন উচ্চ আওয়াজে বলা উত্তম।

দলীল: হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযি.এর হাদীস। যা হযরত সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণিত। যার কথা এমন,

سمعت النبی صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} وَقال امين مدبها صوته

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি- তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পাঠ করলেন এবং আমীন বললেন এবং তাতে নিজের আওয়াজ টানলেন।[১৫২] ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ. এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন এবং বলেন, আওয়াজ লম্বা করার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ আওয়াজে আমীন বলেছেন, তাই এটা উত্তম।

জবাব : আওয়াজ লম্বা করার অর্থ এটা নয় যে, উচ্চ আওয়াজে আমীন বলেছেন। বরং উদ্দেশ্য হলো, আমীনের ইয়াকে টেনে দীর্ঘ করে পড়েছেন। আর আমরা যদি মেনেও নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ আওয়াজে আমীন বলেছেন, তবুও এই হাদীস আপনাদের দলীল হতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৫২]. জামে তিরমিযী : ১/৫৭।

ওয়া সাল্লাম হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযি.কে শিখানোর জন্য নামাযে জোরে আমীন বলেছিলেন। যেমনটি অন্য হাদীস থেকে জানা যায়।[১৫৩]

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে আমীন নিম্ন আওয়াজে বলা উত্তম।

দলীল : উপরের হাদীসই দলীল। যা হযরত শো'বা রহ.এর সনদে এসেছে। যাতে مدبها صوته এর স্থানে حفض بها صوته আছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন আওয়াজে আমীন বলেছেন। হানাফী ও মালেকীগণ এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করে থাকেন এবং বলেন, নামাযে আমীন নিম্নস্বরে বলা উত্তম।

رَفْعُ الْيَدَيْنِ

হাত তোলা

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে নামাযে রুকুর আগে ও পরে হাত তোলা উত্তম।

দলীল : তাদের সবচেয়ে বড় দলীল, হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস। যাতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (তেমনি) যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। এছাড়া বহু হাদীস রয়েছে যার দ্বারা হাত তোলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জবাব : বাস্তব কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রফয়ে ইয়াদাঈন করা ও না করা দুটিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই প্রমাণ হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। বরং মাসআলা হলো, প্রাধান্য দানের। তারা রফয়ে ইয়াদাঈনকে তারজীহ্ দেয়। আমরা

---

১৫৩. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা, আবু বিশির দুলাবী আসারুস সুনানের উদ্ধৃতিতে।

রফয়ে ইয়াদাঈন না করার হাদীস তারজীহ্ দেই। আমাদের উক্তি প্রাধান্য দানের কারণ অতিসত্বর আসছে।

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে রফয়ে ইয়াদাঈন না করা উত্তম।

দলীল : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাযি.এর হাদীস। যাতে আছে, একবার তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নামায পড়ে দেখাবো কি? এরপর তিনি নামায পড়ে দেখালেন এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর হাত তুললেন না। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা যায়, নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কোথাও রফয়ে ইয়াদাঈন নেই।[১৫৪] এছাড়া আরো বহু হাদীস আছে যার দ্বারা রফয়ে ইয়াদাঈন না করা প্রমাণিত হয়।

তারজীহের কারণসমূহ : রফয়ে ইয়াদাঈন না করার হাদীসগুলি কুরআনের সাথে বেশি মিল। কেননা কুরআনে আছে وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ যার চাহিদা হলো, নামাযে নড়াচড়া কম হবে।

দ্বিতীয়ত: হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.এর হাদীস সকল প্রকার ইযতিরাবমুক্ত। তার আমলও এর ওপর।

তৃতীয়ত: ইলমের দুটি বড় বড় কেন্দ্র মদীনা ও কূফার অধিবাসীদের আমল হলো, রফয়ে ইয়াদাঈন না করা ইত্যাদি।

تَعْدِيْلُ الْأَرْكَانِ

তা'দীলে আরকান

তিন ইমাম বলেন, তা'দীলে আরকান ফরয। এটা পরিহার করলে নামায হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর মতও এটা।

---

১৫৪. জামে তিরমিযী : ১/৫৯, সুনানে আবু দাউদ : ১/১০৯, সুনানে নাসায়ী : ১/১৬১।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا يعنى صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"ঐ নামায যথেষ্ট না যাতে মানুষ রুকু ও সিজদাতে তার কোমর সোজা করবে না।[১৫৫] হযরত খল্লাদ বিন রাফের ঘটনা থেকেও তারা দলীল পেশ করে থাকেন। তিনি যখন তা'দীল বিহীন নামায পড়লেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "তুমি যাও, নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়নি।"[১৫৬] এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, তা'দীল ফরয এবং জরুরী।

জবাব : খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ফরয প্রমাণিত হয় না। বেশি থেকে বেশি ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। তাই উল্লিখিত হাদীসগুলি দিয়ে তাদীল ফরয হওয়া প্রমাণ করা সঠিক নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **মুহাম্মদ** রহ.এর মতে, তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। ফরয নয়। তাই কেউ এটাকে ছেড়ে দিলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামায পুনরায় পড়া জরুরী।

দলীল : তাদের দলীলও খল্লাদ বিন রাফে'র হাদীস। কেননা পরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা'দীলে আরকানের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর বলেন, তুমি যদি এটা পূর্ণ করো তাহলে তোমার নামাযও পূর্ণ হবে। আর যদি এতে কম করো, তাহলে নামায অসম্পূর্ণ হবে।[১৫৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে তা'দীল ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। বরং শুধু অসম্পূর্ণ বললেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা'দীলে আরকান ফরয নয়।

---

১৫৫. জামে তিরমিযী : ১/৬১।
১৫৬. সহীহ বুখারী : ১/১০৯।
১৫৭. জামে তিরমিযী : ১/৬৬।

কেননা, তা'দীলে আরকান ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ছুটে যাওয়ার ওপর নামায বাতেল হওয়ার ফয়সালা করতেন। শুধু অসম্পূর্ণ বলতেন না।

وَضْعُ الْيَدَيْنِ

হাত রাখা

এখানে দুটি মাসআলা। প্রথম মাসআলা হলো, নামাযে হাত বাঁধা হবে কি না?

ইমাম মালেক রহ. বলেন, নফলের মধ্যে হাত বাঁধা হবে এবং ফরযের মধ্যে বাঁধা হবে না।[১৫৮]

দলীল : এই মাসআলার ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোনো হাদীস পেশ করা হয় না। তবে একটি আকলী দলীল পেশ করা হয়। "নামাযে হাত বাঁধা মানে হেলান দেওয়া। আর হেলান দেওয়া নফলের ক্ষেত্রে তো সাধারণত জায়েয আছে। কিন্তু ফরযের ক্ষেত্রে বিনা প্রয়োজনে মাকরূহ।[১৫৯] সুতরাং এই দলীলের ভিত্তিতে তারা নফলের ক্ষেত্রে বুকের ওপর হাত বাঁধা কারাহাত বিহীন জায়েয বলেছেন এবং ফরযের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছাড়া মাকরূহ বলেছেন।

জবাব : জামহুরের পক্ষ থেকে এই আকলী দলীলের এভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হাত বাঁধার প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেক হাদীস আছে। তাই হাদীসের বিপরীতে আকলী দলীলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তিন ইমাম বলেন, ফরয নফল সকল নামাযে হাত বাঁধা সুন্নাত।

দলীল : এক্ষেত্রে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। সুতরাং হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযি.এর এক বর্ণনায় আছে,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

---

[১৫৮]. বুলগাতুস সালেক : ১/১১৮।

[১৫৯]. প্রাগুক্ত।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখলেন।[১৬০] এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাত বাঁধা সুন্নাত।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, হাত কোথায় বাঁধবে

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, বুকের নীচে এবং নাভির ওপরে হাত বাঁধা মুস্তাহাব।

দলীল : তার কাছে এ ব্যাপারে কোনো সহীহ স্পষ্ট হাদীস নেই।[১৬১] তাই তিনি على صوره বিষয়ক হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন। হযরত ওয়ায়েল বিন হুজুর রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال صليت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে নামায আদায় করলাম। তিনি বুকের ওপর বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন।"[১৬২]

জবাব : উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তি হলো মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের ওপর। তিনি দুর্বল।[১৬৩] তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আযম রহ. বলেন, নাভির নীচে হাত বাঁধা মুস্তাহাব।

দলীল : হযরত আলী রাযি.এর উক্তি।

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"নামাযে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত।"[১৬৪] উসূলে হাদীসের সর্বসম্মত মাসআলা হলো, কোনো সাহাবী সুন্নাত বলে কোনো কথা বর্ণনা করলে তা

---

[১৬০]. সহীহ মুসলিম : ১/১৭৩।

[১৬১]. মাআরেফুস সুনান : ২/৪৪৫।

[১৬২]. সহীহ ইবনে খুযায়মা : ১/২৪৩, তালখীসুল হাবীর : ১/২২৪।

[১৬৩]. আসারুস সুনান : ১/৬৫।

মারফুর স্তরে চলে যায়। সুতরাং এই মূলনীতি অনুযায়ী হযরত আলী রাযি.এর উল্লিখিত উক্তিও হাদীসে মারফুর হুকুমে হবে।

ইমাম আহমদ রহ. : এক্ষেত্রে তার থেকে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ আছে। একটি ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতো একটি ইমাম আযমের মতো। তৃতীয়টি হলো, দুটির মাঝে স্বাধীনতা আছে।

السَّجْدَةُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

কপাল ও নাকের ওপর সাজদা করা

চার ইমাম একথার ওপর একমত যে, সাজদাতে কপাল ও নাক উভয়টি ঠেকানো সুন্নাত। তবে এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে যে, কোনো একটির ওপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয আছে কি না?

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, সাজদাতে কপাল ও নাক উভয়টি ঠেকানো ওয়াজিব। কোনো একটির ওপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয নেই।

দলীল : হাদীস, كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজদা করতেন, নাক ও কপাল,উভয়টি মাটিতে ঠেকাতেন।"[১৬৫] এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাজদাতে নাক ও কপাল দুটিই ঠেকাতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, কপালের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা তো জায়েয আছে। তবে নাকের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয নেই। অধিকাংশ মালেকী ও সাহেবাইনের মত এমনি।

দলীল : হযরত আব্বাস রাযি.এর হাদীস।[১৬৬] যাতে সাজদার সময় সাত অঙ্গ জমিনে রাখার কথা উল্লেখ আছে। দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা

---

[১৬৪]. মুসনাদে আহমদ : ১/১১, বায়হাকী : ২/৩১, মাআরেফুস সুনান : ২/৪৪১, ৪৪৪

[১৬৫]. জামে তিরমিযী : ১/৬১।

[১৬৬]. জামে তিরমিযী : ১/৫৯।

এবং চেহারা। আর শুধু কপাল রাখলে চেহারা রাখা বাস্তবায়ন হবে, তাই কপালের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয হবে। কিন্তু শুধু নাক রাখলে চেহারা রাখা হয়েছে তা বলা হবে না। তাই নাকের ওপর সীমাবদ্ধ রাখা জায়েয হবে না।

ইমাম আযম রহ. বলেন, দুটির থেকে কোনো একটি রাখলেও সাজদা আদায় হয়ে যাবে।

দলীল : কুরআনে শব্দ সুজুদ এসেছে। আর সুজুদ বলে, সম্মানের সাথে চেহারা মাটিতে রাখাকে। সুতরাং সম্মানের সাথে চেহারার যেই অংশই জমিনের ওপর রেখে দেওয়া হবে সাজদা আদায় হয়ে যাবে। তাই কপালের ওপর সীমাবদ্ধ রাখাও জায়েয এবং নাকের ওপর সীমাবদ্ধ রাখাও জায়েয। তবে মাকরূহ হবে।

ফায়েদা : এটা ইমাম আযমের পূর্বের উক্তি। নতুবা তিনি সাহেবাইনের কথার দিকে ফিরে আসা প্রমাণিত আছে।

سَجْدَةُ السَّهْوِ

সাজদায়ে সাহু

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করা উত্তম। **ইমাম আযম** রহ.এর মতে সাজদায়ে সাহু সালামের পরে করা উত্তম।

ইমাম মালেক রহ.এর মতে এই মাসআলায় একটু বিস্তারিত আলোচনা আছে। সাজদায়ে সাহু যদি কোনো কমতির কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে সালমের পূর্বে করা উত্তম। আর যদি কোনো বাড়তির কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে সালামের পরে করা উত্তম। এটাকে সহজে মনে রাখার জন্য এই কথাটি মুখস্থ করে রাখা যায়,

اَلْقَافُ بِالْقَافِ وَالدَّالُ بِـالدَّالِ। অর্থাৎ কমতি বিশিষ্ট সাজদা সালামের পূর্বে বাড়তি বিশিষ্ট সাজদা সালামের পরে। অর্থাৎ اَلْقَبْـلُ بِالنُّقْـصَانِ وَالْبَعْـدُ بِالزِّيَادَةِ

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে। সুতরাং যেই কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পূর্বে সাজদা করেছেন, সেখানে এটাই উত্তম। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ বিন বুহাইনার হাদীসে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দেওয়ার কারণে করেছেন। আর যে সকল কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পরে সাজদা করেছেন সেখানে সালামের পরে উত্তম। যেমন, হযরত যুল ইয়াদাঈনের হাদীসে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কারণে করেছেন। তবে যে সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু উদ্ধৃত নেই সেখানে ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মাসলাক মতে সালামের পূর্বে সাজদা করা হবে। (মোটকথা তিন ইমাম সালামের পূর্বে সাজদার প্রবক্তা)।

দলীল : হযরত আবদুল্লাহ বিন বুহাইনার হাদীস,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَـمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার যোহরের নামাযে (দুই রাকাত পড়ে) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি যখন নামায শেষ করলেন সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুটি সাজদা করলেন। প্রত্যেক সাজদায় তাকবীর বললেন।[১৬৭] তিন ইমাম এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পূর্বে সাজদায়ে সাহু করেছেন।

---

[১৬৭]. জামে তিরমিযী : ১/৮৯।

জবাব : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা জায়েয উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জায়েযের বিবরণের জন্য সালামের পূর্বে সাজদা করেছেন।

হানাফীদের দলীল : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد فى الصلاة أم نسيت فسجد سجدتين بعد ما يسلم

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার যোহরের নামায পড়ালেন। তখন তাকে বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে নাকি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পর দুটি সাজদা করলেন। এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় সাজদায় সাহু সালামের পর। তেমনি হযরত সাওবান রাযি.এর মারফু বর্ণনা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ "প্রত্যেক ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সাজদা।"[১৬৮] এই হাদীস দ্বারা ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমদ রহ.এর সংশ্লিষ্ট মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন হুকুম সব শেষ হয়ে যায়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে ইরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক ভুলের জন্য দুটি সাজদা সালাম ফেরানোর পর। এবার তা কমতির জন্য হোক কিংবা বাড়তির জন্য হোক। কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক। সবগুলির বিধান এক রকম হবে। অর্থাৎ সালাম ফেরানোর পরেই সাজদা করা হবে।

---

[১৬৮]. সুনানে আবু দাউদ : ১/১৪৮, ১৪৯।

তাছাড়া হযরত যুল ইয়াদাঈন রাযি.এর ঘটনাও আমাদের দলীল।[১৬৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন তখন হযরত যুল ইয়াদাঈন রাযি. তাঁকে প্রশ্ন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো দুই রাকাত নামায পড়িয়ে সালামের পর দুটি সাজদা করলেন। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, সাজদায়ে সাহু সালাম ফেরানোর পর, পূর্বে নয়।

قَطْعُ الصَّلَاةِ

নামায ভঙ্গ হওয়া

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মুসল্লীর সামনে সুতরা না থাকলে কালো কুকুর সামনে দিয়ে অতিবাহিত হলে নামায ভেঙ্গে যায়। আরেক বর্ণনা মতে এই বিধানে গাধা ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত আছে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,[১৭০]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসল্লীর সামনে যদি সুতরা না থাকে তাহলে কালো কুকুর, মহিলা ও গাধা অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়।

জবাব : এখানে قَطَعَ صَلَاتَه থেকে ভঙ্গ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং খুশু নষ্ট উদ্দেশ্য।[১৭১] এই জিনিস মুসল্লীর খুশু নষ্ট করে দেয়। ইমাম

---

১৬৯. জামে তিরমিযী : ১/৭৮।

১৭০. জামে তিরমিযী : ১/৭৯, মাআরেফুস সুনান : ৩/৩৫৯।

১৭১. ফাতহুল বারী : ১/৪৮৬, ওমদাতুল কারী : ২/৪৯৬, ৪৭৩।

তহাবী রহ. এই জবাব দিয়েছেন যে, নামায ভঙ্গ হওয়ার হাদীস মানসুখ, নাসেখ হলো হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর হাদীস।[১৭২]

তিন ইমাম বলেন, মুসল্লীর সামনে দিয়ে কোনো কিছু গেলে নামায নষ্ট হয় না।

দলীল : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর হাদীস।[১৭৩]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْئٌ

এছাড়া হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস।

قالت كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। আমি তার সামনে জানাযার মতো শুয়ে থাকতাম।"[১৭৪] লক্ষ করুন, সামনে থাকলে যখন নামায নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই, তাহলে অতিবাহিত হলে কখনো নষ্ট হবে না।

صَلَاةُ الْقَائِمِ خَلْفَ الْقَاعِدِ

বসা ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির নামায

ইমাম মালেক রহ. বলেন, বসা ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই। দাঁড়িয়েও নয়, বসেও নয়। তবে মুক্তাদীও যদি মাযুর হয় এবং দাঁড়াতে না পারে তাহলে এমন ইমামের পিছনে নামায পড়তে পারবে।

---

[১৭২]. জামে তিরমিযী : ১/৭৯।

[১৭৩]. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১/২৮, মেশকাত : ১/৭৪।

[১৭৪]. মেশকাত : ১/৭৪।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। لا يـؤمن رجـل بعـدى جالـسًا "আমার পরে কখনো কেউ বসে নামায পড়াবে না।"[১৭৫]

জবাব : এই হাদীসের ভিত্তি হলো জাবেবে জু'ফীর ওপর। যে সর্ব সম্মতভাবে দুর্বল। তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, ইমাম মাযুর হলে তার জন্য বসে নামায পড়ানো জায়েয আছে। এমন ইমামের মুক্তাদীও বসে ইকতিদা করবে, দাঁড়িয়ে নয়।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। إِذَا صَـلَّ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا أجمعون

"ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে, তোমরা সকলে বসে নামায আদায় করো।"[১৭৬]

জবাব : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের সময়কালীন ঘটনার দ্বারা এই হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। যাতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে নামায পড়িয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে ইকতিদা করেছেন। দ্বিতীয় জবাব হলো এই হাদীস নফল সংক্রান্ত। কেননা, নফলের ক্ষেত্রে মুক্তাদীর জন্য বসা ইমামের পিছনে বসে ইকতিদা করা জায়েয আছে। তৃতীয় জবাব হলো, উল্লিখিত বিধান তখনের সাথে বিশেষ ছিলো, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ইমাম ছিলেন।

---

১৭৫. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২/৪৬৩।
১৭৬. জামে তিরমিযী।

ইমাম আযম ও শাফেয়ী রহ. বলেন, মাযুর ইমামের জন্য বসে নামায পড়ানো জায়েয আছে। কিন্তু মুক্তাদী (গায়রে মাযুর) দাঁড়িয়ে ইকতিদা করবে।

দলীল : কুরআনের আয়াত, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ এই আয়াতে সাধারণভাবে সকলের জন্য কিয়ামকে ফরয করা হয়েছে। ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী। তবে لا يكلف الله نفسا الا وسعها এই আয়াতের কারণে মাযুরকে উক্ত বিধান থেকে বিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া সে সকল হাদীসও আমাদের দলীল, যাতে দাঁড়ানোর ওপর সামর্থবান ব্যক্তিকে বসে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে অসুস্থ অবস্থায় বসে নামায পড়িয়েছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে ইকতিদা করেছেন।[১৭৭] এই সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় বসা ইমামের পিছনে গায়রে মাযূর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ইকতিদা করবে, বসে নয়।

الكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ

নামাযে কথা বলা

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ভুলে কিংবা বিধান না জেনে কথা বললে নামায ভঙ্গ হবে না। তবে শর্ত হলো লম্বা কথা না হতে হবে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, নামায সংশোধনের জন্য কথা বললে নামায ভঙ্গ হবে না। তার একটি বর্ণনা হানাফীদের মতো।

ইমাম আহমদ রহ. থেকে এই মাসআলায় চারটি বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। তিনটি বর্ণনা তিন মাযহাব অনুযায়ী। আর চতুর্থ বর্ণনা হলো মুসল্লী যদি একথা মনে করে কথা বলে যে, আমার নামায পূর্ণ হয়নি

---

১৭৭. সহীহ বুখারী : ১/৯৫, ৯৬, সহীহ মুসলিম : ১/১৭৭, ১৭৮।

তাহলে কথা নামায ভঙ্গকারী হবে। আর একথা জেনে কথা বলে যে, আমার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে কথা নামায ভঙ্গকারী হবে না। তখন নামায পূর্ণ না হলেও।

দলীল : তিন ইমাম হযরত যুল ইয়াদাঈনের ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করেন।[১৭৮] একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকাত পড়ে ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছেন। তখন হযরত যুল ইয়াদাঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কমিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি আপনি ভুলে গিয়েছেন? এর ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য মুসল্লীদের থেকে সত্যতা চেয়েছেন। অন্যরাও বলেছেন যে, এখন দুই রাকাত হয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো দুই রাকাত পড়িয়ে চার রাকাত পূর্ণ করলেন। লক্ষ করুন, এই ঘটনায় হযরত যুল ইয়াদাঈনের স্মরণ করিয়ে দেওয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর সত্যতা যাচাই করা এবং অন্যদের হ্যাঁ বলা সব কিছু নামাযের মাঝে ছিলো। কিন্তু নামায ভঙ্গ হলো না। বুঝা গেলো, নামাযে কথা বলার সুযোগ আছে।

জবাব : হানাফীদের পক্ষ থেকে তিন ইমামকে এর এই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এই ঘটনা রহিত হয়ে গেছে। এর জন্য নাসেখ হলো, সে সকল হাদীস যাতে নামাযে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এতে অনেক বেশি ইযতিরাব ও তাআরুয আছে। তাই এই ঘটনা কখনো দলীল হতে পারে না।

ইমাম আযম রহ. বলেন, নামাযে কথা বলার বৈধতা রহিত হয়ে গেছে, তাই সর্বাবস্থায় নামায ভঙ্গকারী। যেই উদ্দেশ্যেই হোক এবং যতই সংক্ষিপ্ত হোক।

দলীল : হযরত যায়েদ বিন আরকম রাযি.এর বর্ণনা।

---

[১৭৮]. জামে তিরমিযী।

قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ

"আমরা নামাযে কথা বলতাম। মানুষ তার পাশে নামাযরত সঙ্গীর সাথে কথা বলতো। এরপর যখন وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ আয়াত অবতীর্ণ হলো, আমাদের নীরব থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো এবং কথা বলতে নিষেধ করা হলো।" [১৭৯] এই হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নামাযে কথা বলার বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। যার পর আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না।

বিতিরের নামাযে কুনুত পাঠ

ইমাম মালেক রহ.এর মতে বিতিরের নামাযের কুনুত শুধু রমযানে ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে বিতিরের কুনুত শুধু রমযানের শেষ অর্ধেকে প্রচলিত আছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এমনি একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হযরত আলী রাযি.এর উক্তি।

أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"দোআয়ে কুনুত শুধু রমযানের শেষ অর্ধেকে পড়তেন।"[১৮০]

হযরত হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. লোকদেরকে হযরত উবাই বিন কা'আব রাযি.এর কাছে একত্রিত করলেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিশ রাত্রি নামায পড়াতেন। তবে কুনুত শুধু রমযানের শেষ অর্ধেকে পড়তেন।[১৮১] এই হাদীসগুলি দ্বারা

---

[১৭৯]. সহীহ বুখারী : ২/২৫০, সহীহ মুসলিম : ১/২০৪, সুনানে আবু দাউদ : ১/১৩৭।

[১৮০]. জামে তিরমিযী : ১/৮৭।

[১৮১]. সুনানে আবু দাউদ, মেশকাত ১/১১৪।

জানা যায় যে, দোআ কুনুত শুধু রমযানে পড়া হবে। অন্য মাসে পড়া হবে না।

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো, ওটা হযরত আলী রাযি.এর নিজস্ব ইজতিহাদ ছিলো। অথবা কুনুত থেকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত করা উদ্দেশ্য। কেননা হযরত আলী রাযি. রমযানের শেষ অর্ধেকে দীর্ঘ সময় কিয়াম করতেন। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এখানে কুনুত থেকে বিতিরের কুনুত উদ্দেশ্য নয়। বরং কুনুতে নাযেলা উদ্দেশ্য। যেমনটি হযরত ওমর রাযি.এর অন্য উক্তি থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন,

إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا انْتَصَفَ رَمَضَانُ أَنْ يُلْعِنَ الْكَفَرَةِ فِيْ الْوِتْرِ

"রমযানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে সুন্নাত হলো, বিতিরের মধ্যে কাফেরদেরকে অভিশাপ দেওয়া হবে।"[১৮২] লা'নত ও বদ দোআ কুনুতে নাযেলাতেই হয়। বুঝা গেলো রমযানের শেষ অর্ধেকে কুনুতে নাযেলা হতো। দ্বিতীয়ত এই হাদীস মুনকাতি। কেননা, হাসান বসরী, হযরত ওমর রাযি.কে পাননি।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ.এর মতে কুনুতে বিতির পুরা বছর পড়তে হবে।

দলীল : হযরত হাসান বিন আলী রাযি.এর হাদীস,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছেন যা আমি বিতিরে পড়ি।"[১৮৩] এই হাদীসে রযমান ও গায়রে রমযানের কোনো পার্থক্য নেই। এর দ্বারা বুঝা যায়, দোআ কুনুত বিতিরের নামাযে

---

[১৮২]. মেশকাত : ৩/১৮৪।

[১৮৩]. জামে তিরমিযী।

পুরা বছর পড়া হবে। তাছাড়া অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও পুরা বছর বিতিরে কুনুত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮৪]

اَلْقُنُوْتُ فِيْ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযে কুনুত পড়া

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক রহ.এর মতে ফজরের নামাযে সর্বদা কুনুতের বিধান আছে।

দলীল : হযরত বারা বিন আযেব রাযি.এর মারফু হাদীস।

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনুত পড়তেন।" [১৮৫]

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে কুনুত পড়তে থাকেন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত।[১৮৬] এই হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে সর্বদা কুনুত পড়তেন। তাই ফজরের নামাযে নিয়মিত কুনুতের বিধান আছে।

জবাব : যেসব হাদীসে ফজরে কুনুত পড়ার কথা উল্লেখ আছে তা থেকে কুনুতে নাযেলা উদ্দেশ্য। কেননা মুসলমানদের ওপর যখনি কোনো মসিবত আসতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুনুতে নাযেলা

---

১৮৪. মাযমাউজ যাওয়ায়েদ : ২/২৪৪।

১৮৫. মা'আরেফুস সুনান : ৪/১৮।

১৮৬. মাআরেফুস সুনান : ৪/১৮।

পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এই আমল মৃত্যু পর্যন্ত ছিলো। যেমনটি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে সর্বদা কুনুত পড়তেন।

দ্বিতীয় জবাব হলো, কুনুত থেকে দীর্ঘ সময় কেয়াম করা উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা ফজরের নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করতেন। তৃতীয় জবাব হলো, হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস তার অন্য হাদীসের সাথে সাজ্মর্ষিক। যা বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আছে। তার থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একমাস কুনুত পড়েছেন। তাই তার হাদীস দলীল হতে পারে না।

ইমাম আযম ও আহমদ রহ. বলেন, ফজরের নামাযে কুনুত পাঠ সর্বদার বিধান নয়।

দলীল : হযরত আবু মালেক আশজায়ীর রহ. বর্ণনা।

قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَهٰهُنَا خَمْسِيْنَ سَنَةً اكانوا يقنتون؟ قال اى بنى محدث

"আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আব্বাজান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পিছনে নামায আদায় করেছেন। হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাযি.এর পিছনেও নামায পড়েছেন। এখানে কুফাতে প্রায় পঞ্চাশ বছর নামায আদায় করেছেন। তারা কি কুনুত পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন। হে ছেলে, এটা বিদআত।"[১৮৭] এই হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ফজরে কুনুত সব সময় হতো না। বিশেষ বিশেষ দিনে হতো। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস।

[১৮৭]. মাআরেফুস সুনান : ৪/২৩।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقنت فى صلاة الصبح الا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে শুধু তখন কুনূত পড়তেন, যখন কারো জন্য দোআ কিংবা বদদোআ করতেন।"[১৮৮] এই হাদীস পরিষ্কার বুঝাচ্ছে যে, ফজরের কুনূত নিয়মিত পড়ার বিধান নয়।

صَلَاةُ الْوِتْرِ

বিতিরের নামায

তিন ইমামের মতে বিতিরের নামায সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। সাহেবাঈনের মতও এটাই।

দলীল : হযরত আলী রাযি.এর উক্তি।

الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"বিতির তোমাদের ফরয নামাযের মতো আবশ্যক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সুন্নাত।"[১৮৯]

দ্বিতীয় দলীল হলো, বিতিরের নামায ওয়াজিব হলে, নামাযের ওয়াক্ত সংখ্যা ছয় হতো। অথচ নামাযের ওয়াক্ত সংখ্যা পাঁচ বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, বিতির ওয়াজিব নয়, সুন্নাত।

জবাব : হযরত আলী রাযি. বিতির ফরয হওয়াকে নাকচ করেছেন। ওয়াজিব হওয়া নাকচ করেননি। যেমন– তার উক্তি "বিতির তোমাদের

---

[১৮৮]. ইবনে হিব্বান।

[১৮৯]. জামে তিরমিযী।

ফরয নামাযের মতো আবশ্যক নয়" দ্বারা বুঝা যায়। আর ফরয হওয়া নাকচ করার উদ্দেশ্য হলো, বিতিরের নামাযের স্তর ফরয নামাযের চেয়ে কম। আর ফরযের কম স্তর ওয়াজিব, সুন্নাত নয়। তাই হযরত আলী রাযি.এর উক্তি দ্বারা বিতিরের নামায সুন্নাত প্রমাণিত করা সঠিক নয়। আর দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো, বিতিরের নামায এশার নামাযের অনুগামী এবং এশার নামাযের অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা আলাদা গণনা করা হয়নি। ফলে নামাযের ওয়াক্ত সংখ্যা পাঁচই থাকলো।

ইমাম আযম রহ. বলেন, বিতিরের নামায ওয়াজিব।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্য তিনবার বলেছেন, الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا "বিতির হক। যে ব্যক্তি বিতির পড়বে না সে আমার থেকে নয়।"[১৯০] হক শব্দ এখানে ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বুঝা গেলো, বিতির ওয়াজিব। দ্বিতীয় দলীল, হাদীস,

إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর একটি নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম।"[১৯১]এখানে বৃদ্ধি করা আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দিকে করা হয়নি। এর দ্বারাও বুঝা যায় বিতিরের নামায ওয়াজিব। কেননা বিতিরের নামায সুন্নাত হলে বৃদ্ধি করার সম্বোধন রাসূলের দিকে করা হতো। আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হতো না।

---

[১৯০]. সুনানে আবু দাউদ : ২০১।

[১৯১]. জামে তিরমিযী : ১/৮৫।

رَكْعَاتُ الْوِتْرِ

বিতিরের রাকাত সংখ্যা

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে বিতিরের নামায এক রাকাত থেকে শুরু করে এগার রাকাত পর্যন্ত। অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার রাকাত।

দলীল, জবাবসহ : এক রাকাতের প্রমাণে হাদীসের টুকরা পেশ করা হয়।

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "বিতির এক রাকাত শেষ রাতে।"[১৯২] কিন্তু এর জবাব হলো এই হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকাত বিতির আদায় করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, যখন বিতিরের নামাযের ইচ্ছা করতেন তখন দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির বানিয়ে ফেলতেন। আর তিন রাকাত বিশিষ্ট হাদীসের الْوِتْرُ بِثَلَثٍ[১৯৩] এর জবাবের প্রয়োজন নেই। কেননা আমাদের মাসলাকও এটাই। তবে পাঁচ রাকাত বিশিষ্ট হাদীস أَوْتِرْ بِخَمْسٍ[১৯৪]এর জবাব হলো, পাঁচ রাকাত বিতির ছিলো না। বরং তিন রাকাত ছিলো বিতির, দুই রাকাত নফল। রাবী দুটি মিলিয়ে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সাত রাকাত বিশিষ্ট হাদীস أَوْتِرْ بِسَبْعٍ[১৯৫] এর জবাব হলো, এখানে তিন রাকাত বিতির, আর চার রাকাত তাহাজ্জুদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বয়সে ৪ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। নয় রাকাত বিশিষ্ট

---

[১৯২]. সহীহ মুসলিম : ১/২৫৭।

[১৯৩]. সহীহ মুসলিম : ১/২৬১।

[১৯৪]. সুনানে নাসায়ী : ১/২৫০।

[১৯৫]. সুনানে নাসায়ী : ১/২৫০।

হাদীস أَوْتِرْ بِتِسْعٍ[১৯৬]এর জবাব হলো এখানে ছয় রাকাত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাত বিতির। রাবী দুটি মিলিয়ে বলে দিয়েছেন। এগার রাকাত বিশিষ্ট হাদীস أَوْتِرْ بِإِحْدى عَشَرَةَ رَكْعَةً [১৯৭]এর জবাব হলো, এতে ছয় রাকাত তাহাজ্জুদ ছিলো এবং তিন রাকাত বিতিরের ছিলো এবং দুই রাকাত নফল ছিলো। যে দুই রাকাত তিনি বসে আদায় করতেন। রাবী সব মিলিয়ে বলে দিয়েছে।

হানাফীয়াদের মতে, বিতির তিন রাকাত। এর বেশি জায়েয নেই।

দলীল : হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.এর বর্ণনা।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস তিনটি সূরা এক রাকাতে একটি করে পড়তেন।”[১৯৮] এই হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি সূরা তিন রাকাতে পড়তেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, বিতির তিন রাকাত।

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাকাত বিতির পড়তেন।” এই হাদীসও হানাফীদের মাযহাবের পক্ষে স্পষ্ট।

ইমাম মালেক রহ.এর মতে বিতির তিন রাকাত। তবে আদায় পদ্ধতি ভিন্ন।

---

[১৯৬]. সুনানে নাসায়ী : ১/২৫১।
[১৯৭]. তহাবী : ১/১৩৯।
[১৯৮]. জামে তিরমিযী : ১/৮৬।

الوِتْرُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ

এক সালামে বিতির

তিন ইমাম এর মতে বিতিরের নামায দুই সালামে।

দলীল : এই মাসআলায় তিন ইমামের কাছে কোনো সহীহ বা স্পষ্ট হাদীস পাওয়া যায় না। এটা সাহাবায়ে কেরামের আমলও ছিলো না। তবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. সম্পর্কে পাওয়া যায় যে, তিনি দুই সালামের প্রবক্তা। এটাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দিকে সম্বোধন করে।[১৯৯] তারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে,

كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ

"তিনি বিতিরের এক রাকাত ও দুই রাকাতের মাঝে সালাম ফিরাতেন।"[২০০] আর দ্বিতীয় সালাম শেষ রাকাতের পর ফিরাতেন। এভাবে দুই সালাম হয়ে গেলো।

জবাব : এটা তাদের নিজস্ব ইজতিহাদ ছিলো। তাছাড়া তিনি এই ইজতিহাদে একা। নতুবা যেই হাদীসের[২০১] এই ব্যাখ্যা বুঝেছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.ও তার বর্ণনাকারী। কিন্তু তার আমল এক সালামে তিন রাকাত পড়া। দ্বিতীয়ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুই সালামে বিতির যদি প্রমাণিত থাকতো তাহলে এটা একটা অসাধারণ আমল হতো। আর সাহাবায়ে কেরাম এটা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম কেউ এটাকে স্পষ্ট বলেননি। বরং এর বিপরীত প্রমাণিত আছে। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ

---

১৯৯. আসারুস সুনান : ১৫৮, মাআরেফুস সুনান : ৪।

২০০. সহীহ বুখারী : ১/১৩৫।

২০১. সহীহ মুসলিম : ১/২৫৭, সুনানে নাসায়ী : ১/২৪৭।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের দুই রাকাত পর সালাম ফেরাতেন না।"[২০২]

হানাফীদের মতে বিতির এক সালামে। মাঝে কোনো সালাম নেই।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বিতির সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। কিন্তু তিনি কোথাও বিতির দুই সালামে বলেন নি। বরং কোনো কোনো হাদীসে এটাকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এক হাদীসে আছে, ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصُلُ بَيْنَهُنَّ "অতঃপর তিন রাকাত বিতির পড়লেন। মাঝে কোনো পার্থক্য করলেন না।"[২০৩]

অন্য এক হাদীসে আছে,[২০৪]

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ

এছাড়াও বিতির সংক্রান্ত তার থেকে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যাতে لَا يَفْصُلُ بَيْنَهُنَّ ও لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ أٰخِرِهِنَّ ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ আছে। তাছাড়া অন্যান্য বড় বড় সাহাবা থেকেও একথা প্রমাণিত আছে যে, তারা বিতিরের নামায এক সালামে পড়তেন।[২০৫] সে সকল হাদীস ও আসারের আলোকে হানাফীদের মাযহার সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যায় যে, বিতিরের নামায এক সালামে।

---

২০২. সুনানে নাসায়ী : ১/২৪৮।

২০৩. আসারুস সুনান : ৬২।

২০৪. মাযমাউজ যাওয়াযেদ : ২/২৪২।

২০৫. তহাবী : ১/১৪৩, ১৪৫, জামে তিরমিযী : ১/৮৬।

وَقْتُ الْجُمْعَةِ

জুমার ওয়াক্ত

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে জুমার সময় যোহায়ে কোবরা বা বড় সকালের থেকে শুরু হয়ে যায়। তাই তাদের মতে, সূর্য ঢলার পূর্বে জুমার নামায পড়া জায়েয।

দলীল : হযরত সাহাল বিন সাআদ রাযি. এর হাদীস,

مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর যুগে সকালের খাবার এবং বিশ্রাম জুমার পরে করতাম।"[২০৬] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম জুমার নামায সূর্য ঢলার পূর্বে পড়তেন। সেটা এভাবে যে, তাতে বলা হয়েছে আমরা জুমা পড়ে গেযা খেতাম। আর গেযা বলে সূর্য ঢলার পূর্বের খাবারকে। তাহলে বুঝা গেলো, জুমার নামায সূর্য ঢলার বহু আগে পড়ে নিতেন।

জবাব : আভিধানিক অর্থে গেযা যদিও সূর্য ঢলার পূর্বের খাবারকে বলা হয়, তবে শব্দের ব্যাপকতা এবং পরিভাষায় সূর্য ঢলার পরের খাবারকেও গেযা বলে। তাই نَتَغَدَّى শব্দ দিয়ে দলীল দেওয়া সহীহ নয়।

তিন ইমাম এর মতে জুমার ওয়াক্ত সেটাই যেটা যোহরের ওয়াক্ত।

দলীল : হাদীস শরীফ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

---

[২০৬]. জামে তিরমিযী : ১/৯৫।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার নামায তখন পড়তেন, যখন সূর্য ঢলে পড়তো।[২০৭] উদ্দেশ্য হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার সাথে সাথে জুমার নামায পড়ে ফেলতেন। তাছাড়া হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,[২০৮]

كَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ

এই হাদীসে জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়াকে رَاحُوا শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। আর رَاحُوا শব্দ ব্যবহার হয় সূর্য ঢলার পরে যাওয়ার জন্য। বুঝা গেলো, জুমা সূর্য ঢলার পরে, আগে নয়।

الصَّلَاةُ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

খুতবা চলাকালীন সময়ে নামায

খুতবা শুরু হওয়ার পরে মসজিদে আগত মুসুল্লী খুতবা চলাকালীন সময়ে দুই রাকাত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) পড়া কেমন?

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. বলেন, খুতবা চলাকালীন সময়ে মাসজিদে আগত মুসল্লী দুই রাকাত আদায় করা মুস্তাহাব।

দলীল : হযরত সুলাইক গতফানী রাযি.এর ঘটনা। খুতবা চলাকালীন সময়ে তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি দুই রাকাত নামায পড়েছো? তিনি বললেন না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করো।[২০৯]

তাছাড়া হযরত জাবের রাযি.এর বর্ণনা,

---

[২০৭]. জামে তিরমিযী : ১/১১২।
[২০৮]. সহীহ বুখারী : ১/১২৩।
[২০৯]. জামে তিরমিযী : ১/৯৪।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবাতে বলেন, তোমাদের কেউ যখন এমন সময় মাসজিদে আসে যখন ইমাম খুতবা দিচ্ছেন। অথবা খুতবা দেওয়ার জন্য বেরিয়ে গেছেন। তখন তোমাদের উচিত দুই রাকাত নামায আদায় করে নেওয়া।"[২১০] এই হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, নতুন আগত ব্যক্তির জন্য খুতবা চলাকালীন সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া শুধু জায়েয নয়, বরং মুস্তাহাব।

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো, হযরত সুলাইক খুতবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে আসেননি, বরং খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বে মসজিদে এসে ছিলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মিম্বরের ওপর বসেছিলেন।[২১১] এখনো তিনি খুতবা শুরু করেননি।[২১২] দ্বিতীয়তঃ তাকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার নির্দেশ দেননি বরং পূর্বের সুন্নাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ এটা একটা ছোট ঘটনা। যার থেকে সাধারণ ও সামগ্রিক কায়েদা এবং বিধান উদঘাটন করা যাবে না। আর দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো। এই হাদীস যেহেতু আয়াত وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا এবং অনেক হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। যেখানে খুতবা শুরু হওয়ার পর নামায পড়া এবং কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তাই সমন্বয় ও প্রাধান্য বিধানের প্রয়োজন আছে। সুতরাং সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো, والامام يخطب এর অর্থ হলো, كاد الامام أن يخطب আর যদি প্রাধান্য দানের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে সর্বাবস্থায়

---

[২১০]. সহীহ বুখারী : ১/১৫৬, সহীহ মুসলিম : ১/২৮৭।
[২১১]. সহীহ মুসলিম : ১/২৮৭।
[২১২]. সহীহ মুসলিম : ১/২৮৭।

বৈধতাদানকারীর ওপর হারামকারী প্রাধান্য পায়। তাই নিষেধের বর্ণনা গুলি প্রাধান্য পাবে।

ইমাম আযম ও মালেক রহ. বলেন, খুতবা চলাকালীন সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েয নেই।

দলীল : প্রথম দলীল উল্লিখিত আয়াত। যার ব্যাপকতায় খুতবাও অন্তর্ভুক্ত। বরং শাফেয়ী মাযহাবীগণ এই আয়াতকে জুমার খুতবার সাথে বিশেষ মানে। তাছাড়া হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জুমার দিনে যে ব্যক্তি খুতবা চলাকালীন সময়ে "চুপ থাকো" বলবে, সে অনর্থক কাজ করলো।"[২১৩] লক্ষ করুন এই হাদীসে খুতবা চলাকালীন সময়ে ভালো কাজের আদেশ পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে, যা ফরয। তাহলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ যা কেবল মুস্তাহাব তাতো অবশ্যই নিষেধ হবে।

الْقَصْرُ عَزِيْمَةٌ أَمْ رُخْصَةٌ

কসর আযীমত নাকি রোখসত

সফর অবস্থায় কসর করা আযীমত (ওয়াজিব) নাকি রোখসত (জায়েয)?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে কখনো কসর উত্তম, কখনো পূর্ণ করা উত্তম। **ইমাম মালেক** রহ. ও আহমদ রহ.এর মতে পূর্ণ পড়া ও কসর করা দুটিই জায়েয আছে।

দলীল : তিন ইমাম আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন,

---

[২১৩]. জামে তিরমিযী : ১/৯৪।

إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

লক্ষ করুন, উক্ত আয়াতে তোমাদের গুনাহ হবে না বলে কসরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এই বাক্য বৈধ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়। বুঝা গেলো, কসর করা শুধু জায়েয ও মোবাহ। তাছাড়া হযরত আয়েশা রাযি.'র হাদীস আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُوْمُ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে নামায কসরও করতেন, পূর্ণও পড়তেন। রোযা ছাড়তেনও রাখতেনও।[২১৪] এই হাদীস থেকে বুঝা যায় কসর ওয়াজিব নয়, জায়েয। নতুবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা কসরই করতেন, পূর্ণ পড়তেন না।

জবাব : لـيس عـليكم جنـاح সম্পর্কে একথা বলা যে, এই বাক্যগুলি ওয়াজিবের জন্য আসে না, এটা সঠিক নয়। কেননা, এটা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। সুতরাং সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

লক্ষ করুন, এই আয়াতে لَا جُنَـاحَ শব্দ সর্বসম্মতক্রমে ওয়াজিবের জন্য।

হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীসের জবাব আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এভাবে দিয়েছেন, এটা (হযরত আয়েশা রাযি. এর দিকে সম্বোধন করে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওপর মিথ্যা আরোপ করার নামান্তর।[২১৫] হাদীসের এমন উদ্দেশ্যও হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট সফল যা তিন মারহালার কম তাতে নামায পূর্ণ করতেন এবং দীর্ঘ সফরে কসর করতেন।

---

[২১৪]. সুনানে দারা কুতনী : ১/১৮৯।

[২১৫]. সুনানে নাসায়ী : ১/২১২।

ইমাম আযম রহ.এর মতে সফরে কসর ওয়াজিব। পূর্ণ পড়া জায়েয নেই।

দলীল : হযরত আব্বাস রাযি.এর হাদীস,

قَالَ إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর মুখে নামায ফরয করেছেন। হাযরে চার রাকাত এবং এবং সফরে দুই রাকাত।"[২১৬]

তাছাড়া হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

"শুরুতে নামায দুই রাকাত ফরয হয়েছিলো। সুতরাং সফরে সেটাই বাকি থাকে। আর হাযরে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"[২১৭]

এই হাদীস থেকে জানা যায়, সফরের দুই রাকাত সহজতার জন্য নয়; বরং মূলে এতটুকুই ফরয হয়েছে। তাই এটা আযীমত, রোখসত নয়।

إِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ

নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়ুয়ার নামায

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়ুয়ার ইকতিদা জায়েয আছে।

দলীলঃ হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি.এর ঘটনা।

أن معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم.

---

[২১৬]. সহীহ মুসলিম : ১/২৪১।

[২১৭]. সহীহ মুসলিম : ১/২৪১।

"হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন এরপর নিজ এলাকায় গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন।[২১৮] এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত মুআয রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পিছনে একবার যখন নামায পড়ে নিয়েছেন তার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে। এবার সেই নামাযই নিজ এলাকায় গিয়ে পড়িয়েছেন, তাহলে সেটা নফল হবে। কেননা ফরয তো পূর্বেই আদায় হয়েছে। ফলে প্রমাণ হলো, নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়া জায়েয আছে।

জবাব : নিয়ত একটি বিষয়। যেটা স্পষ্ট করা ছাড়া অন্য কেউ জানা সম্ভব নয়। তাই হযরত মুআয রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পিছনে ফরযের নিয়্যত করে ছিলেন এটা কিভাবে বলা যাবে? হতে পারে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পিছনে নফলের নিয়তে শরিক হয়েছেন। আর এলাকায় গিয়ে ফরযের নিয়তে ইমামতি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এটা একটা বিশেষ ঘটনা। যা দিয়ে সাধারণ বিধান উদঘাটন করা যায় না।

তিন ইমাম : তারা বলেন, নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়ুয়ার ইকতিদা জায়েয নেই।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস।

سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে একদিনে একই নামায দুই বার পড়ো না।[২১৯]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ

---

[২১৮]. জামে তিরমিযী।

[২১৯]. মা'আরেফুস সুনান।

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইমাম যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।"[২২০] ইমাম মুক্তাদীর নামাযের যিম্মাদার তখন হতে পারবে যখন উভয়ের নামায এক হবে। তাই ইমাম নফল পড়ুয়া হলে ফরয পড়ুয়া মুক্তাদীর নামাযের যিম্মাদার হতে পারে না। যিম্মাদার যখন হতে পারে না ইমামও হতে পারে না।

তেমনি অন্য এক হাদীসে আছে, إنما جعل الامام ليوتم به "ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে ইকতিদা করার জন্য।[২২১] ইকতিদা বলে কোনো কাজে মুক্তাদার অনুসরণকে। এখানে মুক্তাদা নফল পড়ুয়া আর মুক্তাদী ফরয পড়ুয়া। তাহলে ইকতিদা কিভাবে হলো। বুঝা গেলো নফল পড়ুয়ার পিছনে ফরয পড়ুয়ার নামায শুদ্ধ হবে না।

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً

যে ব্যক্তি এক রাকাত পেয়েছে

তিন ইমাম : তাদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি জুমার নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পরে শরিক হয় তাহলে তার ওপর যোহরের নামায ওয়াজিব হয়ে যাবে। জুমা পেয়েছে বলা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মাসলাক এটাই।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেয়েছে সে পূর্ণ নামায পেয়েছে।[২২২] তাছাড়া এই হাদীসের মাফহুমে মুখালিফ (বিপরীত দিক) থেকে দলীল

---

২২০. জামে তিরমিযী : ১/৫০।
২২১. সহীহ বুখারী : ১/১৫০ সহীহ মুসলিম : ১/১৭৬ ১৭৭, জামে তিরমিযী : ১/৭২।
২২২. জামে তিরমিযী।

পেশ করে যে, যে ব্যক্তি এক রাকাতও পায়নি, সে নামাযও পায়নি। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর হাদীস,

من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا

"যে ব্যক্তি জুমার এক রাকাত পেয়েছে তার সাথে আরেক রাকাত পড়বে। আর যে ব্যক্তির দুই রাকাতই ছুটে যাবে সে যোহরের চার রাকাত আদায় করবে।"[২২৩]

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো, মাফহুমে মুখালিফ আমাদের দৃষ্টিতে দলীল নয়। তাই মাফহুমে মুখালিফ দ্বারা হুকুম প্রমাণিত হতে পারে না। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, দুই রাকাত ছুটে যাওয়া থেকে পূর্ণ নামায ছুটে যাওয়া উদ্দেশ্য। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, দ্বিতীয় রাকাতের রুকু ছুটে গেলে যোহরের নামায আদায় করবে। বরং দ্বিতীয় রাকাত সালামসহ পূর্ণ ছুটে গেলে তখন এই বিধান।

ইমাম আযম রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি জুমার নামাযের সালামের পূর্ব মুহূর্তে শরিক হয় তাহলে তাকে জুমা পেয়েছে বলা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.এর মতও এটা।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"যখন তোমরা নামাযের জন্য আসবে তোমাদের জন্য শান্তভাব আবশ্যক। যতটুকু নামায পাবে তা পড়ে নাও এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নাও।"[২২৪]

সুতরাং তাশাহুদ পেলেও নামায পেয়েছে বলা হবে। বরং সালামের পূর্বেও যদি শরিক হয় তাহলে নামায পেয়েছে বলা হবে। তাছাড়া এতে জুমা

---

২২৩. সুনানে দারাকুতনী।

২২৪. সহীহ বুখারী : ১/৮৮।

গায়রে জুমার কোনো বিশেষত্ব নেই। তাই জুমাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন,

من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة

"যে ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পেয়েছে সে নামায পেয়েছে।"[২২৫] হযরত মুআয বিন জাবাল রহ. বলেন,

إذا دخل فى صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك الجمعة

"যখন কেউ সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় জুমার নামাযে অংশগ্রহণ করবে, তাহলে সে জুমা পেয়েছে।"[২২৬] এই সকল বর্ণনাগুলির আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নামায পাওয়ার জন্য শেষ রুকু পাওয়া আবশ্যক নয়। বরং তারপরে সালামের পূর্বে শরিফ হলেও জুমা পেয়ে যাবে।

الصَّلَاةُ عِنْدَ الطُّلُوْعِ وَالْغُرُوْبِ

সূর্য ওঠা ও ডোবার সময়ে নামায

চার ইমাম : তারা এ বিষয়ে একমত যে, আসরের নামায আদায় করতে করতে সূর্য ডুবে গেলে নামায বাতিল হয় না। তবে এতে ইখতিলাফ আছে যে, ফজরের নামায পড়তে পড়তে সূর্য উঠে গেলে নামায বাতিল হবে কি না?

তিন ইমাম : তারা বলেন, ফজরের নামায পড়তে পড়তে সূর্য উঠে গেলে নামায বাতিল হবে না।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস।

---

২২৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

২২৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার আগে ফজরের নামাযের এক রাকাত পেয়েছে সে পুরা নামায পেয়েছে।"[২২৭]

বুখারী শরীফে আছে,

مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

"যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সাজদা পেয়েছে, সে যেন তার নামায পূর্ণ করে নেয়।" এই হাদীসগুলি থেকে জানা যায় আসরের মতো ফজরের নামাযও সূর্য উদিত হওয়ার দ্বারা নষ্ট হয় না।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসে فقد أدرك এর মা'মুল উহ্য আছে। আর তা হয়তো "ওয়াক্ত" শব্দ হবে নতুবা সাওয়াব শব্দ হবে। অথবা উজুব শব্দ হবে। ইবারত এমন হবে,

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقت الصلاة أو ثواب الصلاة أو وجوب الصلاة

উদ্দেশ্য হবে এমন, যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত তার ওয়াক্তে পেয়েছে কেমন যেন সে ফজরের ওয়াক্ত পেয়েছে। অথবা (নিয়তের দিক লক্ষ করে) সে কেমন যেন সে নামাযের সাওয়াব পেয়েছে। অর্থাৎ ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করার সাওয়াবের উপযুক্ত হয়ে গেছে। অথবা সে নামাযের উজুবকে পেয়েছে। এখন তার ওপর কাযা আবশ্যক। দ্বিতীয়ত মুহাররিম ও মুবীহের মাঝে সংঘর্ষ হলে মুহাররিমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো فليتم صلاته এর অর্থ হলো فليأت بها على

---

[২২৭]. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

وجه التمام অর্থাৎ এই নামাযকে এবার অন্য সময় পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। তখন যেন অপূর্ণ আদায় না করে।

ইমাম আযম রহ. বলেন, ফজরের নামায আদায় করতে করতে সূর্য উঠে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মাসলাকও এটা।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.এর হাদীস,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لاتحروا لصلاتكم عند طلوع الشمس وعند غروبها

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সূর্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সময় নামাযের জন্য চেষ্টা করো না।" তাছাড়া যে হাদীসগুলি থেকে নষ্ট না হওয়া বুঝে আসে তা সেসব হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক যাতে মাকরূহ সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাই সংঘর্ষের কারণে কিয়াসের দিকে রুজু করতে হবে। আর কিয়াস বলে, আসরের নামায বাতিল হবে না।

কেননা তা অসম্পূর্ণ ওয়াক্তে শুরু হওয়ার কারণে অসম্পূর্ণ ওয়াজিব হয়েছিলো। সুতরাং অসম্পূর্ণ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ফজরের শেষ ওয়াক্ত অসম্পূর্ণ হয় না। তাই ফজরের শেষ ওয়াক্তে নামায আরম্ভকারীর ওপর নামায পূর্ণ ওয়াজিব হয়েছে। যখন পরিপূর্ণ ওয়াজিব হয়েছে পরিপূর্ণই আদায় করতে হবে। অসম্পূর্ণ আদায় করা যাবে না।

ইমাম আবু ইউসূফ রহ. বলেন, ফজরের নামাযের মাঝে যদি সূর্য উঠে যায় তাহলে নামাযে অপেক্ষা করবে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর পূর্ণ করবে। এই নামায নফল হয়ে যাবে।

مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

ইমামতির অধিক হকদার কে?

ইমামতির জন্য এমনি তো অনেক গুনাগুণের বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন সংযম, তাকওয়া, আগে হিজরত, বয়স, ইলম ও কেরাত ইত্যাদি। কিন্তু ইখতিলাফ হলো শেষের দুটি গুণ নিয়ে অর্থাৎ ইলম ও কেরাত।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, أقرأ (ভালো তেলাওয়াতকারী) أعلم (অধিক জ্ঞানী)এর ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্য। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতও এমনি।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.এর হাদীস,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

"লোকদের ইমামতি সে করবে, যে কুরআন শরীফ সবার চেয়ে বেশি ভালো পড়তে পারে। পড়ায় সকলে সমান হলে, দীনের বড় জ্ঞানী ইমামতি করবে।[২২৮] এই হাদীসে أقرأ কে أعلم এর ওপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। যার দ্বারা জানা যায়, ইমামতির যোগ্য প্রথমে أقرأ অর্থাৎ কুরআন যে ভালো পড়ে। أعلم নয়।

এভাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর হাদীস,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমরা তিনজন মানুষ হবে তখন তোমাদের একজন ইমাম হবে। তাদের মধ্যে

---

২২৮. সহীহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ।

ইমাম হওয়ার বেশি যোগ্য যে কুরআন বেশি ভালো পড়ে।[২২৯] এই হাদীসেও ইমামতির বেশি হকদার أقرأ কে বলা হয়েছে।

জবাব : এমন সকল হাদীস যাতে أقرأ কে أعلم এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এগুলির জবাব হলো أقرأ থেকে أعلم ই উদ্দেশ্য। কেননা সে যুগে মানুষ কুরআন আহকাম জেনে পড়তেন। সুতরাং যে যত বড় কারী হতো সে তত বড় আলেম ও ফকীহও হতো।[২৩০]

তিন ইমাম : তাদের মতে أعلم (অধিক জ্ঞানী) أقرأএর ওপর অগ্রবর্তী হবে।

দলীল : হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি.এর হাদীস,

إِنَّهُ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হলেন। রোগ বেড়ে গেলো। তখন তিনি বললেন আবু বকরকে বলো সে লোকদেরকে নামায পড়াবে।[২৩১] এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, أقرأ এর ওপর أعلم অগ্রবর্তী হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাযি.কে ইমামতির নির্দেশ দিলেন। আর তিনি أعلم ছিলেন। যেমন হযরত আবু সাঈদ রাযি.এর উক্তি كان أبو بكر أعلمنا অথচ সেখানে أقرأ অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'আব রাযি.ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন, أقرأكم أبي

---

২২৯. সহীহ মুসলিম।
২৩০. আইনী : ২/৭৩২।
২৩১. সহীহ বুখারী।

أعلم যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বয়সে بن كعب কে أقرأ এর ওপর অগ্রবর্তী করলেন, তাই أعلم ই أقرأ এর তুলনায় ইমাম হওয়ার বেশি হকদার হবে।

الأذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ

ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

চার ইমাম সকলে এক মত যে, ফজর ছাড়া বাকি সকল নামাযে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ফজরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমাম : তাদের মতে ফজরের আযান সুবহে সাদিকের পূর্বে জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর এটাই মত।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি এর হাদীস,

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

"বেলাল রাযি. রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান না শুনবে খাও পান করো।[২৩২] লক্ষ করুন, এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, হযরত বেলাল রাযি. সুবহে সাদেকের পূর্বে আযান দিতেন। আর রাতে যেহেতু আর কোনো নামায নেই তাই অবশ্যই সেটা ফজরের আযান হবে।

অন্য হাদীসে আছে,

لا يغرنكم أذان بلال عن السحور فانه يأذن بليل

---

[২৩২]. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ।

"তোমাদেরকে যেন বেলালের আযান সাহরীর ক্ষেত্রে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা সে রাতে আযান দেয়"।[২৩৩] এই হাদীস থেকেও ফজরের পূর্বের আযানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই দলীলসমূহের আলোকে একথা বলা যেতে পারে যে, ফজরের আযান ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে জায়েয আছে।

জবাব : বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত বেলাল রাযি. তাহাজ্জুদের জন্য আযান দিতেন। তাই তাহাজ্জুদের আযান দ্বারা একথা প্রমাণ করা যে, ফজরের আযান ওয়াক্ত আসার পূর্বে হতো, এটা সঠিক নয়। বুখারী শরীফে আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ

"তোমাদের কাউকে সাহারী খাওয়া থেকে বেলালের আযান কখনো যেন বারণ না করে। কেননা সে রাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানোর জন্য আযান দেয়।"

দেখুন, এই হাদীস থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, বেলালের আযান তাহাজ্জুদের জন্য ছিলো, ফজরের জন্য নয়। তাই সেটাকে ফজরের আযান বলে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েয বলা কিভাবে সহীহ্ হতে পারে। দ্বিতীয়ত সেটা ফজরের আযান হলে ইবনে উম্মে মাকতুম দ্বিতীয়বার কেন আযান দিতেন।

ইমাম আযম রহ. : এর মতে ফজরের আযান ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে জায়েয নেই। ইমাম মুহাম্মদের মতও এটা।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

---

[২৩৩]. বযলুল মাজহুদ : ২/৩০৫।

أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাযি.কে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে ফজর স্পষ্ট না হবে আযান দিবে না। তিনি হাতটি চওড়াভাবে ছড়িয়ে দেখালেন।"

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত।

قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر

এই হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায়, ফজরের আযান ফজর উদিত হওয়ার পর হতো। এর আগে হতো না। তাই ফজরের আযান ফজর হওয়ার পরে দিতে হবে। নতুবা হবে না।

حُكْمُ الْجَمَاعَةِ

জামাতের বিধান

যাহেরিয়া : তাদের মতে জামাআত ফরযে আইন এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

ইমাম আহমদ রহ. : এর মতে জামাআত ফরযে আইন, তবে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. : এর মতে জামাআত ফরযে কেফায়া।

দলীল : তারা সালাতুল খওফের আলোচনা বিশিষ্ট আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

এই আয়াতে জিহাদ চলাকালীন সময়ে নামায কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ভয় ছাড়া নামাযের পথে বাধা এমন বহু জিনিস পাওয়া যায়। তাই বুঝা যায়, নামায কায়েম করা ফরয।

জিহাদের মধ্যে যখন জামাত ফরয বলা হয়েছে, তাহলে আমানের অবস্থায় অবশ্যই ফরয হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত।[২৩৪],

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

এই হাদীসে জামাত বর্জনকারীদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠিন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আমার মন চায়, আমি সে সব লোকদের ঘর জালিয়ে দেই। এমন কঠিন নিন্দা ভর্ৎসনা ফরযের ক্ষেত্রেই হতে পারে। গাররে ফরযের ক্ষেত্রে নয়। অন্য এক হাদীসে আছে,

مَنْ سَمِعَ النِّدَا فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ

"যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনেছে, এরপরও মাসাজিদে আসেনি তার নামায হবে না। তবে যদি কোনো ওযর থাকে।[২৩৫]

অন্য হাদিসে আছে,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

"মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য শুধু মসজিদেই নামায হবে।[২৩৬] এই হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় জামাত কায়েম করা ফরয।

জবাব : সালাতুল খাওফের আলোচনা বিশিষ্ট আয়াতের জবাব হলো, জিহাদের ময়দানে জামাত কায়েম করার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

---

[২৩৪]. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফ।

[২৩৫]. সুনানে ইবনে মাজাহ।

[২৩৬]. সুনানে আবু দাউদ।

এটা জামাত ফরয হওয়ার কারণে নয়। বরং এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে নামায খোদায়ী রহমত ও অদৃশ্যের সাহায্যের মাধ্যম হয়।

মুসলমানদের শিষ্টতা ও একতা দেখে কাফেরদের অন্তরে যাতে প্রভাব সৃষ্টি হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীসের জবাব হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাত থেকে পিছিয়ে থাকা লোকদের সম্পর্কে যা বলেছেন, সব কিছু জামাতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব হিসেবে ছিলো। জামাত ফরয হওয়ার কারণে নয়। নতুবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট বলতেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে لا صلاة শব্দ এসেছে। তার দ্বারা পূর্ণতার নাকচ উদ্দেশ্য, শুদ্ধতার নাকচ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, তারা মসজিদে এসে নামায না পড়লে নামায পরিপূর্ণ হবে না। নামায একেবারে হবেই না, এটা উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **মালেক** রহ.: এর মতে জামাত সুন্নাতে মুআক্কাদা আশাদ্দাতে তাকীদ।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"জামাতের সাথে আদায় করা নামায একা আদায় করা নামাযের তুলনায় সাতাশ গুণ উত্তম।[২৩৭]

এই হাদীস নিয়ে চিন্তা করলে বুঝে আসে, জামাত ছাড়া আদায় করা নামাযও হয়ে যায়। তবে ফযিলাত পাওয়া যায় না। জামাত যদি ফরয হতো তাহলে একা আদায় করা নামায হওয়ার কথা ছিলো না। বুঝা যায়, জামাত ফরয নয়। বরং শুধু সুন্নাত। তাছাড়া ঐ সকল হাদীসও

---

২৩৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

হানাফীদের দলীল যা জামাতের ফযিলাতের ক্ষেত্রে এসেছে। কেননা এর দ্বারা জামাত উত্তম হওয়া প্রমাণ হয়, কিন্তু ফরয হওয়া প্রমাণ হয় না।

إِعَادَةُ الصَّلَاةِ

নামায পুনরায় পড়া

একবার নামায আদায় করার পর সেই নামায পুনরায় জামাতের সাথে পড়া যায় কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ. : এর মতে জামাতের সাথে নামায পুনরায় পড়া সর্বাবস্থায় জায়েয।

দলীল : হযরত ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদের হাদীস,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ .

"যখন তোমাদের কেউ নিজ বাড়িতে নামায পড়ে ফেলে। অতঃপর ইমাম সাহেবকে পেলো যে সে নামায পড়েনি। তাহলে তার সাথে আবার নামায পড়বে। এটা তার জন্য নফল হবে।"[২৩৮]

হযরত জাবের রাযি.'র হাদীস,

إن مُعَاذً يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ

"হযরত মুআয রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে নামায পড়ে ফেলেন এরপর এলাকায় এসে লোকদের ইমামতি করেন।"[২৩৯] এই হাদীস থেকে জানা যায়, একবার নামায পড়ার পর যদি কোথাও জামাত হতে দেখে তাহলে তাতে নফলের নিয়তে শরিক হতে পারে।

---

[২৩৮]. সুনানে আবু দাউদ।

[২৩৯]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

জবাব : হযরত ইয়াযিদের হাদীসের জবাব হলো, এটা সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই মুবীহের বিপরীতে মুহাররিম প্রাধান্য পাবে। দ্বিতীয়ত ইয়াযিদের হাদীসের মতনে ইযতিরাব আছে। তাই দলীলযোগ্য নয়। হযরত জাবের রাযি.এর হাদীসের জবাব হলো। এই হাদীসগুলি নিষিদ্ধতার পূর্বের। তাই মারজুহ হবে।

ইমাম মালেক রহ. : এর মতে একবার জামাতের সাথে নামায আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার পড়তে পারবে না। আর যদি জামাত ছাড়া আদায় করে থাকে তাহলে মাগরিব ছাড়া অন্য নামায পড়তে পারবে।

দলীল : একবার যখন জামাতের সাথে নামায পড়েছে তাহলে সে পরিপূর্ণ আদায় হয়েছে। তাই পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি জামাতের সাথে না পড়ে থাকে তাহলে জামাতের ফযিলাত অর্জন করার জন্য পুনরায় পড়তে পারে। মাগরিব পুনরায় পড়তে যেহেতু নিষেধ করা হয়েছে, তাই মাগরিব পুনরায় পড়বে না। হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত[২৪০]

أن ابن عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُعِدْ لَهُمَا

তার থেকে আরো বর্ণিত আছে,[২৪১]

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِيْ أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ فَصَلِّهَا إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ

এই হাদীসগুলি থেকে জানা যায়, মাগরিবের নামায পুনরায় পড়ার কোনো অবস্থাতে সহীহ নয়।

জবাব : মাগরিব ছাড়া অন্য নামায পুনরায় পড়ার অনুমতি দেওয়া সঠিক নয়। কেননা বাহ্য কথা হলো, দ্বিতীয় বার যখন ঐ নামায পড়বে তখন

---

২৪০. মুআত্তা মালেক।

২৪১. সুনানে দারা কুতনী।

তা নফল হবে। অথচ ফজর ও আসরের পর তো কোনো নফল নামাযই নেই। তাই শুধু মাগরিবকে বিয়োগ করে সাধারণভাবে পুনরায় পড়ার অনুমতি দেওয়া কিভাবে ঠিক হবে।

ইমাম আযম রহ. : এর মতে ফজর আসর ও মাগরিব পুনরায় পড়া যাবে না। তবে যোহর ও ইশা পুনরায় পড়তে পারে।

দলীল : ফজর ও আসরের নামায বিয়োগ করার দলীল হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.এর হাদীস। তিনি বলেন,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

"ফজরের পরে সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত কোনো নামায নেই। আসরের পরে সূর্য ডোবা পর্যন্ত কোনো নামায নেই।[২৪২] এই হাদীসের কারণে ফজর ও আসরের নামাযকে বিয়োগ করা হয়েছে। হযরত আবু যর রাযি. থেকেও এ বিষয়ক একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

সুতরাং তিনি বলেন[২৪৩]

سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

আর মাগরিবের নামায বিয়োগ করার কথা ইমাম মালেক রহ.এর দলিলে উল্লিখিত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীসে আছে। তাছাড়া মাগরিবের নামায তিন রাকাত। আর তিন রাকাত নফলের কোনো বিধান নেই। এক রাকাত মিলিয়ে যদি চার করা হয় তাহলে ইমামের বিরোধিতা হবে।

---

২৪২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

২৪৩. মুসনাদে আহমদ।

الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلظُّهْرِ

যোহরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

সকল ইমামগণ একমত যে, শীতকালে যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। তবে গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.: এর মতে গ্রীষ্মকালেও যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। ইমাম আহমদ থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায বেশি তাড়াতাড়ি পড়তেন।"[২৪৪] অন্যত্র আছে,

عن على رضى الله عنه أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا على ثلث لا تؤخرها الصلاة اذا انت .

"হে আলী, তিনটি জিনিস বিলম্ব করবে না। প্রথম নামায যখন তার সময় হবে।" [২৪৫] এই হাদীস থেকে সাধারণভাবে তাড়াতাড়ি বুঝে আসে।

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْها قَالَت سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

এই হাদীস থেকেও নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শীতকালীন আমল ছিলো। আর শীতকালে যোহরের নামায তাড়াতাড়ির কথা আমরাও বলি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের জবাব হলো,

---

[২৪৪]. জামে তিরমিযী।

[২৪৫]. জামে তিরমিযী।

এখানে নামাযের প্রথম ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়। বরং মুস্তাহাব সময়ের প্রথম অংশ উদ্দেশ্য।[২৪৬]

ইমাম আযম রহ. ও **আহমদ** রহ. : এর মতে শীতকালে যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম এবং গ্রীষ্মকালে দেরি করে পড়া উত্তম।

দলীল : হাদীসে নববী,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"যখন গরমের তীব্রতা বেড়ে যায়, নামায বিলম্ব করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের জোশের কারণে।[২৪৭] হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ

"যখন শীত প্রচন্ড হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন এবং গরম তীব্র হলে নামায দেরি করে পড়তেন।"[২৪৮] এই সকল হাদীসগুলি থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে শীতকালে যেমন তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম, গ্রীষ্মকালে দেরি করে ও ঠান্ডা করে পড়া উত্তম।

الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلْعَصْرِ

আসরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

তিন ইমামের মতে আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম।

দলীল : পবিত্র হাদীস,

---

২৪৬. মেরকাত।

২৪৭. জামে তিরমিযী।

২৪৮. সহীহ বুখারী : ১/৭৬।

عن عائشة أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যখন রোদ হযরত আয়েশা রাযি.এর ঘরে থাকতো।"[২৪৯] হযরত আনাস রাযি. এর হাদীস,[২৫০]

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাযি.এর হাদীস,

يقول كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَنُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

"আমরা আসরের নামায পড়ে উট যবেহ করতাম, এরপর তা দশ ভাগ করে রান্না করতাম এবং সূর্য ডোবার আগেই তাজা গোশত খাইতাম।"[২৫১]
লক্ষ করুন, আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়লেই এতগুলি কাজ করা সম্ভব। এই হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায শুরু ওয়াক্তেই আদায় করতেন। তাই আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম।

জবাব : প্রথম হাদীসের জবাব হলো হযরত আয়েশা রাযি.এর ঘর নীচু ছিলো আর দরজা ও ছোট ছিলো যা পশ্চিম দিক থেকে ছিলো। তা থেকে ঘরে রোদ ঢুকতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ ঘরে রোদ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করেন, তাহলে এর দ্বারা বিলম্ব

---

২৪৯. জামে তিরমিযী।

২৫০. সহীহ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

২৫১. সহীহ মুসলিম।

প্রমাণিত হয়। তাড়াতাড়ি নয়। কেননা পশ্চিম দিকের নীচু দরজায় তখনি রোদ ঢুকবে যখন সূর্য নীচে চলে যাবে। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এটা তাদের ঘটনা যারা দ্রুত চলতেন। অথবা এটা গ্রীষ্মকালীন সময়ের কথা যখন আসর ও মাগরিবের মাঝে অনেক সময় থাকে। তৃতীয় হাদীসের জবাব হলো, কসাই ও বাবুর্চি দক্ষ হলে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে এতগুলি কাজ করা বিচিত্র নয়। আর আরবেব মানুষের বড় বড় টুকরা বানিয়ে অর্ধ রান্না খাওয়ার ব্যাপক অভ্যাস এটাকে আরো দৃঢ় করে। যা বর্তমানে আরববাসীর মধ্যে প্রচলন আছে।

ইমাম আযম রহ. : এর মতে আসরের নামায সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম।

দলীল : হযরত উম্মে সালমা রাযি.এর হাদীস,

قالت كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد تعجيلا للظهر منكم وانتم أشد تعجيلا للعصر منه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামায তার তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়ো।"[২৫২]

অন্য এক হাদীসে আছে,

أَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্কার সাদা থাকতো।"[২৫৩] বিলম্ব করার

২৫২. সুনানে আবু দাউদ।
২৫৩. সুনানে আবু দাউদ।

প্রমাণের ক্ষেত্রে এই হাদীস স্পষ্ট দলীল। হযরত রাফে ইবনে খদীজ রাযি.এর হাদীস,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بتاخير صلاة العصر

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।"[২৫৪] আসরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোন দলীল হতে পারে না। মোটকথা, এই সকল হাদীসে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের নামায দেরি করা উত্তম।

خُرُوْجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

মহিলারা মসজিদে গমন

ইমাম শাফেয়ী রহ. : এর মতে নামাযের জন্য মহিলারা মাসজিদে যাওয়া জায়েয।[২৫৫] দুই ঈদের নামাযে বুড়ি মহিলারা যাওয়া মুস্তাহাব।[২৫৬]

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে মহিলারা শুধু দুই ঈদে শরিক হওয়া জায়েয।[২৫৭]

ইমাম মালেক রহ. : এর মতে যুবতী মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায অথবা দুই ঈদে অংশগ্রহণ করা জায়েয় নেই। তবে বুড়ি মহিলারা দুই ঈদে যাওয়া জায়েয আছে।

সাহেবাঈনের : মতে বুড়ি মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে।

---

২৫৪. মুসনাদে আহমদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/৩০৭।

২৫৫. আইনী : ৩/২২৮।

২৫৬. মাআরেফুস সুনান : ৪/৪৪৬।

২৫৭. প্রাগুক্ত।

প্রমাণিত হয়। তাড়াতাড়ি নয়। কেননা পশ্চিম দিকের নীচু দরজায় তখনি রোদ ঢুকবে যখন সূর্য নীচে চলে যাবে। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এটা তাদের ঘটনা যারা দ্রুত চলতেন। অথবা এটা গ্রীষ্মকালীন সময়ের কথা যখন আসর ও মাগরিবের মাঝে অনেক সময় থাকে। তৃতীয় হাদীসের জবাব হলো, কসাই ও বাবুর্চি দক্ষ হলে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে এতগুলি কাজ করা বিচিত্র নয়। আর আরবেব মানুষের বড় বড় টুকরা বানিয়ে অর্ধ রান্না খাওয়ার ব্যাপক অভ্যাস এটাকে আরো দৃঢ় করে। যা বর্তমানে আরববাসীর মধ্যে প্রচলন আছে।

ইমাম আযম রহ. : এর মতে আসরের নামায সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করার আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম।

দলীল : হযরত উম্মে সালমা রাযি.এর হাদীস,

قالت كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد تعجيلا للظهر منكم وانتم أشد تعجيلا للعصر منه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামায তার তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়ো।"[২৫২]

অন্য এক হাদীসে আছে,

أَن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্কার সাদা থাকতো।"[২৫৩] বিলম্ব করার

২৫২. সুনানে আবু দাউদ।
২৫৩. সুনানে আবু দাউদ।

প্রমাণের ক্ষেত্রে এই হাদীস স্পষ্ট দলীল। হযরত রাফে ইবনে খদীজ রাযি.এর হাদীস,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بتاخير صلاة العصر

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।"[২৫৪] আসরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোন দলীল হতে পারে না। মোটকথা, এই সকল হাদীসে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের নামায দেরি করা উত্তম।

خُرُوْجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

মহিলারা মসজিদে গমন

ইমাম শাফেয়ী রহ. : এর মতে নামাযের জন্য মহিলারা মাসজিদে যাওয়া জায়েয।[২৫৫] দুই ঈদের নামাযে বুড়ি মহিলারা যাওয়া মুস্তাহাব।[২৫৬]

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে মহিলারা শুধু দুই ঈদে শরিক হওয়া জায়েয।[২৫৭]

ইমাম মালেক রহ. : এর মতে যুবতী মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায অথবা দুই ঈদে অংশগ্রহণ করা জায়েয় নেই। তবে বুড়ি মহিলারা দুই ঈদে যাওয়া জায়েয আছে।

সাহেবাঈনের : মতে বুড়ি মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে।

---

২৫৪. মুসনাদে আহমদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/৩০৭।

২৫৫. আইনী : ৩/২২৮।

২৫৬. মাআরেফুস সুনান : ৪/৪৪৬।

২৫৭. প্রাগুক্ত।

দলীল : যারা মহিলাদের মাসজিদে গমন জায়েয বলে তারা হযরত উম্মে আতিয়া রাযি.'র হাদীস থেকে দলীল পেশ করে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিবাহিত, প্রাপ্তবয়স্ক, পর্দানশীন ও হায়েযওয়ালী মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতেন।[২৫৮] এই হাদীস থেকে মহিলা দুই ঈদে অংশগ্রহণ করা বুঝা যায়। এভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা)'র হাদীস,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

"তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে বারণ করো না।"[২৫৯] এই হাদীস থেকে মহিলা মসজিদে যাওয়া প্রমাণিত হয়। তেমনি অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

"আল্লাহর বাদীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বারণ করো না।"[২৬০] এসব হাদীস থেকে মহিলারা মাসজিদে যাওয়ার বৈধতা বুঝা যায়।

জবাব : যেই হাদীসগুলি থেকে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়ার বৈধতা বুঝা যায় সেটা সেই যুগের কথা যে যুগে মহিলাদের এ কাজের অনুমতি ছিলো। পরবর্তীতে ফিতনার আশঙ্কায় বারণ করা হয়েছে। এখন তো আরো বেশি আশঙ্কা। তাই মুতায়াখখিরীন আলেমগণ বের না হওয়ার ওপর একমত হয়েছেন। দ্বিতীয় জবাব হলো এই সকল হাদীসে বুড়ি মহিলাদেরকে অনুমতি প্রধান করা হয়েছে।

---

২৫৮. জামে তিরমিযী : ১/১২০।

২৫৯. সহীহ বুখারী।

২৬০. হেদায়ার হাশিয়া : ৮৬।

ইমাম আযম রহ.:এর মতে যুবতী মহিলা মাসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া জায়েয নেই। তবে বুড়ি মহিলারা শুধু ফজর, মাগরিব ও ইশার সময় মাসজিদে যেতে পারবে। তবে তাদের জন্যও ঘরে নামায পড়া উত্তম।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.'র হাদীস। وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "তাদের ঘর তাদের জন্য উত্তম।"[২৬১]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا .

"মহিলা তার রুমে নামায পড়ার তুলনায় তার অন্দর মহলে নামায পড়া ভালো। এর চেয়ে তার কোঠায় নামায পড়া আরো ভালো।"[২৬২] হযরত আয়েশা রাযি. তার যুগ সম্পর্কে বলেন,

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ বিষয়গুলি দেখতেন, যা মহিলারা বের করেছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করতেন। যেমন : বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো"।[২৬৩]

এই সকল হাদীস থেকে জানা যায়, মহিলারা মাসজিদে যাওয়া ফিতনার কারণ হতে পারে, তাই জায়েয নেই।

[উপরোক্ত হাদীসগুলির বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা বুঝা যায়, মহিলারা মাসজিদে যেতে চাইলে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। ইমাম নভভী রহ. সে শর্তগুলি হাদীস থেকে সংগ্রহ করে একত্রে লিখে দিয়েছেন।

---

২৬১. সুনানে আবু দাউদ।
২৬২. সুনানে আবু দাউদ।
২৬৩. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরেফ সুনান : ৪/৪৪।

শর্তগুলি হলো, ১. মাসজিদে গমনকালে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। এমনকি পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির চিহ্ন থাকতে পারবে না। ২. সেজে-গুজে যেতে পারবে না। বরং জীর্ণ শীর্ণ কাপড় পরিধান করে যাবে। ৩. এমন গহনা পরিধান করে যেতে পারবে না যার আওয়াজ শোনা যায়। ৪. সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে যেতে পারবে না। ৫. যাওয়া আসার পথে বা মাসজিদে পুরুষের সাথে মিলতে পারবে না। ৬. যুবতী কিংবা এমন মহিলা যেতে পারবে না যাদের দ্বারা ফিৎনার আশংকা রয়েছে। ৭. গমনাগমনের পথে কোনো প্রকার ফেৎনাকারীর উপস্থিতি থাকতে পারবে না।[২৬৪]স্মর্তব্য, শর্তগুলি পাওয়া গেলে যাওয়া বৈধ হবে মাত্র। মাসজিদের ফযিলত পাবে না। বরং ঘরে নামায আদায়ে সাওয়াব বেশি। অনুবাদক]

صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া

যদি মায়্যিতকে জানাযা পড়া ছাড়া দাফন করে দেওয়া হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সকল ইমামগণ একমত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মায়্যিতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত না হয়ে যাবে কবরের ওপর জানাযা পড়া যেতে পারে। আর যদি জানাযার নামায পড়ে মায়্যিতকে দাফন করা হয়, তাহলে কবরের ওপর দ্বিতীয় তৃতীয়বার নামায পড়ার বিষয়ে ইখতিলাফ আছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে কবরের ওপর দ্বিতীয় তৃতীয়বার জানাযা পড়া যেতে পারে।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي.

---

২৬৪. সহীহ মুসলিম : ১/১৮৩

"এক কালো মহিলা মাসজিদ ঝাড়ূ দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখছিলেন না। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে মারা গেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে বললে না কেন।"[২৬৫] হাদীসে আছে, فصلى على قبرها "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের ওপর জানাযা পড়লেন।" হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى قبراً منتبذا فصف اصحابه فصلى عليه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবর (যা সকল কবর থেকে দূরে ছিলো) দেখলেন। সাহাবায়ে কেরামকে কাতার বন্দী করে জানাযা পড়ালেন।"[২৬৬] হযরত ইবনে ওমর রাযি. আপন ভাই আসেম এবং হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কবরের ওপর জানাযা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[২৬৭] যার দ্বারা প্রমাণ হয় কবরের ওপর জানাযা পড়া জায়েয।

জবাব : যেসব হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ওপর জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ আছে তার জবাব হলো, এটা তার বৈশিষ্ট্য। কেননা তিনি জানাযা নামায পড়ার দ্বারা কবরে নূর হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

---

২৬৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

২৬৬. জামে তিরমিযী।

২৬৭. আল জাওয়াহিরুন নকী : ৪/৪৮, সুনানে বায়হাকী : ৪/৪৯।

"এই কবরগুলি অন্ধকারে পূর্ণ। আমার জানাযা পড়ার দ্বারা আল্লাহ নূর দিয়ে ভরে দিবেন।"[২৬৮]

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল উম্মতের অভিভাবক। আর অভিভাবক দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারে। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা রাযি.'র হাদীসের জবাব হলো এখানে সালাত থেকে জানাযার নামায উদ্দেশ্য নয়। বরং কল্যাণের দোআ উদ্দেশ্য। কিছু কিছু হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।"[২৬৯]

ইমাম আযম রহ. **ও মালেক** রহ.: এর মতে মায়্যিতকে জানাযা পড়ে দাফন করা হলে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া জায়েয নেই।

দলীল : আমাদের সবচেয়ে বড় দলীল হলো, সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু কোথাও তারা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা পাওয়া যায় না। হযরত নাফে হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর আমল বর্ণনা করেন,

إنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليه ودعا وانصرف ولم يعد الصلاة

"তিনি কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করলে জানাযা পড়ে দোআ করে ফিরে আসতেন। আর দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তেন না।"[২৭০]

লক্ষ করুন, দ্বিতীয়বার জানাযাকে পরিস্কার নাকচ করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেটা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা পাওয়া যায় সেটা তার বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমনটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

---

[২৬৮]. সহীহ মুসলিম।

[২৬৯]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : বযলুল মাজহুদ : ৪/২০৭, আওজাযুল মাসালেক : ৫/৪৪৯, আইনী : ৪/২৯।

[২৭০]. আল্-জাওয়াহিরুন নাকী : ৪/৪৮।

الْقِيَامُ لِلْجَنَازَةِ

মায়্যিত দেখে দাঁড়ানো

ইমাম আহমদ রহ. : এর মতে মায়্যিত দেখে দাঁড়ানো ওয়াজিব।

দলীল : হযরত আবু সাঈদে খুদরী রাযি. এর হাদীস,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে দাঁড়িয়ে যাও। যে তার পিছনে যাবে জানাযা মাটিতে রাখার আগে বসবে না।"[২৭১] এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে দাঁড়ানোর নির্দেশ উদ্ধৃত আছে। হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال مر على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة فقام وقال قوموا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিবাহিত হলো, তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা দাঁড়াও।[২৭২]

এই হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জানাযা দেখে দাঁড়ানো উচিত।

জবাব : জামহুরের পক্ষ থেকে এই সব হাদীসের এভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জানাযার জন্য দাঁড়ানোর কথা যে সকল হাদীসে আছে তা সবগুলি রহিত। হযরত আলী রাযি.র হাদীস নাসেখ। যা নীচে আসছে।

---

[২৭১]. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

[২৭২]. সুনানে ইবনে মাযা।

তিন ইমাম : তাঁদের মতে জানাযা দেখে দাঁড়ানো জায়েয় নেই। সাহেবাঈনের মাসলাকও এটাই।

দলীল : হযরত আলী রাযি. এর হাদীস,[২৭৩]

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم فى الجنازة ثم جلس بعد

অন্য হাদীসে আছে,

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা সম্পর্কে প্রথমে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বসতে শুরু করেন এবং আমাদেরকেও বসার নির্দেশ দেন।[২৭৪] এই হাদীস থেকে পরিস্কার জানা যায়, জানাযার জন্য দাঁড়ানো শুরু যুগে ছিলো। পরে মানসুখ হয়ে গেছে। তাই এর ওপর আমল করা যাবে না।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

যাকাত অধ্যায়

زَكَاةُ الْإِبِلِ

উটের যাকাত

উটের যাকাত সম্পর্কে ১২০ পর্যন্ত যে ব্যাখ্যা আছে তাতে সকল ইমামগণ একমত। কারো কোনো ইখতিলাফ নেই। তবে ১২০ পর পর ইখতিলাফ আছে।

---

২৭৩. সহীহ মুসলিম।

২৭৪. সহীহ ইবনে হিব্বান।

ইমাম শাফেয়ী রহ.: এর মতে একশত বিশের পরে استيناف তথা নতুন হিসাব হয় না। বরং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হেক্কা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালেক রহ. ও **আহমদ** রহ.: এর মতেও একশত বিশের পর ইস্তিনাফ হয় না। বরং ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মাসলাকের মতো প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চশে একটি হেক্কা ওয়াজিব হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু, ইমাম শাফেয়ী রহ. এই হিসাব একশত একুশ থেকে জারি করেন। আর এরা একশত ত্রিশ থেকে জারি করেন।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

قَالَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبون.

উটের সংখ্যা যদি একশত বিশের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক পঞ্চাশে ১টি হেক্কা এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে।[২৭৫]

এই হাদীস থেকে দলীল পেশ করে তিন ইমাম বলেন, একশত বিশের ওপর শুধু ৪০ ও ৫০এর হিসাব হবে। পাঁচ উটে একটি ছাগল ও পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখায বিশিষ্ট হিসাব চলবে না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে একশত বিশের পরে ইস্তিনাফ হবে। অর্থাৎ সেই হিসাব চলবে যা শুরুতে চলতো। প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং প্রত্যেক পঁচিশ উটে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে।

দলীল : হযরত আমর বিন হাযমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সহিফা লেখে দিয়েছিলেন। তাতে উটের যাকাত বিষয়ে এই নির্দেশ ছিলো যে,

---

[২৭৫]. জামে তিরমিযী।

أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فاذا كانت أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة فما فضل فانه يعاد إلى اول فريضة الإبل.

"উটের সংখ্যা যখন নব্বই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তাতে দুটি হেক্কা ওয়াজিব হবে একশত বিশ পর্যন্ত। এর চেয়ে যখন বেড়ে যাবে তখন প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি করে হেক্কা এবং যা বাকি থাকবে তা প্রথম হিসাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।"[২৭৬]

অর্থাৎ বাকি যা বাঁচবে তাতে ঐ হিসাব জারি হবে যা প্রথম ফরিযা (পাঁচ থেকে নিয়ে একশত বিশ পর্যন্ত) জারি হয়েছিল। আর প্রথম ফরিযায় পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং পঁচিশে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হতো। সুতরাং প্রমাণ হলো, একশত বিশের ওপরে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং প্রত্যেক পঁচিশে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। তাছাড়া আমরা একশত বিশ থেকে উপরে যেই হিসাব জারি করেছি, তাতে তাদের হাদীস মতেও আমল হয়ে যায়। প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হেক্কা এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়। তাই তাদের হাদীসের জবাবেরও প্রয়োজন নেই।

ফায়েদা : এক থেকে বিশ পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। এরপর পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখায, এরপর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিন লাবুন, এরপর পঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত একটি হেক্কা ওয়াজিব হবে। এরপর ষাট থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জিযয়া ওয়াজিব হবে। এরপর আশি থেকে নব্বই পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। এরপর নব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত দুটি হেক্কা ওয়াজিব হবে।

---

[২৭৬]. সুনানে নাসায়ী, মারাসিলে আবু দাউদ।

সংজ্ঞা

বিনতে মাখায : ঐ উষ্ট্রী যা এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেছে।

বিনতে লাবুন : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে।

হেক্কা : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা পূর্ণ তিন বছর হয়ে চতুর্থ বছরে প্রবেশ করেছে।

জিযয়া : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে।

حَقِيْقَةُ الرِّكَازِ

রেকাযের বাস্তবতা

রেকায বলে প্রত্যেক ঐ জিনিসকে যা জমিনে পুতে রাখা হয়েছে, অথবা দাফন করা হয়েছে। সুতরাং কাঞ্জ (দাফনকৃত খনিজ সম্পদ) সর্ব সম্মতিক্রমে এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মা'দিনের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে। মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মা'দিনে কোনো যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দলীল : তারা এর স্বপক্ষে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ হাদীস পেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন[২৭৭], المعدن جبار এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, মা'দিনে যাকাত নেই।

জবাব : হাদীসের এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যে, "মা'দিনে যাকাত নেই" এটা হাদীসের অগ্র-পশ্চাতের বিপরীত। কেননা, এই বাক্যের আগে পরে দিয়াতের বিধানের বিবরণ দিয়েছেন। তাহলে এর থেকে এই উদ্দেশ্য

---

[২৭৭]. জামে তিরমিযী।

কিভাবে হতে পারে যে, মা'দিনে যাকাত নেই। বরং এর উদ্দেশ্য সেটাই হবে যা অগ্র-পশ্চাতের সাথে মিলে। আর তা হলো, কেউ যদি খনিতে পড়ে মারা যায় তাহলে এটা বৃথা যাবে। অর্থাৎ কারো ওপর এর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসের সেই উদ্দেশ্যই যদি নেওয়া হয় যা তারা নিয়েছে, "মা'দিনে যাকাত নেই" তাহলে তারা স্বর্ণ ও রূপার মা'দিনে যাকাতের কথা কেন বলেন। বুঝা গেল, তাদেরও এই হাদীসের ব্যাপকতার ওপর আমল নেই।

ইমাম আযম রহ. ও **আহমদ** রহ. বলেন, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। আর রেকাযের মতো মা'দিনেও যাকাত আছে।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রেকাযে খুমুস আছে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ রেকায কী জিনিস? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টির সময় যেই স্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন।[২৭৮] এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেকাযের ব্যাখ্যা করেছেন মা'দিন দ্বারা। যা একথার স্পষ্ট দলীল যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রাযি.কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করার সময় তাকে যেই সহিফা লিখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাতে লেখা ছিলো[২৭৯] وفى السيوب الخمس

السيوب এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জাযারী রহ. বলেন,[২৮০]

---

[২৭৮]. উমদাতুল কারী : ৯/১০৩।
[২৭৯]. মানালুত তালেব : ৭২।
[২৮০]. প্রাগুক্ত।

السيوب الركاز وهو المال المدون فى الجاهلية أو المعدن

দেখুন রেকাযের এই ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায় যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক জায়গায় বলেন[২৮১], المعدن والركاز واحد । লোগাতও আমাদের কথাকে দৃঢ় করে। সুতরাং লিসানুল আরবে আছে, রেকায শব্দটি মা'দিনের ওপরই প্রয়োগ হয়।[২৮২]। এই সকল দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। আর রেকাযের মতো তাতেও খুমুস ওয়াজিব।

اَلْجَمْعُ وَالتَّفْرِيْقُ

একত্রিতকরণ ও বিভাজন

ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

তিন ইমাম : তারা বলেন, মাল দু'জনের মাঝে যদি অংশীদারপূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর নয়। বরং সমষ্টির ওপর ওয়াজিব। যেমন, আশিটি ছাগল দুইজনের মাঝে যৌথ। তখন যাকাত আশি ছাগলের ওপর ওয়াজিব হবে। আর একথা মনে করা হবে যে, আশিটি ছাগল একই ব্যক্তির মালিকানা। যেহেতু আশিটি ছাগলে নেসাব পরিবর্তন হয় না, বরং একটি ছাগল ওয়াজিব থাকে। যা চল্লিশ ছাগলে ওয়াজিব হয়, তাই যাকাত হিসেবে একটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি উভয় অংশকে আলাদা আলাদা হিসাব করা হতো। তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি ছাগল হতো। এই ছুরতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি করে ছাগল ওয়াজিব হওয়া উচিত। কিন্তু দুইজন যৌথ হওয়ার কারণে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ভিন্ন ছাগল উসুল না করে সমষ্টি

---

[২৮১]. আইনী : ৯/১০০।

[২৮২]. লিসানুল আরব : ৭/২২৩, মা'আরেফুস সুনান : ৫/২৪৫।

থেকে একটি ছাগল উসুল করা হবে। এরই দ্বারা দুজনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

এরপর তিন ইমামের মতে এই ইশতিরাকেরও দুটি দিক। একটি হলো, দুইজন মালিকানা হিসেবে মালে শরিক হওয়া। এটাকে خلطة الشيوع তথা মালিকানা শিরকত বলে। দ্বিতীয় দিক হলো, দুইজন মালিকানায় শরিক নয়। বরং দুজনের আস্তাবল এক এবং কমপক্ষে চারটি জিনিসে শরিক। রাখাল, চারণ ভূমি, দুধ দহনকারী ও বলদ। এটাকে خلطة الجوار বলে। তিন ইমামের মতে খুলতাতুল জাওয়ারেরও ধর্তব্য আছে। যেমন খুলতাতুশ শুয়ূ'র ধর্তব্য আছে। সুতরাং খুলতাতুল জাওয়ারেরও যাকাত দুই ব্যক্তির সমষ্টিগত মালের ওপর ওয়াজিব হবে। এরপর স্মরণ রাখতে হবে, সমষ্টির ওপর যাকাত ওয়াজিব হলে এককভাবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার তুলনায় কখনো কম আসে, কখনো বেশি আসে। এবার তিন ইমাম বলেন, হাদীসের উল্লিখিত বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে দুই মানুষ মালের মাঝে খুলতাতুশ শুয়ু' বা খুলতাতুল জাওয়ার সৃষ্টি করে একত্রিত করবে না। আবার আলাদাও করবে না। যেই অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকতে দিবে। যেমন, দুইজন মানুষের যদি আশিটি ছাগল থাকে, তাহলে পৃথক থাকলে দুটি ছাগল ওয়াজিব হবে। একজনের চল্লিশটির ওপর একটি, অপরজনের চল্লিশটির ওপর আরেকটি। আর যৌথ থাকা অবস্থায় আশিটির সমষ্টির ওপর শুধু একটি ওয়াজিব হবে।

তাহলে এবার এমন দুইজন মানুষ যাদের মাঝে খুলতাতুশ শুয়ু' বা খুলতাতুল জাওয়ার কিছুই নেই, যাকাত কমানোর জন্য পরস্পরে শিরকত সৃষ্টি করা নাজায়েয। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يجمع بين متفرق "ভিন্ন ভিন্ন মাল একত্রিত করা হবে না"

(অর্থাৎ কোনো শিরকত সৃষ্টি করা হবে না)। এভাবে দুই জন মানুষের মাঝে যদি দুইশত ছাগল যৌথ হয়। তাহলে তিনটি ছাগল ওয়াজিব হয়। আর যদি তারা শিরকতকে তুলে নিয়ে অর্ধেক অর্ধেক বন্টন করে নেয়, তাহলে প্রত্যেকের কাছে একশত ছাগল থাকবে। তখন প্রত্যেক মানুষের ওপর শুধু একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। সুতরাং যাকাত কম ওয়াজিব করার জন্য যদি শিরকত তুলে নেয় তাহলে এটা নাজায়েয হবে।

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يفرق بين مجتمع একত্রিত মালকে পৃথক করা যাবে না। (অর্থাৎ শিরকত তুলে নেওয়া যাবে না)।

আহনাফের মতে খুলতাতুশ শুয়ূ'রও কোনো গুরুত্ব নেই, খুলতাতুল জাওয়ারেরও কোনো গুরুত্ব নেই। বরং সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নিজস্ব অংশে যাকাত ওয়াজিব হবে। সমষ্টির ওপর নয়। সুতরাং আশিটি ছাগল যদি দুই ব্যক্তির মাঝে অর্ধেক অর্ধেক হিসেবে যৌথ হয়, (মালিকানা হিসেবে হোক কিংবা জার হিসেবে) আমাদের মতে যৌথ হওয়ার কারণে যেহেতু কোনো পার্থক্য হয় না, তাই প্রত্যেকের ওপর আলাদা আলাদা যাকাত ওয়াজিব হবে।

এমন নয় যে, যৌথ হওয়ার কারণে সমষ্টি থেকে যাকাত উসুল করা হবে এবং আশিটি থেকে একটি ছাগল নেওয়া হবে। বরং প্রত্যেকের চল্লিশটি থেকে আলাদা আলাদা একটি করে ছাগল নেওয়া হবে। হাদীসের মধ্যে ভিন্ন কোনো মাসআলা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এই কথারই নাকচ করা হয়েছে যে, শিরকত যাকাতের কম-বেশির মাঝে কোনো প্রভাব ফেলে না।

তাই তোমরা যদি যাকাত কমানোর জন্য শিরকত সৃষ্টি করতে চাও, অথবা যাকাত বেশি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য শিরকত তুলে নাও, তাহলে এই সকল তৎপরতা নিষ্ফল। কেননা, যাকাত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অংশের

ওপর ওয়াজিব হবে। তাই বলেন, لا يجمع بين متفرق পৃথক মালকে একত্রিত করা যাবে না।

ولا يفرق بين مجتمع একত্রিত মালকে পৃথক করো না। বরং উভয়টিকে নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।[২৮৩]

العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ

জীব-জন্তুর ক্ষতি বৃথা

কোনো ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে কোনো জন্তু যদি আঘাত করে, এর দিয়াত ওয়াজিব হবে কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে, জন্তু দিনে কাউকে ক্ষতি করলে দিয়াত ওয়াজিব হবে না। আর রাতে ক্ষতি করলে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

দলীল : ইমাম শাফেয়ী রহ. দিন-রাতে এই পার্থক্য একটি মারফু' হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছেন।

عن البراء بن عازب قال كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائطا فافسدت فيه فكلم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها.

"হযরত বারা বিন আযেব রাযি.এর উষ্ট্রী কারো বাগানে ঢুকে কিছু ক্ষতি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি সমাধান দিলেন যে, দিনে বাগান হেফাযত করার দায়িত্ব বাগানের মালিকের।[২৮৪] আর জীব-জন্তু রাতে হেফাযত করার দায়িত্ব জীব-জন্তুর মালিকের। এই হাদীসে রাসূল

---

[২৮৩]. তাকরীরে ওসমানী থেকে সংগৃহীত।

[২৮৪]. সুনানে আবু দাউদ : ২/৪০২, ৪০৩, সুনানে ইবনে মাজা : ১৬৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে জীব-জন্তু দেখা শোনার দায়িত্ব তার মালিকদেরকে দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, জীব রাতে কোনো ক্ষতি করলে এর দায়ভার মালিকের ঘাড়ে। দিনে ক্ষতি করলে এর দায়ভার মালিকের ওপর নয়।

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী রহ. العجماء جرحها جبار (জীবের ক্ষতি বৃথা) এই হাদীসকে দিনের সাথে খাস করেন। যে, দিনে জীব কোনো ক্ষতি করলে তা মাফ, রাতে নয়।

জবাব : হযরত বারা বিন আযেব থেকে হারাস বিন মুহাইয়াসা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মাজহুল রাবী। তাছাড়া হযরত বারা থেকে তার শ্রবণও প্রমাণিত নয়। আর অন্য হাদীস ব্যাপক। তাই দলীল ছাড়া খাস করা যায় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে জীবের সাথে চালক না থাকলে জরিমানা আসবে না। আর চালক থাকলে এবং অবহেলা করলে জরিমানা আসবে।

দলীল : جرحها جبار হাদীসের ব্যাপকতা হানাফীদের কথা দৃঢ় করে। কেননা, তাতে রাত দিনের কোনো ব্যবধান নেই। ব্যাপক রাখা হয়েছে যে, জীবের ক্ষতির কোনো জরিমানা নেই। সুতরাং এই ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে আমরা রাত দিনে একই বিধান রেখেছি। তবে মালিক যদি সাথে থাকে এবং ক্ষতির মধ্যে তার অবহেলার দখল থাকে তাহলে তার ওপর জরিমানা আসবে।

ফায়েদা : এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশ المعدن جبار এবং وفى الركاز الخمس এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর البئر جبار এই অংশে কোনো ইখতিলাফ নেই। এর সারাংশ শুধু এতটুকু যে, কেউ যদি নিজস্ব জমিনে কিংবা মালিকের অনুমতি নিয়ে অন্যের জমিনে কূপ খনন করে

এবং তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে খননকারীর ওপর কোনে জরিমানা আসবে না।

الزَّكَاةُ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ

ইয়াতিমের মালে যাকাত

তিন ইমাম : তাদের মতে ইয়াতিমের মালে যাকাত ওয়াজিব।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى ياكله الصدقة.

"শোনো, যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতিমের দায়িত্বশীল হবে, ইয়াতিমের মাল থাকলে তার জন্য তাতে ব্যবসা করা উচিত। তা এমনি ফেলে রাখবে না, যে তা সদকা শেষ করে দিবে।"[২৮৫]

এই হাদীসে দায়িত্বশীলকে ইয়াতিমের মালে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ব্যবসার দ্বারা লাভ আসবে। মাল বাড়তে থাকবে। কেননা, তারা যদি মাল এমনি ফেলে রাখে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হতে থাকবে এবং মাল কমতে থাকবে। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইয়াতিমের মালে যাকাত ওয়াজিব হয়।

জবাব : এই হাদীসের সনদে মুসান্না বিন সব্বাহ নামক একজন রাবী আছে যিনি দুর্বল। তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়। দ্বিতীয় জবাব হলো, এখানে সদকা থেকে খরচ উদ্দেশ্য। যাকাত উদ্দেশ্য নয়। তাই এর দ্বারা যাকাত প্রমাণ করা যায় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে ইয়াতিমের মালে যাকাত নেই।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

---

২৮৫. জামে তিরমিযী।

قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর মানুষ থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। বাচ্চা থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পাগল থেকে বিবেক ফিরে আসা পর্যন্ত।"[২৮৬] এই হাদীসে বলা হয়েছে, বাচ্চা বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত শরীয়াতের বিধানের মুকাল্লাফ হবে না। যাকাতও শরীআতের একটি বিধান। তাই ইয়াতিম বাচ্চা যাকাতেরও মুকাল্লাফ হবে না।

الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ

অর্জিত সম্পদ

কারো কাছে যদি নেসাব পরিমাণ মাল থাকে, কিন্তু তার ওপর এখনো বছর অতিবাহিত হয়নি। মধ্যখানে আরো কিছু মাল অর্জন হলো। চাই সেটা অন্য মাল হোক। এটাকে মালে মুস্তাফাদ বা অর্জিত মাল বলে। এক্ষেত্রে ইখতিলাফ হলো, এর ওপর ভিন্ন বছর গণনা করা হবে, নাকি পূর্বের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলা হবে? এর তিনটি ছুরত।

প্রথম ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে নয়। (বরং ভিন্ন প্রকারের) সর্বসম্মতক্রমে এর হুকুম হলো, মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মাল থেকে ভিন্ন রাখা হবে। পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। আর উভয়টির ওপর পৃথক পৃথক বছর গণনা করা হবে। দ্বিতীয় ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে এবং পূর্বের মালের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। (যেমন- ছাগল ছিলো, বছরের মাঝে তা থেকে বাচ্চা হয়েছে। অথবা ব্যবসার মাল ছিলো, তাতে লাভ হয়েছে।)

---

২৮৬. সুনানে আবু দাউদ।

এই ছুরতে সর্বসম্মতক্রমে দুটিকে মিলানো হবে এবং পূর্বের মালের সাথে মালে মুস্তাফাদের যাকাত আদায় করা হবে। তৃতীয় ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে। কিন্তু পূর্বের মালের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। বরং অন্য কোনো উপায়ে অর্জন হয়েছে। (যেমন : কেউ দান করেছে, কিংবা মীরাস সূত্রে পেয়েছে) এই ছুরতে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমাম বলেন, এই ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। বরং দুটিকে আলাদা আলাদা বছর গণনা করা হবে।
দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

কোনো মানুষ যদি মালে মুস্তাফাদ অর্জন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে বছর পূর্ণ হবে না, যাকাত আসবে না।[২৮৭] এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। বরং আলাদা রাখা হবে। আর যখন তার বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তার যাকাত আদায় করা হবে। পূর্বের মালের সাথে তার যাকাত আদায় করা হবে না।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসটি দুই সনদে বর্ণিত। যার মধ্য থেকে একটি সনদ আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম রাবীর কারণে দুর্বল। দ্বিতীয় সনদটি সহীহ। কিন্তু এই ছুরতে জবাব হলো, এই হাদীসটি প্রথম ছুরত সংক্রান্ত। অর্থাৎ মালে মুস্তাফাদ যদি পূর্বের মালের প্রকার থেকে না হয়। তখন এই হুকুম যে, মালে মুস্তাফাদের ওপর ভিন্নভাবে বছর গণনা করা হবে। তৃতীয় ছুরতের সম্পর্কিত নয়।

ইমাম আযম রহ. বলেন, এই ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে।

---

[২৮৭]. জামে তিরমিযী।

দলীল : যেই ইল্লতের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হয়েছে, সেটা এখানেও পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে। তাই উভয় ছুরতে একই হুকুম হবে। দ্বিতীয়ত, শরীয়াতে কষ্ট দূর করে সহজতা সৃষ্টি করার জন্য বিধানের মধ্যে হালকা করা হয়। না হলে মারাত্মক কষ্ট দেখা দিবে। কেননা না মিলালে প্রতিদিন আসা মাল আলাদা রাখতে হবে। আর প্রত্যেকটির ওপর আলাদা আলাদা বছর গণনা করতে হবে। এতে অনেক বড় অসুবিধা। আর তারা যেই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তার ব্যাপকতার ওপর তাদের নিজেদেরও আমল নেই। সুতরাং যেভাবে তারা দ্বিতীয় ছুরতকে উল্লিখিত হাদীসের বিধান থেকে বিয়োগ করেছেন, তেমনি হানাফীরা কষ্ট দূর করার জন্য তৃতীয় ছুরতকে বিয়োগ করেছেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

حُكْمُ الخَرْصِ

জরিপ করার বিধান

خرص শব্দের আভিধানিক অর্থ জরিপ করা। পরিভাষায় খরস বলে, ক্ষেত-ফসল পাকার আগে হাকেম একজন মানুষ পাঠিয়ে ফসল জরিপ করে নিয়ে আসবে। এই বছর কার ক্ষেতে কতটুকু ফসল হচ্ছে। এখন ইখতিলাফ হলো, এই জরিপ জায়েয আছে কি না?

তিন ইমামের মতে জরিপ জায়েয আছে।

দলীল : পবিত্র হাদীস,[২৮৮] إذا خرصتم فخذوا

অন্য এক হাদীসে আছে[২৮৯],

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

---

[২৮৮]. জামে তিরমিযী।

[২৮৯]. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী।

প্রমাণিত হয়। তাড়াতাড়ি নয়। কেননা পশ্চিম দিকের নীচু দরজায় তখনি রোদ ঢুকবে যখন সূর্য নীচে চলে যাবে। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এটা তাদের ঘটনা যারা দ্রুত চলতেন। অথবা এটা গ্রীষ্মকালীন সময়ের কথা যখন আসর ও মাগরিবের মাঝে অনেক সময় থাকে। তৃতীয় হাদীসের জবাব হলো, কসাই ও বাবুর্চি দক্ষ হলে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে এতগুলি কাজ করা বিচিত্র নয়। আর আরবেব মানুষের বড় বড় টুকরা বানিয়ে অর্ধ রান্না খাওয়ার ব্যাপক অভ্যাস এটাকে আরো দৃঢ় করে। যা বর্তমানে আরববাসীর মধ্যে প্রচলন আছে।

ইমাম আযম রহ. : এর মতে আসরের নামায সূর্য হলদে বর্ণ ধারণ করার আ!গ পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম।

দলীল : হযরত উম্মে সালমা রাযি.এর হাদীস,

قالت كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد تعجيلا للظهر منكم وانتم أشد تعجيلا للعصر منه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায তোমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামায তার তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়ো।"[২৫২]

অন্য এক হাদীসে আছে,

أَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্কার সাদা থাকতো।"[২৫৩] বিলম্ব করার

---

[২৫২]. সুনানে আবু দাউদ।

[২৫৩]. সুনানে আবু দাউদ।

প্রমাণের ক্ষেত্রে এই হাদীস স্পষ্ট দলীল। হযরত রাফে ইবনে খদীজ রাযি.এর হাদীস,

أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بتاخير صلاة العصر

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।"[২৫৪] আসরের নামায দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার এর চেয়ে স্পষ্ট আর কোন দলীল হতে পারে না। মোটকথা, এই সকল হাদীসে চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত আসরের নামায দেরি করা উত্তম।

خُرُوْجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

মহিলারা মসজিদে গমন

ইমাম শাফেয়ী রহ. : এর মতে নামাযের জন্য মহিলারা মাসজিদে যাওয়া জায়েয।[২৫৫] দুই ঈদের নামাযে বুড়ি মহিলারা যাওয়া মুস্তাহাব।[২৫৬]

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে মহিলারা শুধু দুই ঈদে শরিক হওয়া জায়েয।[২৫৭]

ইমাম মালেক রহ. : এর মতে যুবতী মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায অথবা দুই ঈদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নেই। তবে বুড়ি মহিলারা দুই ঈদে যাওয়া জায়েয আছে।

সাহেবাঈনের : মতে বুড়ি মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে।

---

২৫৪. মুসনাদে আহমদ, মাজমাউয যাওয়াযেদ : ১/৩০৭।

২৫৫. আইনী : ৩/২২৮।

২৫৬. মাআরেফুস সুনান : ৪/৪৪৬।

২৫৭. প্রাগুক্ত।

দলীল : যারা মহিলাদের মাসজিদে গমন জায়েয বলে তারা হযরত উম্মে আতিয়া রাযি.'র হাদীস থেকে দলীল পেশ করে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিবাহিত, প্রাপ্তবয়স্ক, পর্দানশীন ও হায়েযওয়ালী মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতেন।[২৫৮] এই হাদীস থেকে মহিলা দুই ঈদে অংশগ্রহণ করা বুঝা যায়। এভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা)'র হাদীস,

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا

"তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে বারণ করো না।"[২৫৯] এই হাদীস থেকে মহিলা মসজিদে যাওয়া প্রমাণিত হয়। তেমনি অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

"আল্লাহর বাদীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বারণ করো না।"[২৬০] এসব হাদীস থেকে মহিলারা মাসজিদে যাওয়ার বৈধতা বুঝা যায়।

জবাব : যেই হাদীসগুলি থেকে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়ার বৈধতা বুঝা যায় সেটা সেই যুগের কথা যে যুগে মহিলাদের এ কাজের অনুমতি ছিলো। পরবর্তীতে ফিতনার আশঙ্কায় বারণ করা হয়েছে। এখন তো আরো বেশি আশঙ্কা। তাই মুতায়াখখিরীন আলেমগণ বের না হওয়ার ওপর একমত হয়েছেন। দ্বিতীয় জবাব হলো এই সকল হাদীসে বুড়ি মহিলাদেরকে অনুমতি প্রধান করা হয়েছে।

---

[২৫৮]. জামে তিরমিযী : ১/১২০।
[২৫৯]. সহীহ বুখারী।
[২৬০]. হেদায়ার হাশিয়া : ৮৬।

ইমাম আযম রহ.:এর মতে যুবতী মহিলা মাসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া জায়েয নেই। তবে বুড়ি মহিলারা শুধু ফজর, মাগরিব ও ইশার সময় মাসজিদে যেতে পারবে। তবে তাদের জন্যও ঘরে নামায পড়া উত্তম।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.'র হাদীস। وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "তাদের ঘর তাদের জন্য উত্তম।"[২৬১]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا .

"মহিলা তার রুমে নামায পড়ার তুলনায় তার অন্দর মহলে নামায পড়া ভালো। এর চেয়ে তার কোঠায় নামায পড়া আরো ভালো।"[২৬২] হযরত আয়েশা রাযি. তার যুগ সম্পর্কে বলেন,

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ বিষয়গুলি দেখতেন, যা মহিলারা বের করেছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করতেন। যেমন : বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো"।[২৬৩]

এই সকল হাদীস থেকে জানা যায়, মহিলারা মাসজিদে যাওয়া ফিতনার কারণ হতে পারে, তাই জায়েয নেই।

[উপরোক্ত হাদীসগুলির বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা বুঝা যায়, মহিলারা মাসজিদে যেতে চাইলে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। ইমাম নভভী রহ. সে শর্তগুলি হাদীস থেকে সংগ্রহ করে একত্রে লিখে দিয়েছেন।

---

[২৬১]. সুনানে আবু দাউদ।

[২৬২]. সুনানে আবু দাউদ।

[২৬৩]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মাআরেফ সুনান : ৪/৪৪।

শর্তগুলি হলো, ১. মাসজিদে গমনকালে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। এমনকি পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির চিহ্ন থাকতে পারবে না। ২. সেজে-গুজে যেতে পারবে না। বরং জীর্ণ শীর্ণ কাপড় পরিধান করে যাবে। ৩. এমন গহনা পরিধান করে যেতে পারবে না যার আওয়াজ শোনা যায়। ৪. সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে যেতে পারবে না। ৫. যাওয়া আসার পথে বা মাসজিদে পুরুষের সাথে মিলতে পারবে না। ৬. যুবতী কিংবা এমন মহিলা যেতে পারবে না যাদের দ্বারা ফিৎনার আশংকা রয়েছে। ৭. গমনাগমনের পথে কোনো প্রকার ফেৎনাকারীর উপস্থিতি থাকতে পারবে না।[২৬৪] স্মর্তব্য, শর্তগুলি পাওয়া গেলে যাওয়া বৈধ হবে মাত্র। মাসজিদের ফযিলত পাবে না। বরং ঘরে নামায আদায়ে সাওয়াব বেশি। অনুবাদক]

صَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের ওপর জানাযার নামায পড়া

যদি মায়্যিতকে জানাযা পড়া ছাড়া দাফন করে দেওয়া হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সকল ইমামগণ একমত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মায়্যিতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত না হয়ে যাবে কবরের ওপর জানাযা পড়া যেতে পারে। আর যদি জানাযার নামায পড়ে মায়্যিতকে দাফন করা হয়, তাহলে কবরের ওপর দ্বিতীয় তৃতীয়বার নামায পড়ার বিষয়ে ইখতিলাফ আছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে কবরের ওপর দ্বিতীয় তৃতীয়বার জানাযা পড়া যেতে পারে।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي .

---

[২৬৪]. সহীহ মুসলিম : ১/১৮৩

"এক কালো মহিলা মাসজিদ ঝাড়ু দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখছিলেন না। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে মারা গেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে বললে না কেন।"[২৬৫] হাদীসে আছে, فصلى على قبرها "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের ওপর জানাযা পড়লেন।" হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى قبراً منتبذا فصف اصحابه فصلى عليه

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবর (যা সকল কবর থেকে দূরে ছিলো) দেখলেন। সাহাবায়ে কেরামকে কাতার বন্দী করে জানাযা পড়ালেন।"[২৬৬] হযরত ইবনে ওমর রাযি. আপন ভাই আসেম এবং হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকরের কবরের ওপর জানাযা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[২৬৭] যার দ্বারা প্রমাণ হয় কবরের ওপর জানাযা পড়া জায়েয।

জবাব : যেসব হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের ওপর জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ আছে তার জবাব হলো, এটা তার বৈশিষ্ট্য। কেননা তিনি জানাযা নামায পড়ার দ্বারা কবরে নূর হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

---

[২৬৫]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

[২৬৬]. জামে তিরমিযী।

[২৬৭]. আল জাওয়াহিরুন নকী : ৪/৪৮, সুনানে বায়হাকী : ৪/৪৯।

“এই কবরগুলি অন্ধকারে পূর্ণ। আমার জানাযা পড়ার দ্বারা আল্লাহ নূর দিয়ে ভরে দিবেন।”[২৬৮]

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল উম্মতের অভিভাবক। আর অভিভাবক দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারে। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আয়েশা রাযি.'র হাদীসের জবাব হলো এখানে সালাত থেকে জানাযার নামায উদ্দেশ্য নয়। বরং কল্যাণের দোআ উদ্দেশ্য। কিছু কিছু হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।”[২৬৯]

ইমাম আযম রহ. **ও মালেক** রহ.: এর মতে মায়্যিতকে জানাযা পড়ে দাফন করা হলে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়া জায়েয নেই।

দলীল : আমাদের সবচেয়ে বড় দলীল হলো, সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু কোথাও তারা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা পাওয়া যায় না। হযরত নাফে হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর আমল বর্ণনা করেন,

إنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليه ودعا وانصرف ولم يعد الصلاة

“তিনি কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করলে জানাযা পড়ে দোআ করে ফিরে আসতেন। আর দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তেন না।”[২৭০]

লক্ষ করুন, দ্বিতীয়বার জানাযাকে পরিস্কার নাকচ করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেটা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা পাওয়া যায় সেটা তার বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমনটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

---

[২৬৮]. সহীহ মুসলিম।

[২৬৯]. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : বযলুল মাজহুদ : ৪/২০৭, আওজাযুল মাসালেক : ৫/৪৪৯, আইনী : ৪/২৯।

[২৭০]. আল্-জাওয়াহিরুন নাকী : ৪/৪৮।

الْقِيَامُ لِلْجَنَازَةِ

মায়্যিত দেখে দাঁড়ানো

ইমাম আহমদ রহ. : এর মতে মায়্যিত দেখে দাঁড়ানো ওয়াজিব।

দলীল : হযরত আবু সাঈদে খুদরী রাযি. এর হাদীস,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে দাঁড়িয়ে যাও। যে তার পিছনে যাবে জানাযা মাটিতে রাখার আগে বসবে না।"[২৭১] এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে দাঁড়ানোর নির্দেশ উদ্ধৃত আছে। হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال إذا رأيتم الجنازة فقوموا

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال مر على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة فقام وقال قوموا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিবাহিত হলো, তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা দাঁড়াও।[২৭২]

এই হাদীস থেকেও জানা যায় যে, জানাযা দেখে দাঁড়ানো উচিত।

জবাব : জামহুরের পক্ষ থেকে এই সব হাদীসের এভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জানাযার জন্য দাঁড়ানোর কথা যে সকল হাদীসে আছে তা সবগুলি রহিত। হযরত আলী রাযি.র হাদীস নাসেখ। যা নীচে আসছে।

---

[২৭১]. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

[২৭২]. সুনানে ইবনে মাযা।

তিন ইমাম : তাঁদের মতে জানাযা দেখে দাঁড়ানো জায়েয় নেই। সাহেবাঈনের মাসলাকও এটাই।

দলীল : হযরত আলী রাযি. এর হাদীস,[২৭৩]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم فى الجنازة ثم جلس بعد

অন্য হাদীসে আছে,

كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام فى الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা সম্পর্কে প্রথমে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বসতে শুরু করেন এবং আমাদেরকেও বসার নির্দেশ দেন।[২৭৪] এই হাদীস থেকে পরিস্কার জানা যায়, জানাযার জন্য দাঁড়ানো শুরু যুগে ছিলো। পরে মানসুখ হয়ে গেছে। তাই এর ওপর আমল করা যাবে না।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

যাকাত অধ্যায়

زَكَاةُ الْإِبِلِ

উটের যাকাত

উটের যাকাত সম্পর্কে ১২০ পর্যন্ত যে ব্যাখ্যা আছে তাতে সকল ইমামগণ একমত। কারো কোনো ইখতিলাফ নেই। তবে ১২০ পর পর ইখতিলাফ আছে।

---

[২৭৩]. সহীহ মুসলিম।

[২৭৪]. সহীহ ইবনে হিববান।

ইমাম শাফেয়ী রহ.: এর মতে একশত বিশের পরে استيناف তথা নতুন হিসাব হয় না। বরং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হেক্কা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালেক রহ. ও **আহমদ** রহ.: এর মতেও একশত বিশের পর ইস্তিনাফ হয় না। বরং ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মাসলাকের মতো প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হেক্কা ওয়াজিব হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু, ইমাম শাফেয়ী রহ. এই হিসাব একশত একুশ থেকে জারি করেন। আর এরা একশত ত্রিশ থেকে জারি করেন।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

قَالَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبون.

উটের সংখ্যা যদি একশত বিশের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক পঞ্চাশে ১টি হেক্কা এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন দিতে হবে।[২৭৫]

এই হাদীস থেকে দলীল পেশ করে তিন ইমাম বলেন, একশত বিশের ওপর শুধু ৪০ ও ৫০এর হিসাব হবে। পাঁচ উটে একটি ছাগল ও পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখায বিশিষ্ট হিসাব চলবে না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে একশত বিশের পরে ইস্তিনাফ হবে। অর্থাৎ সেই হিসাব চলবে যা শুরুতে চলতো। প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং প্রত্যেক পঁচিশ উটে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে।

দলীল : হযরত আমর বিন হাযমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সহিফা লেখে দিয়েছিলেন। তাতে উটের যাকাত বিষয়ে এই নির্দেশ ছিলো যে,

---

২৭৫. জামে তিরমিযী।

أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فاذا كانت أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة فما فضل فانه يعاد إلى اول فريضة الإبل.

"উটের সংখ্যা যখন নব্বই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তাতে দুটি হেক্কা ওয়াজিব হবে একশত বিশ পর্যন্ত। এর চেয়ে যখন বেড়ে যাবে তখন প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি করে হেক্কা এবং যা বাকি থাকবে তা প্রথম হিসাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।"[২৭৬]

অর্থাৎ বাকি যা বাঁচবে তাতে ঐ হিসাব জারি হবে যা প্রথম ফরিযা (পাঁচ থেকে নিয়ে একশত বিশ পর্যন্ত) জারি হয়েছিল। আর প্রথম ফরিযায় পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং পঁচিশে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হতো। সুতরাং প্রমাণ হলো, একশত বিশের ওপরে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল এবং প্রত্যেক পঁচিশে একটি বিনতে মাখায ওয়াজিব হবে। তাছাড়া আমরা একশত বিশ থেকে উপরে যেই হিসাব জারি করেছি, তাতে তাদের হাদীস মতেও আমল হয়ে যায়। প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হেক্কা এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হয়। তাই তাদের হাদীসের জবাবেরও প্রয়োজন নেই।

ফায়েদা : এক থেকে বিশ পর্যন্ত প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। এরপর পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখায, এরপর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিন লাবুন, এরপর পঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত একটি হেক্কা ওয়াজিব হবে। এরপর ষাট থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জিযয়া ওয়াজিব হবে। এরপর আশি থেকে নব্বই পর্যন্ত দুটি বিনতে লাবুন ওয়াজিব হবে। এরপর নব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত দুটি হেক্কা ওয়াজিব হবে।

---

২৭৬. সুনানে নাসায়ী, মারাসিলে আবু দাউদ।

সংজ্ঞা

বিনতে মাখায : ঐ উষ্ট্রী যা এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করেছে।

বিনতে লাবুন : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে।

হেক্কা : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা পূর্ণ তিন বছর হয়ে চতুর্থ বছরে প্রবেশ করেছে।

জিযয়া : ঐ উষ্ট্রীকে বলে, যা পঞ্চম বছরে প্রবেশ করেছে।

حَقِيْقَةُ الرِّكَازِ

রেকাযের বাস্তবতা

রেকায বলে প্রত্যেক ঐ জিনিসকে যা জমিনে পুতে রাখা হয়েছে, অথবা দাফন করা হয়েছে। সুতরাং কাঞ্জ (দাফনকৃত খনিজ সম্পদ) সর্ব সম্মতিক্রমে এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মা'দিনের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে। মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই মা'দিনে কোনো যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দলীল : তারা এর স্বপক্ষে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ হাদীস পেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন[২৭৭], المعدن جبار এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, মা'দিনে যাকাত নেই।

জবাব : হাদীসের এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যে, "মা'দিনে যাকাত নেই" এটা হাদীসের অগ্র-পশ্চাতের বিপরীত। কেননা, এই বাক্যের আগে পরে দিয়াতের বিধানের বিবরণ দিয়েছেন। তাহলে এর থেকে এই উদ্দেশ্য

---

২৭৭. জামে তিরমিযী।

কিভাবে হতে পারে যে, মা'দিনে যাকাত নেই। বরং এর উদ্দেশ্য সেটাই হবে যা অগ্র-পশ্চাতের সাথে মিলে। আর তা হলো, কেউ যদি খনিতে পড়ে মারা যায় তাহলে এটা বৃথা যাবে। অর্থাৎ কারো ওপর এর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসের সেই উদ্দেশ্যই যদি নেওয়া হয় যা তারা নিয়েছে, "মা'দিনে যাকাত নেই" তাহলে তারা স্বর্ণ ও রূপার মা'দিনে যাকাতের কথা কেন বলেন। বুঝা গেল, তাদেরও এই হাদীসের ব্যাপকতার ওপর আমল নেই।

ইমাম আযম রহ. ও **আহমদ** রহ. বলেন, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। আর রেকাযের মতো মা'দিনেও যাকাত আছে।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রেকাযে খুমুস আছে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ রেকায কী জিনিস? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টির সময় যেই স্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন।[২৭৮] এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেকাযের ব্যাখ্যা করেছেন মা'দিন দ্বারা। যা একথার স্পষ্ট দলীল যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর রাযি.কে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করার সময় তাকে যেই সহিফা লিখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাতে লেখা ছিলো[২৭৯] وفى السيوب الخمس

السيوب এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জাযারী রহ. বলেন,[২৮০]

---

২৭৮. উমদাতুল কারী : ৯/১০৩।

২৭৯. মানালুত তালেব : ৭২।

২৮০. প্রাগুক্ত।

السيوب الركاز وهو المال المدون فى الجاهلية أو المعدن

দেখুন রেকাযের এই ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায় যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক জায়গায় বলেন[২৮১], المعدن والركاز واحد । লোগাতও আমাদের কথাকে দৃঢ় করে। সুতরাং লিসানুল আরবে আছে, রেকায শব্দটি মা'দিনের ওপরই প্রয়োগ হয়।[২৮২]। এই সকল দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা'দিন রেকাযের অন্তর্ভুক্ত। আর রেকাযের মতো তাতেও খুমুস ওয়াজিব।

اَلْجَمْعُ وَالتَّفْرِيْقُ

একত্রিতকরণ ও বিভাজন

ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

তিন ইমাম : তারা বলেন, মাল দু'জনের মাঝে যদি অংশীদারপূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর নয়। বরং সমষ্টির ওপর ওয়াজিব। যেমন, আশিটি ছাগল দুইজনের মাঝে যৌথ। তখন যাকাত আশি ছাগলের ওপর ওয়াজিব হবে। আর একথা মনে করা হবে যে, আশিটি ছাগল একই ব্যক্তির মালিকানা। যেহেতু আশিটি ছাগলে নেসাব পরিবর্তন হয় না, বরং একটি ছাগল ওয়াজিব থাকে। যা চল্লিশ ছাগলে ওয়াজিব হয়, তাই যাকাত হিসেবে একটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি উভয় অংশকে আলাদা আলাদা হিসাব করা হতো। তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি ছাগল হতো। এই ছুরতে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি করে ছাগল ওয়াজিব হওয়া উচিত। কিন্তু দুইজন যৌথ হওয়ার কারণে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ভিন্ন ছাগল উসুল না করে সমষ্টি

---

[২৮১]. আইনী : ৯/১০০।

[২৮২]. লিসানুল আরব : ৭/২২৩, মা'আরেফুস সুনান : ৫/২৪৫।

থেকে একটি ছাগল উসুল করা হবে। এরই দ্বারা দুজনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

এরপর তিন ইমামের মতে এই ইশতিরাকেরও দুটি দিক। একটি হলো, দুইজন মালিকানা হিসেবে মালে শরিক হওয়া। এটাকে خلطة الشيوع তথা মালিকানা শিরকত বলে। দ্বিতীয় দিক হলো, দুইজন মালিকানায় শরিক নয়। বরং দুজনের আস্তাবল এক এবং কমপক্ষে চারটি জিনিসে শরিক। রাখাল, চারণ ভূমি, দুধ দহনকারী ও বলদ। এটাকে خلطة الجوار বলে। তিন ইমামের মতে খুলতাতুল জাওয়ারেরও ধর্তব্য আছে। যেমন খুলতাতুশ শুয়ূ'র ধর্তব্য আছে। সুতরাং খুলতাতুল জাওয়ারেরও যাকাত দুই ব্যক্তির সমষ্টিগত মালের ওপর ওয়াজিব হবে। এরপর স্মরণ রাখতে হবে, সমষ্টির ওপর যাকাত ওয়াজিব হলে এককভাবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার তুলনায় কখনো কম আসে, কখনো বেশি আসে। এবার তিন ইমাম বলেন, হাদীসের উল্লিখিত বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে দুই মানুষ মালের মাঝে খুলতাতুশ শুয়ূ' বা খুলতাতুল জাওয়ার সৃষ্টি করে একত্রিত করবে না। আবার আলাদাও করবে না। যেই অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকতে দিবে। যেমন, দুইজন মানুষের যদি আশিটি ছাগল থাকে, তাহলে পৃথক থাকলে দুটি ছাগল ওয়াজিব হবে। একজনের চল্লিশটির ওপর একটি, অপরজনের চল্লিশটির ওপর আরেকটি। আর যৌথ থাকা অবস্থায় আশিটির সমষ্টির ওপর শুধু একটি ওয়াজিব হবে।

তাহলে এবার এমন দুইজন মানুষ যাদের মাঝে খুলতাতুশ শুয়ূ' বা খুলতাতুল জাওয়ার কিছুই নেই, যাকাত কমানোর জন্য পরস্পরে শিরকত সৃষ্টি করা নাজায়েয। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يجمع بين متفرق "ভিন্ন ভিন্ন মাল একত্রিত করা হবে না"

(অর্থাৎ কোনো শিরকত সৃষ্টি করা হবে না)। এভাবে দুই জন মানুষের মাঝে যদি দুইশত ছাগল যৌথ হয়। তাহলে তিনটি ছাগল ওয়াজিব হয়। আর যদি তারা শিরকতকে তুলে নিয়ে অর্ধেক অর্ধেক বন্টন করে নেয়, তাহলে প্রত্যেকের কাছে একশত ছাগল থাকবে। তখন প্রত্যেক মানুষের ওপর শুধু একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। সুতরাং যাকাত কম ওয়াজিব করার জন্য যদি শিরকত তুলে নেয় তাহলে এটা নাজায়েয হবে।

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا يفرق بين مجتمع একত্রিত মালকে পৃথক করা যাবে না। (অর্থাৎ শিরকত তুলে নেওয়া যাবে না)।

আহনাফের মতে খুলতাতুশ শুয়ূ'রও কোনো গুরুত্ব নেই, খুলতাতুল জাওয়ারেরও কোনো গুরুত্ব নেই। বরং সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নিজস্ব অংশে যাকাত ওয়াজিব হবে। সমষ্টির ওপর নয়। সুতরাং আশিটি ছাগল যদি দুই ব্যক্তির মাঝে অর্ধেক অর্ধেক হিসেবে যৌথ হয়, (মালিকানা হিসেবে হোক কিংবা জার হিসেবে) আমাদের মতে যৌথ হওয়ার কারণে যেহেতু কোনো পার্থক্য হয় না, তাই প্রত্যেকের ওপর আলাদা আলাদা যাকাত ওয়াজিব হবে।

এমন নয় যে, যৌথ হওয়ার কারণে সমষ্টি থেকে যাকাত উসুল করা হবে এবং আশিটি থেকে একটি ছাগল নেওয়া হবে। বরং প্রত্যেকের চল্লিশটি থেকে আলাদা আলাদা একটি করে ছাগল নেওয়া হবে। হাদীসের মধ্যে ভিন্ন কোনো মাসআলা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এই কথারই নাকচ করা হয়েছে যে, শিরকত যাকাতের কম-বেশির মাঝে কোনো প্রভাব ফেলে না।

তাই তোমরা যদি যাকাত কমানোর জন্য শিরকত সৃষ্টি করতে চাও, অথবা যাকাত বেশি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য শিরকত তুলে নাও, তাহলে এই সকল তৎপরতা নিষ্ফল। কেননা, যাকাত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অংশের

ওপর ওয়াজিব হবে। তাই বলেন, لا يجمع بين متفرق পৃথক মালকে একত্রিত করা যাবে না।

ولا يفرق بين مجتمع একত্রিত মালকে পৃথক করো না। বরং উভয়টিকে নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।[২৮৩]

العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ

জীব-জন্তুর ক্ষতি বৃথা

কোনো ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে কোনো জন্তু যদি আঘাত করে, এর দিয়াত ওয়াজিব হবে কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে, জন্তু দিনে কাউকে ক্ষতি করলে দিয়াত ওয়াজিব হবে না। আর রাতে ক্ষতি করলে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

দলীল : ইমাম শাফেয়ী রহ. দিন-রাতে এই পার্থক্য একটি মারফু' হাদীস থেকে সংগ্রহ করেছেন।

عن البراء بن عازب قال كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائطا فافسدت فيه فكلم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها.

"হযরত বারা বিন আযেব রাযি.এর উষ্ট্রী কারো বাগানে ঢুকে কিছু ক্ষতি করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি সমাধান দিলেন যে, দিনে বাগান হেফাযত করার দায়িত্ব বাগানের মালিকের।[২৮৪] আর জীব-জন্তু রাতে হেফাযত করার দায়িত্ব জীব-জন্তুর মালিকের। এই হাদীসে রাসূল

---

২৮৩. তাকরীরে ওসমানী থেকে সংগৃহীত।

২৮৪. সুনানে আবু দাউদ : ২/৪০২, ৪০৩, সুনানে ইবনে মাজা : ১৬৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে জীব-জন্তু দেখা শোনার দায়িত্ব তার মালিকদেরকে দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, জীব রাতে কোনো ক্ষতি করলে এর দায়ভার মালিকের ঘাড়ে। দিনে ক্ষতি করলে এর দায়ভার মালিকের ওপর নয়।

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী রহ. العجماء جرحها جبار (জীবের ক্ষতি বৃথা) এই হাদীসকে দিনের সাথে খাস করেন। যে, দিনে জীব কোনো ক্ষতি করলে তা মাফ, রাতে নয়।

জবাব : হযরত বারা বিন আযেব থেকে হারাস বিন মুহাইয়াসা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মাজহুল রাবী। তাছাড়া হযরত বারা থেকে তার শ্রবণও প্রমাণিত নয়। আর অন্য হাদীস ব্যাপক। তাই দলীল ছাড়া খাস করা যায় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে জীবের সাথে চালক না থাকলে জরিমানা আসবে না। আর চালক থাকলে এবং অবহেলা করলে জরিমানা আসবে।

দলীল : جرحها جبار হাদীসের ব্যাপকতা হানাফীদের কথা দৃঢ় করে। কেননা, তাতে রাত দিনের কোনো ব্যবধান নেই। ব্যাপক রাখা হয়েছে যে, জীবের ক্ষতির কোনো জরিমানা নেই। সুতরাং এই ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে আমরা রাত দিনে একই বিধান রেখেছি। তবে মালিক যদি সাথে থাকে এবং ক্ষতির মধ্যে তার অবহেলার দখল থাকে তাহলে তার ওপর জরিমানা আসবে।

ফায়েদা : এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশ المعدن جبار এবং وفى الركاز الخمس। এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর البئر جبار এই অংশে কোনো ইখতিলাফ নেই। এর সারাংশ শুধু এতটুকু যে, কেউ যদি নিজস্ব জমিনে কিংবা মালিকের অনুমতি নিয়ে অন্যের জমিনে কূপ খনন করে

এবং তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে খননকারীর ওপর কোনো জরিমানা আসবে না।

الزَّكَاةُ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ

ইয়াতিমের মালে যাকাত

তিন ইমাম : তাদের মতে ইয়াতিমের মালে যাকাত ওয়াজিব।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الا من ولى يتيما له مال فليتجرفيه ولا يتركه حتى ياكله الصدقة .

"শোনো, যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতিমের দায়িত্বশীল হবে, ইয়াতিমের মাল থাকলে তার জন্য তাতে ব্যবসা করা উচিত। তা এমনি ফেলে রাখবে না, যে তা সদকা শেষ করে দিবে।"[২৮৫]

এই হাদীসে দায়িত্বশীলকে ইয়াতিমের মালে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ব্যবসার দ্বারা লাভ আসবে। মাল বাড়তে থাকবে। কেননা, তারা যদি মাল এমনি ফেলে রাখে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হতে থাকবে এবং মাল কমতে থাকবে। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইয়াতিমের মালে যাকাত ওয়াজিব হয়।

জবাব : এই হাদীসের সনদে মুসান্না বিন সব্বাহ নামক একজন রাবী আছে যিনি দুর্বল। তাই এই হাদীস দলীলযোগ্য নয়। দ্বিতীয় জবাব হলো, এখানে সদকা থেকে খরচ উদ্দেশ্য। যাকাত উদ্দেশ্য নয়। তাই এর দ্বারা যাকাত প্রমাণ করা যায় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে ইয়াতিমের মালে যাকাত নেই।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

---

[২৮৫]. জামে তিরমিযী।

قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর মানুষ থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। বাচ্চা থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পাগল থেকে বিবেক ফিরে আসা পর্যন্ত।"[২৮৬] এই হাদীসে বলা হয়েছে, বাচ্চা বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত শরীয়াতের বিধানের মুকাল্লাফ হবে না। যাকাতও শরীআতের একটি বিধান। তাই ইয়াতিম বাচ্চা যাকাতেরও মুকাল্লাফ হবে না।

الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ

অর্জিত সম্পদ

কারো কাছে যদি নেসাব পরিমাণ মাল থাকে, কিন্তু তার ওপর এখনো বছর অতিবাহিত হয়নি। মধ্যখানে আরো কিছু মাল অর্জন হলো। চাই সেটা অন্য মাল হোক। এটাকে মালে মুস্তাফাদ বা অর্জিত মাল বলে। এক্ষেত্রে ইখতিলাফ হলো, এর ওপর ভিন্ন বছর গণনা করা হবে, নাকি পূর্বের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলা হবে? এর তিনটি ছুরত।

প্রথম ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে নয়। (বরং ভিন্ন প্রকারের) সর্বসম্মতক্রমে এর হুকুম হলো, মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মাল থেকে ভিন্ন রাখা হবে। পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। আর উভয়টির ওপর পৃথক পৃথক বছর গণনা করা হবে। দ্বিতীয় ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে এবং পূর্বের মালের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। (যেমন- ছাগল ছিলো, বছরের মাঝে তা থেকে বাচ্চা হয়েছে। অথবা ব্যবসার মাল ছিলো, তাতে লাভ হয়েছে।)

---

২৮৬. সুনানে আবু দাউদ।

এই ছুরতে সর্বসম্মতক্রমে দুটিকে মিলানো হবে এবং পূর্বের মালের সাথে মালে মুস্তাফাদের যাকাত আদায় করা হবে। তৃতীয় ছুরত হলো, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে। কিন্তু পূর্বের মালের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। বরং অন্য কোনো উপায়ে অর্জন হয়েছে। (যেমন : কেউ দান করেছে, কিংবা মীরাস সূত্রে পেয়েছে) এই ছুরতে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমাম বলেন, এই ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। বরং দুটিকে আলাদা আলাদা বছর গণনা করা হবে।
দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

কোনো মানুষ যদি মালে মুস্তাফাদ অর্জন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে বছর পূর্ণ হবে না, যাকাত আসবে না।[২৮৭] এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে না। বরং আলাদা রাখা হবে। আর যখন তার বছর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তার যাকাত আদায় করা হবে। পূর্বের মালের সাথে তার যাকাত আদায় করা হবে না।

জবাব : উল্লিখিত হাদীসটি দুই সনদে বর্ণিত। যার মধ্য থেকে একটি সনদ আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম রাবীর কারণে দুর্বল। দ্বিতীয় সনদটি সহীহ। কিন্তু এই ছুরতে জবাব হলো, এই হাদীসটি প্রথম ছুরত সংক্রান্ত। অর্থাৎ মালে মুস্তাফাদ যদি পূর্বের মালের প্রকার থেকে না হয়। তখন এই হুকুম যে, মালে মুস্তাফাদের ওপর ভিন্নভাবে বছর গণনা করা হবে। তৃতীয় ছুরতের সম্পর্কিত নয়।

ইমাম আযম রহ. বলেন, এই ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হবে।

---

[২৮৭]. জামে তিরমিযী।

দলীল : যেই ইল্লতের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ছুরতে মালে মুস্তাফাদকে পূর্বের মালের সাথে মিলানো হয়েছে, সেটা এখানেও পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মালে মুস্তাফাদ পূর্বের মালের প্রকার থেকে। তাই উভয় ছুরতে একই হুকুম হবে। দ্বিতীয়ত, শরীয়াতে কষ্ট দূর করে সহজতা সৃষ্টি করার জন্য বিধানের মধ্যে হালকা করা হয়। না হলে মারাত্মক কষ্ট দেখা দিবে। কেননা না মিলালে প্রতিদিন আসা মাল আলাদা রাখতে হবে। আর প্রত্যেকটির ওপর আলাদা আলাদা বছর গণনা করতে হবে। এতে অনেক বড় অসুবিধা। আর তারা যেই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তার ব্যাপকতার ওপর তাদের নিজেদেরও আমল নেই। সুতরাং যেভাবে তারা দ্বিতীয় ছুরতকে উল্লিখিত হাদীসের বিধান থেকে বিয়োগ করেছেন, তেমনি হানাফীরা কষ্ট দূর করার জন্য তৃতীয় ছুরতকে বিয়োগ করেছেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

حُكْمُ الخَرْصِ

জরিপ করার বিধান

خرص শব্দের আভিধানিক অর্থ জরিপ করা। পরিভাষায় খরস বলে, ক্ষেত-ফসল পাকার আগে হাকেম একজন মানুষ পাঠিয়ে ফসল জরিপ করে নিয়ে আসবে। এই বছর কার ক্ষেতে কতটুকু ফসল হচ্ছে। এখন ইখতিলাফ হলো, এই জরিপ জায়েয আছে কি না?

তিন ইমামের মতে জরিপ জায়েয আছে।

দলীল : পবিত্র হাদীস,[২৮৮] إذا خرصتم فخذوا

অন্য এক হাদীসে আছে[২৮৯],

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ

---

[২৮৮]. জামে তিরমিযী।

[২৮৯]. সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী।

এই হাদীসে সরাসরি জরিপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জরিপ জায়েয আছে।

জবাব : এই বিধানটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের সাথে খাস ছিলো। পরে মানসুখ হয়ে গেছে। শায়েখ ইবনুল আরাবী বলেন, ইহুদীরা যেহেতু খেয়ানত করতো, তাই তাদের সাথে জরিপের নিয়ম পালন করা হতো। মুসলমানের সাথে করা হতো না। তৃতীয়ত, এই বিধান সুদ হারাম হওয়ার পূর্বের। সুদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এটা মানসুখ হয়ে যায়।

ইমাম আযম রহ.এর মতে জরিপ জায়েয নেই।

দলীল : হযরত জাবের রাযি.এর মারফু' হাদীস,

نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الخرص وقال أرأيتم إن هلك التمر أيحب أن ياكل مال أخيه بالباطل.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জরিপ করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, তুমি এ সম্পর্কে কী বলো যে, যদি খেজুর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কেউ কি পছন্দ করবে যে, আপন ভাইয়ের মাল বাতিল পদ্ধতিতে ভক্ষণ করবে?"[২৯০]

এই হাদীস থেকেও জরিপ নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হয়। তাছাড়া জরিপ তো একটি আনুমানিক বিষয়। যাতে ভুলেরও সম্ভাবনা আছে। তাই কোনো আনুমানিক বিষয়ের ওপর কোনো জিনিসের হুকুম লাগানো কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে?

---

[২৯০]. তাহাবী।

نِيَّةُ الصَّوْمِ

রোযার নিয়ত

রোযার নিয়ত কি রাতে করা জরুরী?

ইমাম মালেক রহ.এর মতে রোযার নিয়ত রাতে করা জরুরী। ফরয হোক কিংবা নফল।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে ফরয রোযার নিয়ত রাতে করা জরুরী, নফলের নয়।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

"ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি রোযার নিয়ত না করবে তার রোযা হবে না।"[২৯১] এই হাদীসে সুবহে সাদেকের পূর্বে নিয়ত করাকে জরুরী বলা হয়েছে।

জবাব : এই হাদীস মারফু' কিংবা মাওকুফ হওয়ার ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। দ্বিতীয়ত, এখানে নাকচ থেকে কামালের নাকচ উদ্দেশ্য। এজন্যও এখানে রাত থেকে নিয়ত করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে নির্দিষ্ট রোযার নিয়ত সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত করতে পারে। রাতে করা জরুরী নয়।

দলীল : হাদীসে পাকে আছে,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر رجلا ان أذن فى الناس إذ فرض صوم عاشوراء الا من اكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم!

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, আশুরার রোযা ফরয করা

---

২৯১. জামে তিরমিযী।

হয়েছে। শোনো, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে থেমে যাও। আর যে কিছু খায়নি সে যেন রোযা রাখে।[২৯২] দেখুন, এই হাদীসে দিনে রোযার ঘোষণা করা হয়েছে।

যারা এই ঘোষণার পর রোযা রেখেছে তারা নিয়তও অবশ্য দিনে করেছেন। বুঝা গেলো, সূর্য ঢলার পূর্বে দিনে নিয়ত করা যায়, রাতে নিয়ত করা জরুরী নয়। তবে অনির্দিষ্ট রোযা যেমন, রমযানের কাযা বা সাধারণ মান্নত ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদেরও মাসলাক হলো রাতে নিয়ত করতে হবে।

الصَّوْمُ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে মৃত ব্যক্তির ওপর যদি রোযা কাযা ওয়াজিব থাকে, তাহলে অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবে।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার ওপর রোযা ওয়াজিব ছিলো, তাহলে তার পক্ষ থেকে অভিভাবক রোযা রাখবে।[২৯৩] অন্য হাদীসে আছে,

إن امرأة قالت إن أمى ماتت وعليها صيام افأصوم عنها قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صومى عنها.

---

[২৯২]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

[২৯৩]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

"এক মহিলা বললো, আমার মা মারা গেছে এবং তার ওপর রোযা ওয়াজিব ছিলো, তাহলে আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোযা রাখো। এই হাদীস থেকেও বুঝা যায়, মায়্যিতের পক্ষ থেকে অভিভাবক রোযা রাখা জায়েয।

জবাব : প্রথম হাদীসের সনদে ওবায়দুল্লাহ বিন আবি জা'ফর নামক রাবী আছে তিনি মুনকারুল হাদীস। তাছাড়া হযরত আয়েশা রাযি.এর ফতোয়া এই হাদীসের বিপরীত। তাই এই হাদীস দলিলের যোগ্য নয়। দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এখানে রোযা থেকে রোযার স্থলাভিষিক্ত মিসকীনকে খাওয়ানো উদ্দেশ্য। অথবা রোযাই উদ্দেশ্য। কিন্তু নায়েব হিসেবে নয়; বরং ইসালে সাওয়াব বা নফলের নিয়তে।

ইমাম আযম রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে মায়্যিতের পক্ষ থেকে অভিভাবকের রোযা রাখার অনুমতি নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ.এর নতুন উক্তিও এমনি।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.এর হাদীস,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا يصوم أحد ولكن يطعم عنه .

"কোনো মানুষ অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না; বরং তার পক্ষ থেকে খানা খাওয়াবে।[২৯৪] এই হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে,[২৯৫]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا .

---

[২৯৪]. সুনানে নাসায়ী।

[২৯৫]. তফসীরে কুরতুবী।

"লক্ষ করুন, এই হাদীসে মায়্যিতের পক্ষ থেকে রোযা রাখার পরিবর্তে মিসকীনকে খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা বুঝা যায়, মায়্যিতের পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে না। হযরত আয়েশা রাযি.এর ফতোয়াও এই হাদীসের সমর্থন করছে। তিনি বলেন,

لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم

"তোমাদের মায়্যিতদের পক্ষ থেকে রোযা রেখো না, বরং তাদের পক্ষ থেকে খানা খাওয়াও।[২৯৬]

كِتَابُ الْحَجِّ

হজ্ব অধ্যায়

أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟

কোন হজ্ব উত্তম?

হজ্ব তিন প্রকার। যথা: ইফরাদ, তামাত্তু', কেরান।

ইফরাদ: হজ্বে ইফরাদ বলে, মানুষ মীকাত থেকে শুধু একটি জিনিসের ইহরাম বাঁধবে। হজ্ব কিংবা ওমরা।

তামাত্তু': হজ্বে তামাত্তু' বলে, মানুষ হজ্বের মাসে প্রথমে ওমরার ইহরাম বাঁধবে। এরপর ওমরা শেষ করে সে বছর হজ্বের ইহরাম বাঁধবে।

কেরান: হজ্বে কেরানের দুই পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি হলো, মানুষ মীকাত থেকে হজ্ব ও ওমরার দুটিরই ইহরাম বাঁধবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, প্রথমে ওমরার ইহরাম বাঁধবে। এরপর ওমরা শেষ করার পূর্বে ঐ ইহরামে হজ্বের নিয়ত করবে। এখন ইখতিলাফ হলো, এই তিনটির মধ্যে কোন হজ্ব উত্তম।

---

[২৯৬]. সুনানে বায়হাকী।

ইমাম আহমদ রহ. এর মতে হজ্বে তামাত্তু' উত্তম।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

تمتع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج.

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বে তামাত্তু' করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজ্বে তামাত্তু' করেছেন, তাহলে হজ্বে তামাত্তু' উত্তম হবে।

জবাব : তামাত্তু' শব্দটি ব্যাপক। কেরানও যার অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে তামাত্তু' দ্বারা কেরানই উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, হযরত ইবনে ওমর রাযি. এই হাদীসকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তার থেকে কেরানের হাদীস বর্ণিত আছে। তৃতীয়ত, তামাত্তু' থেকে শাব্দিক তামাত্তু' উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরার সাথে হজ্বকে মিলিয়ে উভয়টি এক সফরে আদায় করে উপকৃত হয়েছেন। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা সফর করতে হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.এর নিকট হজ্বে ইফরাদ উত্তম।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস,[২৯৭]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل بالحج مفردا

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত,[২৯৮]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل الحج وحده

এই হাদীসগুলি থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বে ইফরাদ করেছেন। তাই হজ্বে ইফরাদ উত্তম।

---

[২৯৭]. সহীহ মুসলিম।

[২৯৮]. সহীহ মুসলিম।

জবাব : এই হাদীসগুলির উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু হজ্ব করেছেন, তার সাথে ওমরা করেননি। যেটাকে হজ্বে ইফরাদ বলে। বরং উদ্দেশ্য হলো, হজ্বের কার্যক্রমগুলি আলাদা আদায় করেছেন। অথবা হজ্বের জন্য স্বতন্ত্র ইহরাম বেঁধেছেন। কিন্তু মূলে কারেন ছিলো। তৃতীয় জবাব, কারেনের জন্য যেহেতু তিন রকমের তালবিয়া (দু'আ অর্থাৎ لبيك اللّٰهُمَّ لبيك) বলার অনুমতি আছে। তার মধ্যে একটি তালবিয়া لبيك بحجة আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেউ কেউ এই তালবিয়া শুনে মনে করেছেন যে, তিনি হজ্বে ইফরাদ করেছেন। কেননা, এই তালবিয়াতে শুধু হজ্বের কথা আছে। ওমরার কথা নেই। অথচ কারেনও ঐ তালবিয়া পড়তে পারে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তালবিয়া পাঠ করেছেন, তারপরও তিনি কারেনেই থেকেছেন।

ইমাম আযম রহ. এর মতে হজ্বে কেরান উত্তম।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ .

"হযরত ওমর রাযি. বলেন, আমি অদী আকীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আসে। সে বলে, এই পবিত্র স্থানে দুই রাকাত নামায আদায় করুন এবং হজ্বের সাথে ওমরাও করুন।[২৯৯] লক্ষ করুন, এই হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হজ্বে কেরান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[২৯৯]. সহীহ বুখারী।

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্বে কেরানই করেছেন। তিনি যখন হজ্বে কেরানই করেছেন, তাহলে এটাই উত্তম হবে। সুতরাং প্রমাণ হলো, হজ্বে কেরান উত্তম।

التَّرْتِيْبُ فِيْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

হজ্বের বিধানাবলিতে তারতীব

ইয়াওমুন নাহার তথা যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখ কারেন ও মুতামাত্তে'র জন্য সর্বসম্মতক্রমে চারটি কাজ। প্রথমে রমি, এরপর যবাহ, এরপর হলক, এরপর তওয়াফে যেয়ারত। এই কাজগুলি তারতীব অনুযায়ী হওয়া কাম্য হওয়ার ক্ষেত্রে সকলে একমত। তবে তারতীব সুন্নাত ও ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে যে, তারতীব সুন্নাত নাকি ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে এই কাজগুলির তারতীব সুন্নাত। তাই এই কাজগুলি আগে পরে হওয়ার ক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হবে না।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسئلونه فجائه رجل وقال لم اشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء رجل وقال لم اشعر فنحرت قبل أن أذبح فقال ارم ولا حرج فما سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شيئ قدم ولا أخر الإ قال افعل ولا حرج.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় মেনাতে মানুষের কাছে দাঁড়ালেন। যাতে মানুষ তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারে। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি না জেনে যবাহ করার পূর্বে

হলক করেছি। তিনি বললেন, যবাহ করো, অসুবিধা নেই। আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি না জেনে রমি করার পূর্বে যবাহ করেছি। তিনি বলেন, রমি করো, অসুবিধা নেই। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কোনো বিষয় আগে পরে হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, করো অসুবিধা নেই।[৩০০]

এই হাদীস থেকে জানা যায়, তারতীব সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। কেননা, তারতীব ওয়াজিব হলে, ছুটে যাওয়ার পর অসুবিধা নেই বলতেন না।

জবাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لا حرج বলে গুনাহের নাকচ করেছেন। অর্থাৎ ভুলে কোনো কাজ আগে পরে হয়ে গেলে এতে গুনাহ নেই। দম ওয়াজিব হওয়ার নাকচ করেননি। তাই দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম আযম রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে তারতীব ওয়াজিব। তাই এটা ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে।

দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال من قدم شيئا من حجة أو اخر فليهرق لذالك دمًا .

"যে ব্যক্তি হজ্বের কার্যক্রম থেকে কোনো একটি আগে বা পরে করবে, সে এর জন্য দম দিবে।"[৩০১]

এমনি শব্দ হযরত সাঈদ বিন জোবায়ের, হযরত জাবের, হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে। যার থেকে পরিস্কার জানা যায়, দশ তারিখের চার কাজের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব।

---

৩০০. মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, তাহাবী।

৩০১. মেশকাত শরীফ।

طَوَافُ الْقَارِنِ

কারেনের তাওয়াফ

এমন ব্যক্তি যে হজ্বের সাথে ওমরারও ইহরাম বেঁধেছে তাকে কারেন বলে। এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে যে, সে হজ্ব ও ওমরার জন্য দুটি তওয়াফ করবে, নাকি একটি তওয়াফ করবে?

তিন ইমামের মতে কারেনের দায়িত্বে তিনটি তওয়াফ। তওয়াফে কুদুম, তওয়াফে বিদা' ও তওয়াফে যিয়ারত। এই তৃতীয় তওয়াফে ওমরার তওয়াফও অন্তর্ভুক্ত। ওমরার জন্য আলাদা তওয়াফ করা হবে না।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা হজ্ব ও ওমরা দুটিকে একত্রিত করবে, তারা শুধু একটি তওয়াফ করবে।"[৩০২]

হযরত জাবের, হযরত ইবনে ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়ার মাঝে হজ্ব ও ওমরার জন্য শুধু একটি তওয়াফ করেছেন।"[৩০৩]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف طوافًا واحدًا في حجته وعمرته

---

[৩০২]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

[৩০৩]. সহীহ মুসলিম।

এই সকল হাদীস থেকে জানা যায়, কারেন হজ্ব ও ওমরার জন্য শুধু একটি তওয়াফ করবে। দুটির জন্য আলাদা আলাদা তওয়াফ করবে না। কেমন যেনো, তওয়াফে যেয়ারতের মাঝে তওয়াফে ওমরা ঢুকে গেছে।

জবাব : যে সকল হাদীসে হজ্ব ও ওমরার জন্য একটি তওয়াফ উল্লেখ আছে, সেগুলির জবাব হলো, ওমরার সাথে দ্বিতীয় যেই তওয়াফটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেটা তওয়াফে কুদুম। যা সুন্নাত। তওয়াফে যেয়ারত নয়। কেননা তওয়াফে যেয়ারত ফরজ। যেটা স্বতন্ত্রভাবে করতে হয়। তাই তার সাথে ওমরার তওয়াফ অন্তর্ভুক্ত করে একটি তওয়াফ যথেষ্ট বলা সঠিক নয়।

ইমাম আযম রহ.এর মতে কারেনের দায়িত্বে চারটি তওয়াফ। কেননা, তার মতে ওমরা ও হজ্বের জন্য আলাদা আলাদা তওয়াফ করতে হবে। সেগুলি হলো, তওয়াফে কুদুম, তওয়াফে বিদা, তওয়াফে যিয়ারত, তওয়াফে ওমরা।

দলীল : হাদীসে আছে,

أن ابن عمر انه جمع بين الحج والعمرة وطاف لها طوافين وسعى لها سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع كما صنعت

"ইবনে ওমর রাযি. হজ্ব ও ওমরা এক সাথে করলেন। দুটির জন্য দুটি তওয়াফ ও দুটি সায়ী করলেন। আর তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনিও এমনি করেছিলেন, যেমন আমি করেছি।"[৩০৪]

عن علي انه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع .

"হযরত আলী রাযি. হজ্ব ও ওমরার জন্য দুটি তওয়াফ ও দুটি সায়ী করলেন। আর বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনি করতে

---

[৩০৪]. সুনানে দারা কুতনী : ২/২৫৮

দেখেছি।" এই সকল হাদীস ও আসার থেকে জানা যায়, হজ্ব ও ওমরা দুটির জন্য আলাদা আলাদা তওয়াফ করতে হবে। একটি তওয়াফ যথেষ্ট হবে না।
নোট : তওয়াফের ক্ষেত্রে সায়ীর মতো ইখতিলাফ রয়েছে।

الفَخِذُ عَوْرَةٌ

রান সতর

রান সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

দাউদ যাহেরী : তার মাযহাব হলো, রান সতর নয়। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এমনি একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস, যেটা ইমাম বুখারী রহ. উদ্ধৃত করেছেন। তাতে খায়বার যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অংশগ্রহণ করার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ثم حسر الازار عن فخذه حتى أنى انظر إلى بياض فخذ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রান থেকে কাপড় সরে যায়। এমনকি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রানের সাদা দেখছিলাম।" এই হাদীসে দ্বারা যাহেরিয়াগণ রান সতর না হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করে।

জবাব : যুদ্ধে অনেক বেশি ভিড় হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকে। যেমন, কাউকে দৌড়ে গিয়ে আঘাত করা, দ্রুত ঘোড়ায় আরোহণ করা ইত্যাদি। এমন কোনো অবস্থাতে অসতর্কতামূলক রান ইত্যাদি থেকে কাপড় সরে যায় এর থেকে এটা কিভাবে প্রমাণ হতে পারে যে, তা পর্দার জায়গা নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর রান থেকে অবশ্য অসতর্কতামূলক সামান্য কাপড় সরে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাকৃত (নাউযুবিল্লাহ) এমন করেননি। তাই তার এই ঘটনা দিয়ে রান সতর না হওয়া প্রমাণ করা শুদ্ধ নয়।

চার ইমাম : এর মতে রান সতর।

দলীল : হযরত জারহাদ রাযি. এর হাদীস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,[৩০৫]

أما علمت أن الفخذ عورة

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত।[৩০৬]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يا على لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت.

লক্ষ করুন, প্রথম হাদীসে পরিস্কারভাবে রান সতর হওয়া বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে হযরত আলী রাযি.কে রান না খোলা এবং জীবিত ও মৃতের রান না দেখার নসীহত করা হয়েছে। এই হাদীসগুলি থেকে পরিস্কার জানা যায়, রান সতরের অন্তর্ভুক্ত। শরয়ী ওযর ছাড়া খোলা বা অন্যের রান দেখা জায়েয নেই।

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিবাহ অধ্যায়

لانكاح الابولى

অলি বিনে বিবাহ হয় না

তিন ইমাম তাদের মতে স্বাধীন মহিলার বিবাহ অলির অনুমতি ছাড়া সংগঠিত হয় না।

দলীল : কুরআনের আয়াত, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ এই আয়াতে অলিদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা মেয়েদেরকে বিবাহ দিয়ে

---

৩০৫. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ।

৩০৬. সুনানে আবু দাউদ।

দাও। এর দ্বারা বুঝা যায়, মেয়েদের বিবাহ অভিভাবক দিবে। তারা ব্যতীত বিবাহ হবে না। হাদীসে আছে,[৩০৭] لا نكاح الا بولى

হযরত আয়েশা রাযি.এর হাদীস[৩০৮]

أيما إمرة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.

এই সকল হাদীস থেকে জানা যায়, বিবাহ সংগঠিত হওয়ার জন্য অভিভাবকের অনুমতি জরুরী। তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ সংগঠিত হবে না।

জবাব : আয়াতে মেয়েদের পরিবর্তে অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করেছে, কারণ মেয়েরা লজ্জাশীল হয়। নিজের পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য বলতে পারে না। তাই অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না, এজন্য নয়। প্রথম হাদীসের জবাব হলো, তাতে ইযতিরাব আছে। অথবা বলা হবে, তাতে নাকচ পরিপূর্ণতার জন্য।

দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, এই হাদীসের রাবী হলেন, হযরত আয়েশা রাযি.। এই সনদের ভিত্তি হলো, হযরত যুহুরীর ওপর। আর দুজনেরই ফতোয়া বর্ণিত হাদীসে বিপরীত। দ্বিতীয়ত, এখানে মেয়ে থেকে বাদী উদ্দেশ্য। বাদীর বিবাহ অভিভাবক এবং মালিক ছাড়া হতে পারে না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে স্বাধীন মেয়ের বিবাহ অভিভাবক ছাড়া হতে পারে।

দলীল : কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিবাহের সম্পৃক্ততা মহিলাদের দিকে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

---

[৩০৭]. সুনানে আবু দাউদ।

[৩০৮]. জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদেরকে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ করতে বারণ করো না। এখানে বিবাহের সম্পর্ক মেয়েদের দিকে করা হয়েছে। বুঝা গেলো, মেয়ে নিজেই তার বিবাহের হকদার।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الأيم أحق بنفسها من وليها .

"মহিলা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার।"[৩০৯] বুঝা গেলো, সে নিজে বিবাহ করতে পারে।

হযরত আয়েশা রাযি. তার ভাই হযরত আব্দুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তার মেয়ে হাফসার বিবাহ দিয়ে দেন।[৩১০] এবং বিবাহ হয়ে যায়। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয়ে যায়।

وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ

বাধ্য করার অধিকার

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে বেলায়েতে এজবারের ভিত্তি বেকারতের (মেয়ে বাকেরা ও ছায়্যিবা হওয়ার) ওপর। অর্থাৎ মেয়ে যতদিন বাকেরা থাকবে বেলায়েতে এজবার থাকবে। আর ছায়্যিবা হয়ে গেলে বেলায়েত শেষ হয়ে যাবে।

ইমাম আযম রহ.এর মতে বেলায়েতে এজবারের ভিত্তি ছোট বড় হওয়ার ওপর। যতদিন পর্যন্ত ছোট থাকবে বেলায়েতে এজবার থাকবে। আর যখন বড় হয়ে যাবে বেলায়েত শেষ হয়ে যাবে।

---

[৩০৯]. সহীহ মুসলিম।

[৩১০]. তহাবী।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الايم أحق بنفسها من وليها.

"মেয়ে তার নিজের ব্যাপারে অলির চেয়ে বেশি হকদার।" মেয়ে থেকে এখানে ছায়্যিবা উদ্দেশ্য। এর যদি বিপরীত অর্থ বের করা হয়, তাহলে এবারত হবে,

والبكر ليست احق بنفسها من وليها .

"বাকেরা নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার নয়।" বরং অভিভাবকই তার ওপর বেলায়েতে এজবার রাখে। আর ছায়্যিবা তার বিয়ের হকদার নিজেই। তাই তার ওপর অভিভাবক বেলায়েতে এজবার রাখে না।

জবাব : বিপরীত অর্থ আমাদের মতে দলীল নয়। তাছাড়া অন্যান্য হাদীস থেকে যে, বালেগা বাকেরার ওপর বেলায়েতে এজবার না জায়েয হওয়া বুঝা যায়, তার সামনে বিপরীত অর্থ প্রত্যাখ্যাত হবে।

হানাফীদের দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تنكح البكر حتى تستأذن.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস,

أن جارية بكرا اتت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

অর্থাৎ একজন বাকেরা মেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এসে বললো, আমার বাবা আমার বিবাহ দিয়েছে। অথচ আমি রাজি না। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিলেন। তুমি চাইলে বিবাহ ভেঙ্গে দাও। এর থেকেও জানা যায়, বাকেরার ওপর বেলায়েতে এজবার চলে না। আর যখন বাকেরা ছায়্যিবা হওয়ার ওপর বেলায়েতে এজবারের ভিত্তি থাকলো না,

তাহলে দ্বিতীয় দিকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেলো এবং প্রমাণ হয়ে গেলো যে, বেলায়েতে এজবারের ভিত্তি ছোট ও বড় হওয়ার ওপর।

الطَّلَاقُ خِلَالَ الْحَيْضِ

হায়েয চলাকালীন সময়ে তালাক দেওয়া

হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে সর্বসম্মতক্রমে তালাক হয়ে যায়। তবে মানুষ গুনাহগার হয়। এরপরও কেউ যদি হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাকে রজআতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে যে, রজআত করা মুস্তাহাব, নাকি ওয়াজিব?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে রজআত করা মুস্তাহাব।

দলীল : বিবাহ করা যখন ওয়াজিব নয়, তাহলে সেটা বাকি রাখাও ওয়াজিব নয়। তবে বেশির থেকে বেশি মুস্তাহাব হতে পারে। তাই আমরা বলেছি, রজআত মুস্তাহাব।

জবাব : উল্লিখিত কেয়াসের বিপরীত হাদীস আছে। তাই কেয়াস বাদ দিয়ে হাদীস প্রাধান্য পাবে।

ইমাম আযম রহ. **ও মালেক** রহ.এর মতে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে রজআত করা ওয়াজিব।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি. যখন নিজ স্ত্রীকে তালাক দিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, রজআত করো। আমরের সিগা ব্যবহার করেছেন। যেটা ওয়াজিব বুঝানোর জন্য আসে। বুঝা গেলো, রজআত ওয়াজিব। দ্বিতীয়ত, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া সকলের মতে গুনাহ। এবার সেই গুনাহকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া যাবে না, তবে রজআত করে কমানো যেতে পারে।

اَلنَّفْقَةُ وَالسُّكْنٰى

খরচ ও বাড়ি

তালাকে রজয়ীপ্রাপ্ত ও তালাকপ্রাপ্ত গর্ভবতীর মতো তালাকপ্রাপ্ত গর্ভহীনকে ইদ্দাত চলাকালীন সময়ে খরচ ও বাড়ি দেওয়া হবে কি না? এতে ইখতিলাফ আছে।

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে গর্ভহীন তালাকপ্রাপ্তকে ইদ্দাতের সময়ে খরচ ও বাড়ি কিছুই দেওয়া হবে না।

দলীল : হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি.এর হাদীস, তার স্বামী যখন তাকে তালাক দিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর খেদমতে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, لا سكنى لك ولا نفقة 'তুমি ঘর ও খরচ কিছুই পাবে না'।[৩১১] এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, গর্ভহীন তালাকপ্রাপ্ত খরচ ও ঘর কিছুই পাবে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে বাড়ি দেওয়া হবে, কিন্তু খরচ দেওয়া হবে না।

দলীল : ঘর দেওয়ার বিষয়ে তারা আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, اسكنواهن من حيث سكنتم এখানে ঘর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর খরচ না নেওয়ার ব্যাপারে হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি. উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খরচ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

জবাব : হযরত ফাতেমা বিন কায়েস রাযি.এর হাদীসের বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন, তিনি স্বামী ও শশুর বাড়ির লোকদের ব্যাপারে

---

[৩১১]. জামে তিরমিযী।

বিভিন্ন অভিযোগ করতেন। তাই তাকে ঘর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। দ্বিতীয়ত, তিনি একা থাকার কারণে একাকিত্ববোধ করছিলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ওখান থেকে সরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি.এর ঘরে ইদ্দাত পালন করতে বলেন। খরচ না দেওয়ার জবাব হলো, যখন স্বামীর ঘরে থাকেনি তাই খরচও বাদ হয়ে গেছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি থেকেই অস্বীকৃতি জানান।

ইমাম আযম রহ.এর মতে গর্ভহীন তালাকপ্রাপ্তকে খরচ ও ঘর দুটিই দেওয়া হবে।

দলীল : কুরআনের আয়াত- وللمطلقات متاع بالمعروف এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদেরকে মাতা' দিতে বলা হয়েছে। আর মাতা' বলে এখানে ঘর ও খরচ দুটিই উদ্দেশ্য। যেমন এর পূর্বের আয়াতে মাতা' শব্দ থেকে সর্বসম্মতক্রমে খরচ ও বাড়ি দুটিই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাদীসে আছে,[৩১২]

عن جابر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.

এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, গর্ভহীন তালাকপ্রাপ্তকে ঘর ও খরচ দেওয়া ওয়াজিব ও জরুরী।

---

৩১২. সুনানে দারা কুতনী : ৪/২১।

كَوْنُ الْمَهْرِ مَالاً

মাহার মাল হতে হবে

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে মাহার মাল হওয়া জরুরী নয়। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,

عن سهل بن سعد ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال زوجتكها بِمَا معك من القران .

""রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম, তোমার সাথে যে কুরআন আছে, তার বিনিময়ে।[৩১৩]

লক্ষ করুন, এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে মাহার নির্ধারণ করলেন। অথচ কুরআন যেটা মানুষ শিখে সেটা মাল নয়। এর দ্বারা বুঝা যায়, মাহার মাল হওয়া জরুরী নয়।

জবাব : হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ। যার কারণে আয়াতকে বাদ দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, بما معك এখানে باء শব্দটি বিনিময় অর্থে ব্যবহার হয়নি। বরং কারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তোমার কুরআন জানা থাকার কারণে। তৃতীয়ত, কুরআন মাহার হওয়া ঐ সাহাবীর বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাদের পরে কারো জন্য কুরআনকে মাহার বানানো বৈধ নয়।

ইমাম আযম রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে মাহার মাল হওয়া জরুরী।

দলীল : কুরআনের আয়াত,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

---

৩১৩. জামে তিরমিযী।

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুহাররামাত ছাড়া বাকি মহিলারা তোমাদের জন্য হালাল। তোমরা মালের বিনিময়ে তাদেরকে গ্রহণ করতে পারো। এখানে মালের কথা বলা হয়েছে। গায়রে মাল মাহার হতে পারে না। এভাবে অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ এখানে মিলনের পূর্বে তালাক হলে মাহার অর্ধেক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর মাহার তখন অর্ধেক হতে পারে, যখন তা মাল হবে। এর থেকেও জানা যায় মাহার মাল হওয়া জরুরী।

كَوْنُ الْعِتْقِ مَهْرًا

স্বাধীন করা মাহার হওয়া

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে ইতক (স্বাধীন করা) মাহার বানানো জায়েয।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস,

أن النبى صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুফিয়া রাযি.কে স্বাধীন করে তাকে বিবাহ করলেন এবং তার স্বাধীন হওয়াকে মাহার নির্ধারণ করলেন।"[৩১৪] এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, স্বাধীন করাকে মাহার বানানো জায়েয।

জবাব : এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বৈশিষ্ট্য ছিলো। উম্মতের জন্য ইতককে মাহার বানানো বৈধ নয়। আর বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন

---

[৩১৪]. জামে তিরমিযী।

নয়জন স্ত্রী বিবাহ করা, মাহার ছাড়া বিবাহ করা ইত্যাদি। তাই অন্য কেউ ইতককে মাহার বানালে বিবাহ তো হয়ে যাবে, তবে পরে মাহারে মিসিল ওয়াজিব হবে।

তিন ইমামের মতে ইতককে মাহার বানানো জায়েয নেই।

দলীল : কুরআনের আয়াত,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

এই আয়াতে বলা হয়েছে, মহিলাদের নির্ধারিত মাহার পরিশোধ করো। তারা যদি খুশিতে কিছু মাহার মাফ করে দেয়, তাহলে তা ভালো মনে করে খাও। লক্ষ করুন, ইতককে যদি মাহার নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সেখান থেকে কিভাবে মাফ করে। আর স্বামী কিভাবে ভালো ভেবে খেতে পারে। জানা গেলো, ইতক মাহার হতে পারে না।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

বেচা-কেনা অধ্যায়

بُدُوُّ الصَّلَاحِ

বিক্রয়যোগ্য হওয়া

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে بدو الصلاح এর অর্থ হলো, ফল পেকে মিষ্টি হয়ে যাওয়া। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মতে অর্থ হলো, ফল এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া যে, বিপদ ও নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

بدو الصلاح এর ছয়টি ছুরত। بدو الصلاح এর পূর্বে বিক্রি করার তিন ছুরত, পরে বিক্রি করার তিন ছুরত।

প্রথম ছুরত হলো, بدو الصلاح এর আগে ফল বিক্রি করা হবে এবং বিক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে ফল ছিঁড়ে নেওয়ার শর্ত লাগাবে। এই ছুরত সর্বসম্মতক্রমে জায়েয।

দ্বিতীয় ছুরত হলো, بدو الصلاح এর পূর্বে ফল বিক্রি করা হবে এবং ক্রেতা কিছুদিন পর্যন্ত ফল গাছে রাখার শর্ত লাগাবে। এই ছুরত সর্বসম্মতক্রমে নাজায়েয।

তৃতীয় ছুরত হলো, بدو الصلاح এর পূর্বে ফল বিক্রি করা হবে এবং কোনো শর্ত লাগানো হবে না। এই ছুরতে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমাম এর মতে এই ছুরতে বিক্রি নাজায়েয।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمشترى.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম بدو الصلاح এর পূর্বে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।[৩১৫]

জবাব : তৃতীয় ছুরত নাজায়েয হওয়ার ওপর এই হাদীস থেকে দলীল পেশ করা সহীহ না। কেননা, তারা প্রথম ছুরতকে জায়েয বলেছেন। অথচ সেটাও তো بدو الصلاح এর পূর্বে বিক্রি। যা উল্লিখিত হাদীসের বিপরীত। অতএব হাদীসের ব্যাপকতায় প্রথম ছুরত যেমন অন্তর্ভুক্ত নয়

---

৩১৫. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

তৃতীয় ছুরতও অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম بدو الصلاح এর পূর্বে বিক্রি নিষেধ করেছেন, দয়া ও পরামর্শমূলক। যেটাকে ইরশাদী নিষেধ বলে।[৩১৬]

ইমাম আযম রহ.এর মতে এই ছুরতে বিক্রি জায়েয।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"যে ব্যক্তি এমন খেজুর গাছ বিক্রি করবে যার ফল এসেছে, ফল বিক্রেতার জন্য হবে। তবে ক্রেতা যদি শর্ত লাগায়।"[৩১৭]

লক্ষ করুন, এই হাদীসে بدو الصلاح এর পূর্বে কোনো শর্তবিহীন বিক্রয়ের কথা আছে। যার দ্বারা বুঝা যায়, بدو الصلاح এর পূর্বে বিক্রির এই ছুরত যাতে কোনো শর্ত লাগানো হয়নি, সেটা জায়েয আছে। দ্বিতীয়ত, بدو الصلاح এর পূর্বে যদিও মাল মূল্যবান হয় না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে মাল মূল্যবান হয়ে যাবে। এ কারণেও বিক্রি জায়েয হওয়া উচিত।

بدو الصلاح এর পরও ফল বিক্রির তিন ছুরত

প্রথম ছুরত হলো, بدو الصلاح এর পর বিক্রি করে সঙ্গে সঙ্গে ফল ছেঁড়ার শর্ত লাগানো হবে।

দ্বিতীয় ছুরত হলো, بدو الصلاح এর পর ফল বিক্রি করা হবে এবং ফল কিছু দিন গাছে রাখার শর্ত লাগানো হবে।

---

৩১৬. আইনী : ৫/৫৩৯, ফতহুল কদীর : ৫/১০২।

৩১৭. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

তৃতীয় ছুরত হলো, بدو الصلاح এর পর ফল বিক্রি করা হবে এবং কোনো শর্ত লাগানো হবে না।

بدو الصلاح এর পরে বিক্রির এই তিন ছুরতই তিন ইমামের নিকট জায়েয। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মতে দ্বিতীয় ছুরত নাজায়েয।

তিন ইমাম بدو الصلاح এর পর বিক্রয়ের তিন ছুরতের বৈধতার ওপর ঐ হাদীসের বিপরীত অর্থ দিয়ে দলীল পেশ করেন, যাতে بدو الصلاح এর আগে বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা বলেন, যখন بدو الصلاح এর পূর্বে বিক্রি নাজায়েয, তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে, بدو الصلاح এর পরে সর্বাবস্থায় জায়েয। (কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে বিপরীত অর্থ দলীল হয় না।)

ইমাম আযম রহ. দ্বিতীয় ছুরত নাজায়েয হওয়ার ওপর দলীল পেশ করেন যে, এতে ক্রেতার পক্ষ থেকে এমন শর্ত লাগানো হয়েছে, যা চুক্তির চাহিদা বিরোধী। (অর্থাৎ এক সময় পর্যন্ত ফল গাছের ওপর ছেড়ে রাখা) আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্তসহ বিক্রি নিষেধ করেছেন। যেমন- হাদীসে আছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط .

তাই দ্বিতীয় ছুরত এই শর্তে ফাসেদের কারণে জায়েয হবে না।

خِيَارُ الْمَجْلِسِ

মজলিসের খেয়ার

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **আহমদ** রহ. এর মতে আকেদাঈন খেয়ারে মজলিস লাভ করে।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস, [৩১৮]

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا .

ইমাম শাফেয়ী রহ. এই হাদীসে খেয়ার থেকে খেয়ারে মজলিস এবং তাফাররুক থেকে শারীরিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য নেন। তিনি হাদীসের অর্থ এভাবে বলেন, আকেদাঈনের মধ্য থেকে প্রত্যেকে নিজ সাথীর ওপর খেয়ারে মজলিস লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপর থেকে পৃথক না হয়।

জবাব : এই হাদীস খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের আয়াতের বিপরীত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, এতে খেয়ার থেকে খেয়ারে কবুল উদ্দেশ্য। খেয়ারে মজলিস উদ্দেশ্য নয়। আর তাফাররুক থেকে শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং মৌখিক বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কথাবার্তা থেকে অব্যাহতি নেওয়া।

ইমাম আযম ও **ইমাম মালেক** রহ.এর মতে আকেদাঈন খেয়ারে মজলিস লাভ করে না।

দলীল : আকেদাঈনের পক্ষ থেকে ইজাব কবুল হয়ে আকদ পূর্ণ হয়ে গেলো, এবার তা পূর্ণ করা জরুরী। সুতরাং কুরআনে আছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

৩১৮. সহীহ বুখারী।

লক্ষ করুন, এই আয়াতে আকদ পূর্ণ হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করাকে আবশ্যক বলেছে। এখন আমরা যদি খেয়ারে মজলিসকে প্রমাণ করি তাহলে সে বাস্তবায়ন করার আবশ্যকীয়তার নাকচ হয়ে যাবে। আর উদ্দেশ্য হবে, আকদ পূর্ণ হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন জরুরী নয়। বরং আকেদাঈনের অধিকার থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি.এর হাদীসে আছে,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারো জন্য এটা জায়েয নেই যে, সে তার সঙ্গী থেকে এই ভয়ে পৃথক হবে, যাতে সে তার থেকে চুক্তি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করতে পারে।"[৩১৯]

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকেদাঈনের যদি অধিকার থাকতো তাহলে প্রত্যেকে বিক্রয়কে ভেঙ্গে দিতে পারতো। অন্যের থেকে ফেরত নেয়ার দাবি করার প্রয়োজন কি? অন্যের থেকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবি করার দ্বারা বুঝা যায়, এখন কারো কোনো অধিকার থাকলো না। তাই অপরের সন্তুষ্টি ছাড়া বিক্রয় ভেঙ্গে দিতে পারছে না।

بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ

মুছাররাত জন্তু বিক্রি করা

মুছাররাত বলে এমন জন্তু যার ওলানে এই উদ্দেশ্যে দুধ রেখে দেওয়া হয় যে, ক্রেতা সেটাকে বেশি দুধের জন্তু মনে করে। মুছাররাত সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে।

---

৩১৯. সুনানে আবু দাউদ।

তিন ইমামের মতে ক্রেতার অধিকার আছে যে, সেটাকে রাখবে অথবা এক ছা‘ খেজুরসহ সেটা ফেরত দিবে।

দলীল : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام.

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি এমন ছাগল ক্রয় করে যার দুধ আটকে রাখা হয়েছে, তাহলে তার অধিকার আছে (চাইলে সেটা রেখে দিবে) চাইলে এক ছা‘ খাদ্যসহ ফিরিয়ে দিবে।”[৩২০]

লক্ষ করুন, এই হাদীসে ক্রেতাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, রাখা এবং ফিরিয়ে দেওয়ার।

জবাব : হাদীসটি মুযতারাব। তাই দলিলের যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, হাদীসটি মানসুখ। আর নাসেখ হলো,

البيعان بالخيار مالم يتفرقا

অনেকে বলেছেন, রেবার আয়াতের দ্বারা মানসুখ হয়েছে। তৃতীয়ত: দুধের বিনিময়ে এক ছা খেজুর বা খাদ্য দেওয়া উসূলের বিপরীত। কেননা জরিমানা হয়তো মিসলে ছুরী দেওয়া হয়, অথবা মিসলে মা‘নবী দেওয়া হয়। এখানে খেজুর মিসলে ছুরীও নয়, মিসলে মা‘নবীও নয়। অর্থাৎ দুধের মূল্যও নয়।

ইমাম আযম রহ.এর মতে ক্রেতা ফেরত দেয়ার অধিকার রাখে না।

দলীল : ইজাব কবুলের পর চুক্তি যখন পূর্ণ হলো, তাহলে এটাকে পুরা করতে হবে। সুতরাং কুরআনে আছে, أوفوا بالعقود দ্বিতীয়ত, হাদীসে

---

৩২০. জামে তিরমিযী।

আছে[৩২১], الخراج بالضمان। এর দ্বারা বুঝা যায়, যার হাতে জিনিস থাকে লাভ তারই অধিকার। সুতরাং মুছাররাত থেকে যখন দুধ বের করেছে, তখন ঐ জন্তু ক্রেতার দায়িত্বে ছিলো। তাই এই দুধের মালিক ক্রেতা। এই দুধ যখন ক্রেতার বলে প্রমাণ হলো, তখন বিনিময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

تابير النخل

খেজুর গাছ তাবীর করা

তিন ইমামের মতে খেজুর গাছ তাবীর করার পর বিক্রি করলে ফল বিক্রেতা পাবে। আর তাবীরের পূর্বে বিক্রি করলে ফল ক্রেতা পাবে।

দলীল : হযরত উমর রাযি.এর হাদীস, [৩২২]

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ابتاع نخلا بعدان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع .

এই হাদীসে বলা হয়েছে, খেজুর গাছ যদি তাবীরের পর বিক্রি করা হয়, তাহলে ফল বিক্রেতা পাবে। তিন ইমাম এর বিপরীত অর্থ বের করে বলেন, তাবীরের পূর্বে যদি বিক্রি করা হয়, তাহলে ফল ক্রেতা পাবে। তারা বিপরীত অর্থ দ্বারা একথা প্রমাণ করছে যে, ফল তাবীরের পূর্বে বিক্রি করলে ক্রেতা পাবে। অথচ এটা সহীহ নয়।

জবাব : বিপরীত অর্থ আমাদের মতে দলীল নয়। তাই এর দ্বারা তাবীরের পূর্বে বিক্রির ছুরতে ফল ক্রেতার মালিকানা প্রমাণ করা যায় না। **ইমাম আযম** রহ.এর মতে খেজুর গাছ তাবীরের পরে বিক্রি করা হোক কিংবা তাবীরের পূর্বে বিক্রি করা হোক উভয় ছুরতে ফল বিক্রেতা পাবে।

---

৩২১. মেশকাত শরীফ।

৩২২. মেশকাত শরীফ।

দলীল : হাদীসে পাক,

عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

"যে ব্যক্তি কোনো জমিন ক্রয় করলো এবং তাতে খেজুর গাছও আছে, তাহলে ফল বিক্রেতা পাবে।"[৩২৩]

লক্ষ করুন, এখানে তাবীরের কোনো উল্লেখ নেই। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে বলেছেন, যখনি গাছ কেনা হবে ফল বিক্রেতা পাবে। এটাই আমাদের মাসলাক।

بَيْعُ السَّلَمِ

সালাম লেনদেন

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে সালাম লেনদেনে পণ্য বাকি হওয়া জরুরী নয়। বরং নগদ থাকলেও সালাম লেনদেন হতে পারে।

দলীল : হাদীসে আছে,

نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ماليس عند الانسان ورخص فى السلم .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপস্থিত বস্তু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে সালাম বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।" এই হাদীসে সালাম বিক্রির অনুমতির কথা বলা হয়েছে। যদিও অনুপস্থিত বস্তুর বিক্রি জায়েয নেই। তবে সালাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি আছে যে, পণ্য না থাকলেও বিক্রয় জায়েয ও সহীহ হতে পারে। আর পণ্য বাকি এবং অনুপস্থিত থাকার ছুরতে বিক্রয় সঠিক হলে, নগদ থাকার ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক হবে।

---

৩২৩. মেশকাত শরীফ।

জবাব : হাদীসে আছে, لا تبع ماليس عندك "যে জিনিস তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না।" এর চাহিদা ছিলো, সালাম লেনদেনও সহীহ হবে না। কেননা তাতেও চুক্তির সময়ে পণ্য উপস্থিত থাকে না। তবে হাদীসের মধ্যে সহীহ ও সঠিক বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ঐ সকল শর্তের সাথে জায়েয হবে যা হাদীসের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং যেই হাদীসগুলি থেকে এর বৈধতা বুঝা যায়, সেই হাদীসগুলি থেকে একথাও বুঝা যায় যে, তাতে পণ্য বাকি হবে। আর পরিভাষায় এটাকেই সালাম লেনদেন বলে। তাই পণ্যও মূল্যের মতো নগদ হলে এটাকে সালাম লেনদেন বলবে না।

তিন ইমামের মতে পণ্য বাকি হওয়া জরুরী।

দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস,[৩২৪]

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من اسلف اى السلم فى شيئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم .

এই হাদীসে বলা হয়েছে, যখন তোমরা সালাম লেনদেন করবে, তখন তিনটি জিনিস নির্দিষ্ট করে নাও। কায়েল, ওযন, সময়।

লক্ষ করুন, সালাম লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য নগদ হলে সময় নির্ধারণের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে? বুঝা গেলো, সালামে পণ্য বাকি থাকে, তাই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারণ করো। এটাই আমাদের মাসলাক যে, সালাম লেনদেনে পণ্য বাকি থাকে।

ফায়েদা : সালাম বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য ৭টি শর্ত। ১. রাসুল মাল বা মূল ধনের প্রকার, ধরণ, গুন ও পরিমাণ বর্ণনা করে দেওয়া হবে। ২. মূলধন নগদ হতে হবে। ৩. মুসলাম ফিহ বা পণ্যের প্রকার, ধরণ, গুন ও পরিমাণ বর্ণনা করতে হবে। ৪. পণ্য বাকি থাকবে। ৫. পণ্য পরিশোধের

---

[৩২৪]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

স্থান নির্দিষ্ট থাকবে। ৬. পণ্য জোগাড় করার ক্ষমতা থাকতে হবে। ৭. পণ্য এমন বস্তু হতে হবে, যা নির্ধারণের দ্বারা নির্ধারণ হয়ে যায়।

الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ

শোফার অধিকারী প্রতিবেশী

ইমামগণ এক্ষেত্রে একমত যে, শরিক ব্যক্তি শিরকতের কারণে শোফার হক লাভ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে যে, প্রতিবেশী হওয়া হিসেবে শোফা পাবে কি না? তিন ইমামের মতে প্রতিবেশী হিসেবে শোফা পাবে না।

দলীল : হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস,

قال قضى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঐ জিনিসের মধ্যে শোফার নির্দেশ দিয়েছেন, যা বণ্টন করা হয়নি। যখন সীমা নির্ধারণ হয়ে যাবে এবং রাস্তা পরিবর্তন হবে, তখন শোফা পাবে না।[৩২৫]

লক্ষ্য করুন, এই হাদীসে প্রতিবেশীর কোনো উল্লেখ নেই। শুধু শরিকের উল্লেখ আছে। বুঝা গেলো প্রতিবেশী শোফা পাবে না।

জবাব : এখানে فلا شفعة বলে শোফা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, সীমা ও রাস্তা নির্ধারণের পর শিরকতের ভিত্তিতে শোফা পাবে না। কেননা বণ্টনের কারণে শিরকত চলে গেছে। তবে প্রতিবেশী হিসেবে সেটা তো বাকিই আছে।

ইমাম আযম রহ.এর মতে শরিকের মতো প্রতিবেশীও শোফার হকদার।

---

৩২৫. সহীহ বুখারী।

দলীল : হাদীসে আছে, الجار أحق بشفعة "প্রতিবেশী শোফার বেশি হকদার।"[৩২৬] হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি.এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الجار احق بدار الجار "প্রতিবেশীর ঘরের বেশি হকদার প্রতিবেশী।"[৩২৭] এই সকল হাদীস থেকে পরিস্কার জানা যায়, প্রতিবেশীও শোফার হকদার। তাই শোফাকে শুধু شريك فى حق المبيع ও شريق فى نفس المبيع এর সাথে বিশেষায়িত করা সহীহ নয়।

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

سلب القتيل

নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ

লড়াইয়ের পূর্বে আমীর যদি ঘোষণা করে যে, নিহত ব্যক্তির মাল কাতেলকে দেওয়া হবে, তাহলে সর্বসম্মতক্রমে কাতেল সালব বা পরিত্যক্ত মালের মালিক হবে। আর আমীর যদি ঘোষণা না করে, এক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে আমীর ঘোষণা করুন বা না করুন সালব কাতেল পাবে।

দলীল : হাদীসে নববী- من قتل قتيلا فله سلبه "নিহতের মাল সে পাবে যে তাকে হত্যা করেছে।" এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৩২৬. সহীহ বুখারী।
৩২৭. সুনানে আবু দাউদ।

সাল্লাম সাধারণভাবে ইরশাদ করেন যে, নিহতের মাল ও সম্পদ কাতেল পাবে। আমীরের ঘোষণার কোনো শর্ত নেই।

জবাব : হাদীসটি মুতলাক। আর যখন মুতলাক ও মুকাইয়াদ একত্রিত হয়, তখন মুতলাককে মুকাইয়াদের সাথে যুক্ত করা হয়। তাই এটাকেও প্রথম ছুরত (অর্থাৎ যখন আমীর সাহেব ঘোষণা করবে) এর সাথে যুক্ত করা হবে।

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে আমীর আগে ঘোষণা করলে কাতেল নিহতের মালের মালিক হবে, নতুবা হবে না।

দলীল : আয়াতে কারিমা,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"এই আয়াতে شئ শব্দটি নাকেরা ব্যবহার করে সকল মালকে গনিমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে গানেমীনের অংশ সাব্যস্ত করেছেন। আর নিহতের সালবও شئ এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা কাতেলের হক কিভাবে হতে পারে? অন্য এক আয়াতে গানেমীনকে বলেছেন,

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

"ঐ মাল থেকে তোমরা খাও, যা গনিমতে পেয়েছো, হালাল এবং পবিত্র হিসেবে।" সালাবও গনিমত হিসেবে অর্জন হয়। তাই এটাও গানেমীনের জন্য হবে। হযরত হাবীব বিন মুসলিম রাযি. এক জিহাদে কাফেরকে হত্যা করে তার মাল দখল করেন এবং তিনি একথা বলে নিতে চাইলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতের মাল কাতেলের হক সাব্যস্ত করেছেন। এর ওপর হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. বলেন,

مهلا يا حبيب لان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال انما للمرء ماطابت به نفس إمامه .

"হে হাবীব, রেখে দাও। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের জন্য সেটাই হালাল হবে ইমাম যতটুকুর ওপর সন্তুষ্ট।" বুঝা গেলো, আমীর খুশি মনে না দিলে এবং আগে এ'লান না করলে কাতেল সালব পাবে না।

لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

পদাতিকের জন্য একাংশ

তিন ইমামের মতে পদাতিকের জন্য একাংশ এবং অশ্বারোহীর জন্য তিন অংশ। একটি আরোহীর জন্য, আর দুইটি ঘোড়ার।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর হাদীস,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহী ও তার ঘোড়ার জন্য তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন। তার একাংশ, ঘোড়ার দুই অংশ"[৩২৮]

অন্য এক হাদীসে আছে,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للفارس من ثلثة أسهم وللراجل سهما

[৩২৮]. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

এই সকল হাদীস থেকে বুঝা যায়, পদাতিক একাংশ পাবে, আর অশ্বারোহী তিন অংশ পাবে। একাংশ তার এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।

জবাব : হয়তো এই হাদীসগুলি খয়বার যুদ্ধের পূর্বেকার, তাই মানসুখ হয়ে গেছে। অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল ও দান হিসেবে একাংশ অতিরিক্ত দিয়েছেন। যেমন : হযরত সালামা বিন আকওয়া রাযি.কে দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কখনো লেখতে আলিফকে ফেলে দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে এমনি হয়েছে যে, মূলত للفارس سهمان ছিলো। আলিফকে ফেলে দেওয়ার কারণে للفرس سهمان হয়ে গেছে।

ইমাম আযম রহ.এর মতে পদাতিককে একাংশ এবং অশ্বারোহীকে দুই অংশ দেওয়া হবে।

দলীল : হযরত মাজমা' বিন জারিয়া আনসারী রাযি.এর হাদীস,

فقسمت خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهما فاعطى الفارس سهمين وَأعطى الراجل سهما .

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বারের মাল আঠারো অংশ করে হুদায়বিয়ার সৈন্যদের ওপর বণ্টন করেন। অশ্বারোহীকে দুই অংশ দেন এবং পদাতিককে একাংশ দেন। লক্ষ করুন, এই হাদীসে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্বারোহীকে দুই অংশ দিয়েছেন। অর্থাৎ একটি আরোহীর অপরটি ঘোড়ার অংশ। তাছাড়া হাদীসের মধ্যে সংঘর্ষ হলে, কিয়াসের দিকে যেতে হয়। আর কিয়াসও বলে যে, ঘোড়ার একাংশ হওয়া উচিত। কেননা, ঘোড়া অধীন, আর আরোহী মূল। ঘোড়াকে যদি দুই অংশ দেওয়া হয় এবং আরোহীকে যদি একাংশ দেওয়া হয়, তাহলে অধীন মূলের ওপর বেড়ে যাবে, যা বিবেক পরিপন্থী।

ذَوِي الْقُرْبٰى

নিকটাত্মীয়

গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগ করা হতো। একাংশ আল্লাহ এবং রাসূলের। দ্বিতীয়াংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়-স্বজনের। অর্থাৎ বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব। তৃতীয়াংশ ইয়াতিমদের। চতুর্থাংশ মিসকীনদের। পঞ্চমাংশ ইবনুস সাবীল বা মুসাফিরদের। এই পাঁচ ভাগের মধ্যে প্রথম দুই ভাগ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ইন্তেকালের পর বাদ হয়ে গেছে। একাংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এবং আরেকাংশ তার আত্মীয়-স্বজনের। যা তাদেরকে সহায়তা মূলক দেওয়া হতো। তবে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা ফকীর তাদেরকে বাকি তিন প্রকার অর্থাৎ ইয়াতিম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীলের অন্তর্ভুক্ত করে অংশ দেওয়া হবে। এই সকল ব্যাখ্যা সর্বসম্মত। তবে এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে যে, আত্মীয় ফকীরদের মতো তার আত্মীয় যারা ধনী তাদেরকে অংশ দেওয়া হবে কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফোকারাদের মতো ধনীদেরও অংশ দেওয়া হবে।

দলীল : আয়াত ولذى القربى মুতলাক এসেছে। তার মধ্যে ফকীর ও ধনীর কোনো খাস করা হয়নি। তাই বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের ফকীরদের যেমন দেওয়া হবে, তেমনি তাদের ধনীদেরকেও দেওয়া হবে।

জবাব : কুরআনের আয়াত ولذى القربى সর্বসম্মতক্রমে ব্যাপক নয়। নতুবা সকল মানুষের আত্মীয়-স্বজন পঞ্চমাংশের থেকে অংশ পাবে। বরং এটা মুজমাল। এর জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং চার খলিফা ধনীদেরকে বাদ দিয়ে ফকীরদেরকে অংশ দেওয়া এর ব্যাখ্যা। যার দ্বারা

স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফোকারা আত্মীয়কে অংশ দেওয়া হবে, ধনী আত্মীয়কে দেওয়া হবে না।

হানাফীদের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফকীরদেরকে অংশ দেওয়া হবে, ধনীদেরকে দেওয়া হবে না।

দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর এক হাদীসে আছে, চার খলিফা গনিমতের মালের খুমুস (পঞ্চমাংশ)কে তিন ভাগে ভাগ করতেন। ইয়াতিম, মিসকীন ও ইবনুস সাবীল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আত্মীয়দের মধ্যে ফকীরদেরকে অংশ দিয়েছেন। ধনীদেরকে দেননি। বুঝা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শুধু ফকীরদেরকে অংশ দেওয়া হবে, ধনীদেরকে দেওয়া হবে না।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ

হদ ও কেসাসের অধ্যায়

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِكَافِرٍ

কাফেরের কারণে মুমিনকে হত্যা করা

এ কথার ওপর সকলে একমত যে, কাফেরে হারবীর কেসাসে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। তবে কাফেরে যিম্মীর কেসাসে হত্যা করা হবে কি না? এতে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমামের মতে কাফেরে হারবীর মতো কাফেরে যিম্মীর কেসাসে মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

দলীল : পবিত্র হাদীস لا يقتل مسلم بكافر "কোনো মুসলমানকে কাফেরের কারণে হত্যা করা হবে না।"[৩২৯] এই হাদীসে হারবী ও যিম্মীর কোনো বিশেষত্ব নেই। তাই দুটির হুকুম এক হবে। হারবী কাফেরের বদলায় মুসলিমকে হত্যা করা হবে না, যিম্মী কাফেরের বদলায়ও হত্যা করা হবে না।

জবাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যে খুতবা দিয়েছিলেন, তাতে এই কথা বলেছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত যিম্মী কাফের হতো না। শুধু হারবী কাফের ছিলো। যিম্মী কাফেরের ধারা শুরু হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর। বুঝা গেলো, এই হাদীসে কাফের বলে হারবী উদ্দেশ্য। যিম্মী কাফের উদ্দেশ্য নয়। আর হাদীসের উদ্দেশ্য হবে, মুসলমানকে হারবী কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না।

হানাফীদের মতে হারবী কাফেরের কেসাসে মুসলমানকে হত্যা করা হবে না। তবে যিম্মী কাফেরের কেসাসে হত্যা করা হবে।

দলীল : হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,[৩৩০]

عن عبد الرحمن قال قتل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسلما بمعاهد وقال أنا أحق من وفى بذمته.

হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস,[৩৩১]

أن النبي ﷺ قتل مسلماً بمعاهد وقال أنا اكرم من وفى بذمته.

এই সকল হাদীস থেকে বুঝা যায়, যিম্মী কাফেরের কেসাসে মুসলমানকে হত্যা করা হবে। তাছাড়া ইসলামী হুকুমত মুসলমানদের জান-মালের

---

৩২৯. সহীহ বুখারী।
৩৩০. সুনানে আবু দাউদ।
৩৩১. সুনানে দারা কুতনী।

মতো তাদের জান-মালের দায়িত্ব নিয়েছে। তাহলে এই বিধানে দুই পক্ষ সমান হবে। তাই উভয়ের একজনের জন্য অপরজন থেকে কেসাস নেওয়া হবে।

الحَدُّ عَلَى الْجَانِي فِي الْحَرَمِ

হারামে অপরাধীর ওপর হদ লাগানো

যদি কোনো ব্যক্তি হারাম শরীফে কোনো অপরাধ করে, তাহলে ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, তার ওপর হারামেই হদ জারী করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি হারামের বাহিরে (হিলে) অপরাধ করে হারামে প্রবেশ করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। তার ওপর হারামে হদ লাগানো যায় কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ. ও **মালেক** রহ.এর মতে হারামের মধ্যে হদ লাগানো জায়েয আছে। চাই সে হারামের মধ্যে অপরাধ করুক, কিংবা বাহিরে অপরাধ করে হারামে প্রবেশ করুক।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস,

عن انس رضى الله عَنْهُ جاء رجل وقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله .

"এক ব্যক্তি এসে খবর দিলো যে, ইবনে খতল হারামে এসে কা'বার পর্দার সাথে লেগে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, ওকে হত্যা করো।"[৩৩২]

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামের মধ্যেই ইবনে খতলের ওপর হদ জারি করেছেন। অথচ সে বাহিরে মুসলমানদেরকে

---

৩৩২. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

হত্যা করেছে। বুঝা গেলো, কেউ বাহিরে অপরাধ করে হারামে প্রবেশ করলে হারামের মধ্যেই হদ লাগানো হবে।

জবাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে খতলকে মুসলমানদের কেসাস হিসেবে হত্যা করাননি। বরং সে মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যা করিয়েছেন। তাই এর থেকে হারামের মধ্যে হদ লাগানো প্রমাণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ওকে কেসাস হিসেবে হত্যা করিয়েও থাকেন তবুও এর দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জন্য এর অনুমতি ছিলো। তিনি বলেন, أحل لى ساعة من النهار "হারামকে আমার জন্য দিনের অল্প সময়ের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে।"[৩৩৩]

ইমাম আযম রহ.এর মতে হিলে অপরাধ করে হারামে প্রবেশকারীর ওপর হারামে হদ জারি করা হবে না। বরং তাকে বাহিরে বের হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হবে।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.এর হাদীস,[৩৩৪]

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ : إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

এই হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হারামকে কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করেছেন। তাই এতে কোনো হদ বা কেসাস জারি করা যাবে না। আর এমন ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা, বিক্রয় ইত্যাদি বর্জন করার নির্দেশ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর অন্য এক হাদীস থেকে পাওয়া যায়।[৩৩৫]

عن ابن عباس من أصاب حدا ثُمَّ دخل الحرام لم يجالس ولم يبائع

---

৩৩৩. আইনী- ৫/৯৩।

৩৩৪. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৩৩৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা।

حَدُّ الْخَمْرِ

মদপানের বিচার

খমরের বাস্তবতা : ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মতে খমর শুধু আঙ্গুরের মদকে বলে। অন্য নেশাদ্রব্য খমরের হুকুমে, তবে সেগুলির ওপর খমর শব্দ ব্যবহার হয় না। কেননা, শাব্দিক অর্থে খমর শুধু আঙ্গুরের মদকে বলে।

তিন ইমামের মতে প্রত্যেক নেশাদ্রব্যের ওপর খমর শব্দের ব্যবহার সঠিক। لقول عليه السلام كل مسكر خمر অর্থাৎ "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নেশাদ্রব্য বস্তু খমর।" এ কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. আঙ্গুরী মদ অল্প বেশি পান করা হারাম হওয়া এবং এ কারণে হদ জারি হওয়ার প্রবক্তা। কিন্তু আঙ্গুর ছাড়া অন্য বস্তুর মদের অল্প হারাম তো বলেন, তবে তার ওপর হদ জারি হওয়ার কথা বলেন না। পক্ষান্তরে তিন ইমাম প্রত্যেক নেশাদ্রব্যের অল্প ও বেশি হারাম হওয়া এবং এর ওপর হদ জারি হওয়ার প্রবক্তা।

মদপানের হদের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে

ইমাম আযম রহ.এর মতে মদের হদ আশি বেত্রাঘাত। ইমাম মালেক ও আহমদ রহ.এর মতও এটাই।

দলীল : এই মাসআলায় আমাদের দলীল, হযরত ওমর রাযি.এর যুগের সাহাবায়ে কেরামের ইজমা। যেটাকে হযরত ইবনে ওমর রাযি. এভাবে উদ্ধৃত করেন,

اتفق اجماع الصحابة فى زمن عمر على الثمانين فى حد الخمر ولا مخالف لهم

"হযরত ওমর রাযি.এর যুগে মদের হদ আশি বেত্রাঘাত হওয়ার ওপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়েছে এবং কেউ তার বিরোধিতা করেনি।

জানা গেলো, মদের হদ আশি বেত্রাঘাত। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত আলী রাযি.এর সাথে পরামর্শ করা সংক্রান্ত একটি হাদীস এভাবে আছে,

أن عمر استشار عليا فقال أرى أن يجلد ثمانين

"হযরত ওমর রাযি. হযরত আলী রাযি. এর সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী রাযি. বলেন, আমার মত হলো আশি বেত্রাঘাত।"

বুখারী শরীফে হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আদী থেকে বর্ণিত আছে, أن عليا جلده ثمانين এই সকল বর্ণনা থেকেও জানা যায়, মদের হদ আশি বেত্রাঘাত।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে মদের হদ চল্লিশ বেত্রাঘাত। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হযরত আনাস রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খমরের হদের মধ্যে জুতা এবং খেজুরের পাতাবিহীন ডাল দিয়ে চল্লিশটি আঘাত করতেন।"

হযরত আলী রাযি. যখন অলিদের ওপর হদ লাগালেন, তখন চল্লিশটি বেত্রাঘাত করে বললেন,

جلد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اربعين وأبو بكر اربعين

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযি. চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছিলেন।" জানা গেলো, মূলত মদের হদ চল্লিশ বেত্রাঘাতই ছিলো। (কিন্তু পরে যখন বিলাসিতা ব্যাপক হলো এবং মদপান অধিক পরিমাণে হতে লাগলো, তখন হযরত ওমর রাযি.এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ওপর ভিত্তি করে তা'যীর হিসেবে বৃদ্ধি করা হয়েছে)

জবাব : উল্লিখিত হাদীসের এভাবে জবাব দেওয়া হয় যে, অন্য এক হাদীসে بجريدتين نحوأربعين শব্দ এসেছে। যার থেকে বুঝা যায়, দুটি ডাল দিয়ে চল্লিশটি লাগাবে। সুতরাং আঘাত তো চল্লিশটি থাকবে তবে মাধ্যম হিসেবে আশি হয়ে যাবে। এভাবে হযরত আলী রাযি.এর হাদীস সম্পর্কে ইমাম তাহাবী রহ. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুই শাখা বিশিষ্ট ডাল দিয়ে পিটিয়ে ছিলেন। সুতরাং এটাও মাধ্যম হিসেবে আশি হয়ে গেলো।

حَدُّ الزِّنَا

যেনার হদ

অবিবাহিত পুরুষ মহিলার যেনার হদের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। তাদেরকে দেশান্তর করা হবে কি না?

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ. এর মতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের হদ হলো, একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তর।

দলীল : হযরত ওবাদা বিন সামেত রাযি.এর হাদীস,

البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة এই হাদীসে সাধারণভাবে পুরুষ মহিলা প্রত্যেকের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর বলা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও যায়েদ বিন খালেদ জুহানী রাযি.এর হাদীসে আছে। [৩৩৬],

على ابنك جلد مائة وتغريب عام

এই হাদীসেও বেত্রাঘাতের সাথে এক বছরের দেশান্তরের কথা উল্লেখ আছে। যার থেকে বুঝা গেলো, দুটিই হদের অন্তর্ভুক্ত।

---

৩৩৬. সিহাহ সিত্তাহ।

জবাব : দেশান্তরকে হদের অংশ বলা সঠিক নয়। বরং দেশান্তর ইমামের বিবেচনার ওপর ন্যস্ত। সিয়াসাত হিসেবে তার প্রয়োগের অধিকার আছে। দ্বিতীয়ত, যেই হাদীস থেকে দেশান্তর প্রমাণ হচ্ছে, সেটা খবরে ওয়াহেদ। আর খবরে ওয়াহেদ দিয়ে কিতাবুল্লাহের ওপর বৃদ্ধিকরণ চলে না।

ইমাম মালেক রহ.এর মতে পুরুষের হদ একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তর। আর মহিলার শুধু একশত বেত্রাঘাত। মহিলাকে দেশান্তর করা হবে না।

দলীল : ইমাম মালেকের দলীলও সেগুলি যা উপরে অতিবাহিত হয়েছে। তবে তিনি মহিলা সম্পর্কে দেশান্তরের প্রবক্তা নন। কেননা, তাকে একা দেশান্তর করা হলে তাতে আরো ফেতনার আশঙ্কা আছে। আর যদি স্বামীর সাথে দেশান্তর করা হয়, তাহলে স্বামী অপরাধী নয়। তাকে কোনো কারণ ছাড়া শাস্তি দেওয়া হবে।

[মূল কিতাবে স্বামীসহ দেশান্তরের আলোচনা এসেছে। কিন্তু কথাটা বিবেচনাযোগ্য। কারণ আলোচনা হচ্ছে অবিবাহিত ছেলে মেয়ে সম্পর্কে। তাহলে অবিবাহিত মেয়ের স্বামী কিভাবে থাকবে। অনুবাদক]

ইমাম আযম রহ.এর মতে অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার হদ শুধু একশত বেত্রাঘাত।

দলীল : আয়াতে কারিমা,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

এই আয়াতে শুধু একশত বেত্রাঘাতের কথা আছে। দেশান্তরের কথা নেই। তাই দুইজনের হদ শুধু একশত বেত্রাঘাত। আর যেই হাদীসগুলি থেকে দেশান্তর প্রমাণ হয়, তা ঐ পর্যায়ের নয় যে, তা দিয়ে কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধি করা যাবে।

বিবাহিত পুরুষ মহিলার হদেও ইখতিলাফ আছে

ইমাম আহমদ রহ.এর মতে বিবাহিত পুরুষ মহিলার হদ হলো প্রস্তর আঘাত ও একশত বেত্রাঘাত।

দলীল : হাদীসে আছে,

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم

এভাবে হযরত আলী রাযি. তার যুগে শোরাহা হামদানিয়াকে রজমের সাথে সাথে বেত্রাঘাতও করেছেন। বুঝা গেলো, রজমের সাথে বেত্রাঘাতও করা হবে।

জবাব : হযরত ওবাদা বিন সামেত রাযি.এর হাদীস হযরত মায়েযে আসলামী রাযি.এর ঘটনা দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা এটা পরবর্তী ঘটনা।

তিন ইমামের মতে বিবাহিত পুরুষ মহিলার শাস্তি শুধু রজম।

দলীল : হযরত মায়েয রাযি.এর ঘটনা এক জামাআত সাহাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউই রজমের সাথে একশত বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ করেননি। এভাবে গামেদিয়া সম্পর্কে রজমের কথা উল্লেখ আছে, বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ নেই। বুঝা গেলো, বিবাহিত পুরুষ মহিলার হদ শুধু রজম।

বিবিধ

أَقْسَامُ الْيَمِيْنِ

কসমের প্রকারভেদ

ইয়ামিন অর্থাৎ কসম তিন প্রকার। লাগবো, গুমুস, মুনআকিদা। লাগবো কসমের ব্যাখ্যায় ইমামগণের ইখতিলাফ আছে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে ইয়ামীনে লাগবো বলে, ইচ্ছা ছাড়া মানুষের মুখ দিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে কসম কথার মাঝে মাঝে এসে যায়। ইমাম আহমদ রহ.এর এমন একটি বর্ণনা আছে।

দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.এর কাছে একবার ইয়ামীনে লাগবো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন,

هى أن يقول الرجل فى كلامه لا والله بلى والله

"ইয়ামীনে লাগবো হলো, মানুষ কথায় কথায় বলে "না আল্লাহর কসম" হ্যাঁ আল্লাহর কসম" ইত্যাদি।

ইমাম আযম রহ.ও **আহমদ** রহ.এর মতে ইয়ামীনে লাগবো হলো, মানুষ অতীত ও বর্তমানের কোনো কথাকে নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কসম করলো। পরে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

هو الحلف على يمين كاذبة وهو يرى أنه صادق

"কোনো মিথ্যা কথার ওপর কসম করলো এবং নিজ ধারণায় একথা মনে করে যে, আমি সত্য কথার ওপর কসম করেছি।" এটাকে ইয়ামীনে লাগবো বলে।

বিধান : ইয়ামীনে লাগবোর বিধান হলো, তার ওপর কোনো পাকড়াও হবে না। এবং তা মাফ। কুরআনে আছে,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

"আল্লাহ তা'আলা ইয়ামীনে লাগবো সম্পর্কে তোমাদেরকে ধরবেন না।"

দ্বিতীয় প্রকার ইয়ামীনে গুমুস। ইয়ামীনে গুমুস বলে, মানুষ অতীত কালের কোনো কাজ বা কোনো কথার ওপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম করা। এ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে যে, এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় কি না?

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে ইয়ামীনে গুমুসে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

দলীল : এই প্রকারে যেহেতু মিথ্যা বলা হয় এবং অন্তরও জানে যে, এটা মিথ্যা। তাহলে কেমন যেন অন্তরই এটা কামাই করলো। আর যেই গুনাহ অন্তর কামাই করে তাতে অন্তরের ইচ্ছার দখল থাকে। এর ওপর পাকড়াও করা হয়। সুতরাং কুরআনে আছে,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

"আল্লাহ তা'আলা ঐ জিনিসে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তর কামাই করেছে।" বুঝা গেলো, ইয়ামীনে গুমুসেও পাকড়াও হবে। আর পাকড়াও থেকে এখানে কাফ্ফারা উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, এই প্রকারে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

জবাব : এখানে পাকড়াও বলে কাফ্ফারা উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক নয়। বরং এখানে পাকড়াও বলতে আখেরাতের পাকড়াও উদ্দেশ্য। আর এর থেকে মুক্তির জন্য তাওবা ইস্তিগফার জরুরী। তাই এই প্রকারেও তাওবা ইস্তিগফার করতে হবে।

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে ইয়ামীনে গুমুসে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। বরং শুধু তাওবা ও ইস্তিগফার আছে।

দলীল : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.এর হাদীস,

عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من حلف على يمين وهو فيها اثم فاجر ليقطع بها ما لا لقى الله وهو عليه عضبان .

এই হাদীসে ইয়ামীনে গুমুসকারীকে শুধু গুনাহগার বলা হয়েছে। কিন্তু তার ওপর কাফ্ফারার কথা বলেননি। অথচ যদি কাফ্ফারা ওয়াজিব হতো, তাহলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। বুঝা গেলো, ইয়ামীনে গুমুসে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

তৃতীয় প্রকার ইয়ামীনে মুনআকিদা। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করা অথবা না করার ওপর কসম করলো। সে যদি নিজের কসম পূর্ণ করে তাহলে ঠিক আছে। নতুবা সর্বসম্মতক্রমে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

আর কসমের কাফ্ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে অথবা কাপড় দিবে। অথবা একটি গোলাম মুক্ত করে দিবে, অথবা তিনটি রোযা রাখবে। ইয়ামীনে মুনআকিদা সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"তবে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে তোমাদের দৃঢ় কসম তথা মুনআকিদা কসমের কারণে। এর কাফ্ফারা হলো, তোমাদের পরিবারের মধ্যম খাবার দশ মিসকীনকে খাওয়াবে। অথবা তাদেরকে কাপড় দিবে। অথবা গোলাম মুক্ত করবে। এগুলির কোনো একটি না পারলে তিন দিন রোযা রাখবে।"

الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ

কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফ্ফারা

তিন ইমামের মতে কসম করার পর ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফফারা দেওয়া জায়েয আছে।

দলীল : কুরআনে কারীমে আছে,

وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

এই আয়াতে কসমের পর কাফ্ফারার কথা আলোচনা করেছেন। ভঙ্গ হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। বুঝা গেলো, ভঙ্গ হওয়ার আগেও কাফ্ফারা আদায় করা যেতে পারে। এভাবে আয়াতে আছে,

ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"এই আয়াতেও কসমের পর কাফ্ফারার কথা আছে। ভঙ্গ হওয়ার কোনো আলোচনা নেই। হযরত আবু মূসা আশ'আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إنى والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها الا كفرت عن يمينى فأتيت الذى هو خير.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম, যখনি কোনো কাজের ওপর কসম করবো, এরপর অন্য জিনিস এর চেয়ে উত্তম দেখলে নিজের কসমের কাফ্ফারা পরিশোধ করবো এবং অন্য ভালো জিনিসটি গ্রহণ করবো। লক্ষ করুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীসে প্রথমে কসমের কাফ্ফারা দেওয়ার কথা বলেছেন। এরপর সেই কাজের কথা বলেছেন, যার দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে। বুঝা গেলো, ভঙ্গ হওয়ার আগে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয।

জবাব : আয়াতের জবাব হলো, প্রথম আয়াতে بما عقدتم الايمان এর পর এবং দ্বিতীয় আয়াতে إذا حلفتم এর পর وحنثتم فيها উহ্য আছে। আর হাদীসের জবাব হলো, মুসলিম শরীফে একটি বর্ণনা আছে, যা সম্পূর্ণ এর উল্টা।

أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه

"কোনো মানুষ যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে কসম করে, এরপর তার বিপরীত দিকটি উত্তম মনে করে, তাহলে তার উচিত উত্তম জিনিসটি গ্রহণ করা এবং কসমের কাফ্ফারা প্রদান করা।"

লক্ষ করুন, এই হাদীসে ভেঙ্গে যাওয়ার পর কাফ্ফারার কথা আছে। যা প্রথম হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা'আরুযের সময় সেই হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হয় যেটা কেয়াসের পক্ষে। আর কেয়াস বলে, কসম ভাঙ্গার

আগে কাফ্‌ফারা আদায় করা সঠিক নয়। কেননা, ভঙ্গ হওয়া একটি দোষ যার কাফ্‌ফারা দিতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন দোষ করেনি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়নি। তাহলে কাফ্‌ফারা ভঙ্গের পর আদায় করতে হবে, পূর্বে নয়।

ইমাম আযম রহ.এর মতে ভঙ্গ হওয়ার আগে কাফ্‌ফারা আদায় করা জায়েয নেই।

দলীল : হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা রাযি.এর হাদীস,

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يا عبد الرحمن إذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فات الذى هو خير وكفر يمينك

“নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আব্দুর রহমান, যখন তুমি কোনো জিনিস সম্পর্কে কসম করবে, এরপর যখন তার বিপরীত দিক ভালো মনে করবে, তাহলে ভালোটি গ্রহণ করো এবং নিজ কসমের কাফ্‌ফারা পরিশোধ করো।” লক্ষ করুন, এই হাদীসে প্রথমে কসম ভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর কাফ্‌ফারা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেলো, কাফ্‌ফারা হলো কসম ভঙ্গের পর, পূর্বে নয়।

إِيْصَالُ الثَّوَابِ

ঈসালে সাওয়াব

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ.এর মতে শারীরিক ইবাদতের ঈসালে সাওয়াব জায়েয নেই।

দলীল : তারা বলেন, সদকা, দু'আ ও হজ্ব ছাড়া কোনো আমলের ঈসালে সাওয়াব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই। বিশেষভাবে শারীরিক ইবাদতের ঈসালের সাওয়াবের কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই সদকা, দু'আ ও হজ্ব ছাড়া অন্যান্য আমলের ঈসালে সাওয়াব জায়েয হবে না।

জবাব : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.এর জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, প্রত্যেক জিনিসের প্রমাণ জরুরী নয়। যখন সদকা, দু'আ এবং হজ্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাহলে এখন অন্যান্য আমলকেও এর ওপর কেয়াস করা হবে। এটা জরুরী নয় যে, মাসআলার প্রত্যেকটি অংশ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হবে। তাহলে কেয়াসের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

ইমাম আযম রহ. ও **আহমদ** রহ.এর মতে প্রত্যেক আমলের ঈসালে সাওয়াব সহীহ আছে।

দলীল : কুরআনে কারীমে দু'আর ঈসালে সাওয়াব উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হাদীসে আছে,

عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتصدق عنها ؟ قال نعم .

"হযরত সা'আদ বিন ওবাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তার মা মারা যায়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে সদকা করতে পারবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এই হাদীস থেকে সদকার ঈসালে সাওয়াব প্রমাণ হচ্ছে। অন্য এক হাদীস থেকে নামায রোযার ঈসালে সাওয়াব প্রমাণিত হচ্ছে।

إن النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إن من البر بعد البر أن تصلى لوالديك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك .

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নেকীর পর নেকী হলো, নিজের নামাযের সাথে মাতা-পিতার জন্যও নামায পড়বে। এবং নিজের

রোযার সাথে মাতা-পিতার জন্যও রোযা রাখবে। এই সকল হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট হয় যে, মানুষ মৃতদের জন্য সকল আমলের ঈসালে সাওয়াব করতে পারে। চাই তা শারীরিক কিংবা আর্থিক ইবাদত হোক।

ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ

পেটের বাচ্চার যবাহ

জানীন তথা পেটের বাচ্চা জীবিত বেরিয়ে আসলে তাহলে মায়ের সাথে সেটাকেও যবাহ করা ওয়াজিব। তবে যদি মৃত বেরিয়ে আসে এবং পূর্ণ হয়, সেক্ষেত্রে ইখতিলাফ আছে।

তিন ইমামের মতে, এমন মরা বাচ্চা হালাল। এটাকে যবাহ করার প্রয়োজন নেই। বরং মায়ের যবাহই যথেষ্ট।

দলীল : হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস,

أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ذكاة الجنين ذكاة أمه

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাকে যবাহ করা মানে বাচ্চাকে যবাহ।" অর্থাৎ মাকে যবাহ করলে মনে করতে হবে বাচ্চাও যবাহ হয়ে গেছে। আলাদা বাচ্চা যবাহ করার প্রয়োজন নেই।

জবাব : এই হাদীসে প্রতিনিধিত্ব উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মায়ের যবাহ বাচ্চার যবাহের স্থলাভিষিক্ত হবে। এজন্য আলাদা যবাহের প্রয়োজন হবে না। বরং এই হাদীস জীবিত জানীন সম্পর্কে। আর উদ্দেশ্য হলো, বাচ্চা জীবিত বের হলে সেটাকে সেভাবেই যবাহ করতে হবে, যেভাবে মাকে যবাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইবারত হলো এভাবে, ذكاة الجنين كذكاة أمه তাছাড়া এটা খবরের ওয়াহেদ। আয়াতের বিপরীতে গ্রহণ করা যায় না।

ইমাম আযম রহ.এর মতে জানীন মৃত বের হলে সেটা হারাম। তাই সেটা কিংবা সেটার মাকে যবাহ করলে হালাল হবে না।

দলীল : কুরআনে আছে, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ তাই মরা বাচ্চাও হারাম। এই আয়াতের পরবর্তী অংশে مُنْخَنِقَةُ তথা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরা জন্তুকেও হারাম বলা হয়েছে। আর বাচ্চা মায়ের যবাহের পর নিঃশ্বাস না পৌঁছার কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। তাই এটারও সেই হুকুম হবে, যেই হুকুম مُنْخَنِقَةُ এর। অর্থাৎ এমন জানীন হারাম হবে।

لُحُوْمُ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে ঘোড়ার গোশত বৈধ।

দলীল : হযরত জাবের রাযি.এর হাদীস,

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لحوم الحمر الأهلية واذن فى لحوم الخيل يوم خيبر.

এই হাদীসে বলা হয়েছে, খয়বার যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তাই এটা বৈধ হবে।

জবাব : এই হাদীস আয়াতের বিপরীত। তাই আয়াতের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। তাছাড়া সংঘর্ষের সময় বৈধতার ওপর অবৈধতা প্রাধান্য পায়।

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে ঘোড়ার গোশত মাকরূহে তাহরীমি।

দলীল : আয়াতে কারীমা,

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

এই আয়াতে ঘোড়ার সৃষ্টি আরোহণ ও সৌন্দর্যের জন্য খাস করা হয়েছে। বুঝা গেলো, ঘোড়া খাওয়ার জন্য নয়। হাদীসে আছে,[৩৩৭]

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

أَكْلُ الضَّبِّ

গুই সাপ ভক্ষণ করা

ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতে দব (গুই সাপ) হালাল।

দলীল : হযরত ইবনে ওমর রাযি.এর হাদীস,

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ولا احرمه.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

اكل الضب على مائدة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيهم ابو بكر.

এই দুই হাদীস থেকে বুঝা যায়, দব হালাল।

জবাব : দব সম্পর্কে দুই ধরণের হাদীস রয়েছে। তাই হারামের বর্ণনাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাছাড়া এটা وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে হালাল ছিলো। পরে মানসুখ হয়ে গেছে।

---

[৩৩৭]. সুনানে ইবনে মাজাহ।

ইমাম আযম রহ.এর মতে দব মাকরূহে তাহরীমি। ফোকাহা এটাই বলেন। তবে মুহাদ্দিস হানাফীরা মাকরূহে তানযিহী বলেন।

দলীল : আয়াতে কারীমা, ويحرم عليهم الخبائث গুই সাপ খবায়েসের অন্তর্ভুক্ত। তাই হালাল হবে না।

তাছাড়া হাদীসে আছে,[৩৩৮]

ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن اكل الضب.

লক্ষ করুন, এই হাদীসে দব খেতে নিষেধ করা হয়েছে। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে দব নিয়ে আসা হলো। তিনি সেটা অপছন্দ করলেন। আর বললেন, বনি ইসরাঈলের জাতিকে বিকৃত করা হয়েছিলো। হতে পারে সেটা এটা। তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন।

أَكْلُ الضَّبُعِ

হায়েনা খাওয়া

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রহ.এর মতে হায়েনা হালাল।

দলীল : হযরত ইবনে আবি আম্মার বলেন, আমি হযরত জাবের রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হায়েনা কি শিকারী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি খেতে পারবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম এটা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৩৩৯]এই হাদীস থেকে বুঝা যায় হায়েনা হালাল।

জবাব : এখানেও ইবাহাত ও হুরমতের হাদীসে তা'আরুয হয়ে গেছে। তাই হারামের হাদীস প্রাধান্য পাবে।

---

[৩৩৮]. সুনানে আবু দাউদ।

[৩৩৯]. জামে তিরমিযী।

ইমাম আযম ও মালেক রহ.এর মতে হায়েনা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি।

দলীল : আয়াতে কারীমা, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن اكل الضب والضبع

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দব ও হায়েনা খেতে নিষেধ করেছেন।[৩৪০] বুঝা গেলো, উল্লিখিত জিনিস দুটিই হালাল নয়।

সমাপ্ত

'আলহামদুলিল্লাহ' বইটির অনুবাদ শেষ হলো ১৫/০৫/৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৩/০২/২০১৭ ঈসায়ী, রোজ : সোমবার, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে। আল্লাহ্ তুমি বইটির অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি ক্ষমা করো, তালেবে ইলম ভাইদের জন্য উপকারী বানাও এবং প্রথমে আমার ও পরে সকলের জন্য নাজাতের যরিয়া বানাও। আমীন।

---

[৩৪০]. হাশিয়ায়ে তিরমিযী। ৺

পরিশিষ্ট

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবের লেখকগণের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

সংকলন

মাওলানা আবু আফ্ফান নূরুজ্জামান

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মালেক বিন আনাস আলআসবাহী
(৯৩-১৭৯হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : শায়খুল ইসলাম ইমামু দারিল হিজরত মালেক বিন আনাস বিন মালেক বিন আবু আমর বিন আমর বিন হারেস বিন গয়মান বিন খোসাইল বিন আমর আল হিমইয়ারী আলআসবাহী।

জন্ম : ইমাম মালেক রহ. ৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভে সাধারণের তুলনায় একটু বেশি দিন ছিলেন। এর পরিমাণ কেউ কেউ তিন বছর বলেছেন।[৩৪১]

শারিরিক গঠন ও পোশাক : ইমাম মালেক রহ. ছিলেন দীর্ঘকায় মোটা। গায়ের রং ছিলো ফর্সা, যা হলুদ বর্ণের দিকে ধাবিত। প্রশস্ত চোখবিশিষ্ট। নাক ছিলো উঁচু। তার কপালে মাথার চুল কম ছিলো। দাড়ি ঘন এবং এতই লম্বা ছিলো যে, বুক পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। ইমাম মালেক রহ. আদন শহরের বোনা খুব সুন্দর দামী কাপড় পরিধান করতেন। আদন ইয়ামানের একটি শহর। সেখানের কাপড় খুবই সুন্দর ও উন্নত হয়। এছাড়া খোরাসান ও মিশরের উন্নত কাপড়ও পরিধান করতেন।[৩৪২]

মেধা : ইমাম মালেক রহ. অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে বলেন, আমি কোনো একটি বিষয় মুখস্ত করে নিলে আর ভুলি না।[৩৪৩]

ইলম অর্জন : ইমাম মালেক ইলমের প্রতি বড় আগ্রহী ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক সংকট ছিলো। ফলে ঘরের চাল বিক্রি করে কিতাব ক্রয় ইত্যাদি কাজে খরচ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : ইমাম মালেক রহ. যাদের থেকে ইলম অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হচ্ছে, নাফে', মাকবারী, নাঈম আল মোজাম্মার,

---

[৩৪১]. তাহযীবুল কামাল : ২৭/১১৯।

[৩৪২]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ১৩।

[৩৪৩]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ১৬।

যুহরী, আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের, ইবনুল মুনকাদির ও আব্দুল্লাহ বিন দিনার প্রমুখ।[৩৪৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী : তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة

'এক সময় মানুষ ইলমের অন্বেষণে উটের কলিজার উপর আঘাত করবে। তারা মদীনার আলেমের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কোনো আলেমকে পাবে না।'[৩৪৫]

আব্দুর রায্যাক বলেন, আমরা মনে করতাম এই হাদীসে ইমাম মালেকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আব্দুর রহমান বিন মাহদী ইমাম মালেকের উপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না।[৩৪৬]

দরসে হাদীসের শান : ইমাম মালেক রহ. সতের বছর বয়সে হাদীসের দরস দিতে শুরু করেন। তার দরজায় মানুষের এতই ভিড় হতো যে, মানুষের মধ্যে মারামারি লেগে যেত। মা'আন বিন ঈসা বলেন, ইমাম মালেক রহ. যখন হাদীসের দরস দিতে বের হতেন, প্রথমে ভালোভাবে গোসল করতেন। এরপর সুন্দর সুন্দর পোশাক পড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দরসে বসতেন। দরস চলাকালীন সময়ে কেউ উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে পারতো না।[৩৪৭]

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : ইমাম মালেক রহ. যাদের থেকে হাদীস শুনেছেন, তাদের অনেকে ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস শুনেছেন। যেমন ইমাম যুহরী, ইয়াহইয়া আনসারী। এছাড়া রয়েছে ইবনুল মুবারক, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনা ও শো'বা প্রমুখ।[৩৪৮]

---

[৩৪৪]. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ১/১৫৪।

[৩৪৫]. জামে তিরমিযী , ইলম অধ্যায়।

[৩৪৬]. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ১/১৫৪।

[৩৪৭]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬০০, ৬০১।

[৩৪৮]. তাহযীবুল আসমা : ১/৫৯৯।

বড়দের প্রশংসা : ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ইমাম মালেক ও ইবনে উআইনা না হলে হেজাজের ইলম থাকতো না। ইবনে অহাব বলেন, ইমাম মালেক ও লাইস না হলে আমরা গোমরাহ হয়ে যেতাম।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমীরুল মুমিনীন আবু জাফরের কাছে গেলাম। তিনি বিছানার উপর ছিলেন। তখন একটি বাচ্চা বের হচ্ছে আবার ফিরে যাচ্ছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জানো এই কে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার ছেলে, তোমার প্রভাবমিশ্রিত ভীতির কারণে ভয় পাচ্ছে। এরপর আমার কাছে হালাল হারাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম তুমি জ্ঞানী ও বড় ইলমওয়ালা মানুষ। আমি বললাম, আমীমুল মুমিনীন আল্লাহর কসম, না। (আমি বড় আলেম নই) তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে তুমি লুকাচ্ছো। আমি বেঁচে থাকলে তোমার কথা লিখতাম, যেমন কোরআন লেখা হয়। অত:পর তা দেশে দেশে পাঠিয়ে দিতাম।[৩৪৯]

হাফেয যাহাবী বলেন, মদীনাতে তাবেয়ীদের পরে ইলম, ফেকাহ ও স্মৃতিশতিতে ইমাম মালেকের মত আর কেউ ছিলো না।[৩৫০]

লিখিত কিতাব মোআত্তা মালেক : মোআত্তা মালেক সর্ম্পকে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, দুনিয়ার বুকে ইমাম মালেকের মোআত্তার চেয়ে অধিক সহীহ কোনো কিতাব নেই। ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা বোখারী ও মুসলিম শরীফ লেখার আগের কথা।[৩৫১]

একটি আশ্চর্য ঘটনা : ইমাম মালেকের যুগে মদীনাতে একজন নেককার মহিলার ইন্তেকাল হয়েছে। তাকে যখন মহিলারা গোসল দিচ্ছিলো, এক মহিলা মৃত মহিলার লজ্জাস্থানে হাত রেখে বললো, এই লজ্জাস্থান কত বড় ব্যভিচারিনী ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত লজ্জাস্থানের সাথে আটকে

---

[৩৪৯]. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ১/২০৮, ২০৯।

[৩৫০]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৬/৩১।

[৩৫১]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬০১।

গেলো। কোনোভাবে আলাদা করতে পারছিলো না। সকল মানুষ ব্যর্থ হয়ে গেছে। অবশেষে ওলামা ও ফোকাহাদের শরণাপন্ন হলো এবং এর উপায় জানতে চাইলো। সকলে ব্যর্থতা স্বীকার করলো। কিন্তু ইমাম মালেক রহ. তার জ্ঞান থেকে বললেন, ঐ গোসলদানকারী মহিলাকে অপবাদের শরয়ী শাস্তি আশি বেত্রাঘাত লাগানো হোক। তার নির্দেশ অনুযায়ী বেত্রাঘাত করার সাথে সাথে হাত ছুটে গেলো। তখন থেকে মানুষ বুঝতে পারলেন, তিনি কত বড় ইমাম।[৩৫২]

ইন্তিকাল : ১৭৯ হিজরীতে হঠাৎ ইমাম মালেক রহ. অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার মধ্যে প্রায় সপ্তাহ কেটে যায়। এরপর রবিউল আওয়াল মাসের ১১ তারিখ দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তখন তার বয়স হয়ে ছিলো, ৮৬ অথবা ৮৭ বছর। মাকবারায়ে বাকীতে দাফন করা হয়েছে।[৩৫৩]

---

[৩৫২]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ১৬, ১৭।

[৩৫৩]. যফরুল মুহিসসিলীন : ৬৫।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাসান আশশায়বানী
(১৩২-১৮৯হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন ফারকদ আশশায়বানী।

জন্ম : ইমাম মুহাম্মাদ রহ.র আসল বাড়ি দামেশকে। তার বাবা ইরাকের অসেতে চলে আসেন। সেখানে তার জন্ম হয়। তিনি কুফা নগরীতে লালিত পালিত হয়েছেন।

শারিরিক গঠন : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. সুন্দর সুদর্শন ছিলেন। তাকে যখন তার বাবা ইমাম আযমের দরবারে নিয়ে আসে তখন ইমাম আযম রহ. বলেন, তার মাথা মুণ্ডিয়ে দিন এবং পুরাতন কাপড় পরিয়ে দিন। যাতে কেউ ফিতনার শিকার না হয়। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমার মাথা মুণ্ডানো হলে সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়।[৩৫৪]

ইলম অর্জন : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. কূফাতে লালিত পালিত হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে ফেকাহ শিখেছেন। এছাড়া আরো অনেক বড় ইমামদের থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস অর্জন করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমার বাবা ৩০ হাজার দেরহাম রেখে যায়। তার থেকে পনের হাজার নাহু ও শে'র সেখার পেছনে খরচ করি। আর পনের হাজার ফেকাহ ও হাদীস শেখার পেছনে খরচ করি।[৩৫৫]

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : উল্লেখযোগ্য উস্তাদের মধ্যে রয়েছে, ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক, আবু আমর আওযায়ী, যা'মা বিন সালেহ প্রমুখ।

লিখিত কিতাব : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হাদীস, ফেকাহ ও উসূলে ফেকহের উপর বহু কিতাব রচনা করেন। যেমন, জামেউস সগীর, জামেউল কাবীর,

---

[৩৫৪]. শাযরাতুয যাহাব : ১/৩১৫।
[৩৫৫]. আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়্যাত : ১/২৮৫।

সিয়ারুস সগীর, সিয়ারুল কাবীর, মাবসুত, যিয়াদাত, মুআত্তা মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, আলআমালী, জুযউম মিনাল হিয়াল ইত্যাদি।[৩৫৬]

বড়দের প্রশংসা : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আরবী ভাষা সাহিত্যে বড় দক্ষ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি যদি বলি তাহলে বলতে পারি যে, কোরআন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.র ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩৫৭]

ইমাম শাফেয়ী রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. উভয়কে দেখেছেন। এদের মধ্যে বড় ফকীহ কে? তিনি বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বড় ফকীহ।

তিনি আরো বলেন, আমি হালাম-হারাম, নাসেখ-মানসুখ ও ইলল সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.র চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।[৩৫৮]

ইমাম মুহাম্মাদ রহ.র বয়স তখন ১৪ বছর। ইমাম আবু হানিফা রহ. মাসআলা বলছিলেন, কোনো বাচ্চা যদি এশার নামায পড়ার পর ঘুমায় এবং ফজরের পূর্বে স্বপ্নদোষ হওয়ার ফলে বালেগ হয়, তাহলে তাকে এশার নামায পুনরায় পড়তে হবে। কারণ ওয়াক্ত বাকি থাকায় তার উপর এশার নামায ফরয হয়ে গেছে। একথা শুনে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মাসজিদের কোণে গিয়ে নামায আদায় করলেন। এটা দেখে ইমাম আযম রহ. বললেন, একদিন সে বড় হবে।[৩৫৯]

ইয়াহইয়া বিন মায়ীন বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদের তুলনায় কোরআনের বড় আলেম আর কাউকে পাইনি।[৩৬০]

ইলমের খেদমত : ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যখন বাগদাদে যান, তখন প্রচুর ছাত্র তার দরসে বসতো। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ রহ.

---

[৩৫৬]. আল আ'লাম : ৬/৮০।

[৩৫৭]. আল আ'লাম : ৬/৮০।

[৩৫৮]. শাযারাতুয যাহাব : ২/৪১০।

[৩৫৯]. মোকাদ্দামায়ে কিতাবুল আসার : ১/১৫, আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়্যাত : ১/২৮৫।

[৩৬০]. তাহযীবুল আসমা : ১/১০১।

যখন ইমাম মালেকের হাদীসের দরস দিতেন তখন প্রচুর ছাত্র উপস্থিত হতো। এমনকি ঘরে জায়গা হতো না।[৩৬১]

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ শাফেয়ী, আবু সোলাইমান জাওযজানী, হেশাম বিন ওবাইদুল্লাহ রাযী, আবু ওবাইদ আলকাসেম বিন সালাম, ইসমাঈল বিন তাওবা, আলী বিন মুসলিম তুসি প্রমুখ।[৩৬২]

ইন্তেকাল : ইমাম মুহাম্মাদ রহ.র হাদীসের দরসের শান দেখে বাদশা হারুনুর রশিদ তাকে রেকা অঞ্চলের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। প্রায় সময় তিনি বাদশার সাথে থাকতেন। ১৮৯ হিজরীতে বাদশার সাথে 'রই' অঞ্চলে সফর হলো। ১৮৯ হিজরীতে সেখানে তার ইন্তেকাল হয়। তখন তার বয়স ৫৭ বছর।[৩৬৩]

---

৩৬১. তারীখে বাগদাদ : ২/১৭৩।
৩৬২. তারীখে বাগদাদ : ২/১৭২।
৩৬৩. তারীখে বাগদাদ : ২/১৭২।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল বুখারী
(১৯৪ হি.-২৫৬ হি.)

নাম ও বংশ পরিচিতি : মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরা বিন বারদিযবাহ আল জু'ফী আল বুখারী। ইমাম বুখারী রহ.র উর্ধ্বতন দাদা মুগীরা অগ্নীপূজক কাফের ছিলেন। তিনি বোখারার গভর্নর ইয়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে ইয়ামান জু'ফীর দিকে সম্পৃক্ত করে ইমাম বুখারী রহ.র বংশ পরিচয় জু'ফী বলা হয়।[৩৬৪] এটাকে 'নিসবাতে ওয়ালা' বলে। অর্থাৎ যে যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে তার বংশের দিকে সম্পৃক্ত করা।

জন্ম : ইমাম বুখারী রহ. ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের তের তারিখ শুক্রবার জুমার নামাযের পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৬৫]

শারিরক অবয়ব : ইমাম বুখারী রহ. ছিপছিপে হালকা গড়নের ছিলেন। বেশি লম্বাও নয় বেশি বেটেও নয়।[৩৬৬]

শৈশবকাল : ইমাম বুখারী রহ.র শৈশবে তার পিতা মারা যায়। ফলে তিনি শৈশবকাল থেকে মায়ের আদরে লালিত পালিত হন। মুহাম্মাদ বিন আহমদ বলখী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র শৈশবকালে তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য তার মা খুবই কান্নাকাটি করেন। একদিন তার মা স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম আ.কে দেখতে পান। তিনি তার মাকে বলেন, তোমার অঝোর ধারায় কান্না ও দো'আর কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সকালে উঠে দেখা গেলো, আসলেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।[৩৬৭]

---

[৩৬৪]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২০৪।

[৩৬৫]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২০৪, জফরুল মুহাসসিলীন : ৭৬।

[৩৬৬]. তাহযীবুত তাহযীব : ৮/৩৪।

[৩৬৭]. তাহযীবুল কামাল : ২৪/৪৪৫।

আল্লাহ তা'আলা তাকে এতই দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি তারীখের কিতাবটি রাওযায়ে আতহারের পাশে বসে চাঁদের আলোতে লিখেছি।[৩৬৮]

প্রাথমিক শিক্ষা : মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার প্রাথমিক শিক্ষা কেমন ছিলো? তিনি বলেন, আমি মকতবে থাকাকালীন সময়ে আমার মধ্যে হাদীস মুখস্ত করণের আগ্রহ জাগে। জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আপনার বয়স কতো? তিনি বলেন, দশ বছর বা তার চেয়ে কম। দশ বছর পূর্ণ হলে মকতব থেকে বের হলাম। এরপর মুহাদ্দিস দাখেলী প্রমুখদের কাছে আসা যাওয়া করতে শুরু করলাম। একদিনের ঘটনা, ইমাম দাখেলী হাদীস পড়াচ্ছিলেন। একটি সনদ বলছিলেন এভাবে, সুফিয়ান আবু যোবায়ের থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে। আমি তাকে বললাম, আবু যোবায়ের ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। তিনি আমাকে ধমক দিলেন। আমি বললাম, আপনি আপনার মূল কপিতে দেখুন। তিনি দেখে বললেন, হে ছেলে বিষয়টি কেমন হবে? আমি বললাম, 'যোবায়ের বিন আদী ইবরাহীম থেকে' এমন হবে। সে আমার থেকে কলম নিয়ে ঠিক করে নিলেন। ইমাম বোখারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আপনার বয়স কতো? তিনি বলেন, ১১ বছর। তিনি বলেন, আমার বয়স যখন ১৬ বছর তখন আমি ইবনে মুবারক ও ওয়াকি রহ.র সকল কিতাব মুখস্ত করে ফেলি। এরপর আমি আমার মা ও ভাই আহমাদের সাথে হজের উদ্দেশ্যে মক্কাতে যাই। হজ্ব শেষে আমার মা ও ভাই ফিরে আসে। আমি হাদীস শেখার জন্য থেকে যাই।[৩৬৯]

উচ্চ শিক্ষার জন্য সফর : তিনি বলখ, নিসাপুর, রই, বসরা, কূফা, মক্কা, মদীনা, মিশর ও শাম ইত্যাদি শহরে সফর করেছেন এবং প্রত্যেক শহরের উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসগণের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম বোখারী রহ. বলেন, আমি এক হাজারের চেয়ে অধিক উস্তাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি এবং প্রত্যেকের থেকে দশ হাজার বা তার চেয়ে

---

৩৬৮. তবকাতে শাফিইয়াহ : ২/১৫৮।

৩৬৯. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২০৫।

বেশি হাদীস গ্রহণ করেছি। আমার কাছে সনদ বিহীন কোনো হাদীস নেই।[৩৭০]

উল্লেখযোগ্য কিছু উস্তাদ : উপরের আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম বোখারী রহ. হাজারেরও অধিক উস্তাদ। সেখান থেকে অল্প কিছু উস্তাদের তালিকা পেশ করছি। তারা হলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন মূসা, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আনসারী, আফ্‌ফান, আবু আসেম নাবীল, মাক্কী বিন ইবরাহীম, আবুল মুগীরা, আবু মুসহির রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।[৩৭১]

ইবাদাত, সততা ও বুযুর্গী : ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসের প্রতি দিনে একবার কোরআন খতম করতেন। এরপর তারাবীর পরে নফল নামাযে প্রতি তিন দিনে এক খতম করতেন।
ইমাম বুখারী রহ. নিজে বলেন, আমি আসাবাদী আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমার থেকে এই হিসাব নিবেন যে, আমি কারো গীবত করেছি। এমনকি তিনি হাদীসের তাহকীকের ক্ষেত্রে কোনো মুহাদ্দিসের ব্যাপারে মিথ্যুক বা দাজ্জাল ইত্যাদি কঠিক শব্দ প্রয়োগ করতেন না।[৩৭২]

মেধা : আল্লাহ তা'আলা ইমাম বোখারী রহ.কে প্রচুর মেধা দান করে ছিলেন। তার মেধার পরিধি বোঝার জন্য নীচে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

(১) হাশেদ বিন ইসমাঈল ও অন্য আরেকজন বলেছে, ইমাম বোখারী রহ. অল্প বয়সে আমাদের সাথে বসরার মাশায়েখদের কাছে যাওয়া আসা করতো। কিন্তু হাদীস লিখতো না। এভাবে বেশ কিছু দিন যাওয়ার পর আমরা বললাম, তুমি আমাদের সাথে আসো, কিন্তু হাদীস লেখো না। তাহলে তুমি করো কী? ষোল দিন পরে সে আমাদেরকে বললো, তোমরা আমাকে অনেক কথা বলেছো। এতদিনে তোমরা যা কিছু শিখেছো সব নিয়ে এসো। আমরা সব বের করলাম। তাতে পনের হাজারের বেশি হাদীস ছিলো। তিনি তা সব মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। এমনকি আমাদের

---

৩৭০. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২১২।
৩৭১. তাহযীবুত তাহযীব : ৮/৩৪।
৩৭২. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২২৯।

লিখিত পাণ্ডুলিপি তার থেকে ঠিক করে নিলাম। এরপর তিনি বলেন, তোমরা মনে করো যে, আমি অহেতুক আসা যাওয়া করি? আমার দিনগুলি নষ্ট করি? তখন আমরা জানতে পারলাম, তার আগে কেউ যেতে পারবে না।

(২) ইমাম বোখারী রহ. একবার বাগদাদে যান। এখবর সেখানকার মুহাদ্দিসদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তারা একত্রিত হয়ে ইমাম বোখারী রহ.কে পরীক্ষা করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তারা একশত হাদীস নিয়ে একটির সনদ আরেকটিতে এবং একটির মতন আরেকটিতে, এভাবে তার সনদ ও মতন এলোমেলো করে ফেললো। এরপর তা দশটি করে দশজনকে দিলো যে, তারা ইমাম বোখারীকে শুনিয়ে এর সঠিকতা জানতে চাইবে। যখন ইমাম বোখারী রহ. মজলিসে বসলেন, একজন এসে ঐ এলোমেলো হাদীসগুলির একটি শুনালো। ইমাম বোখারী জবাব দিলেন, আমি জানি না। এভাবে সে দশটি হাদীস শেষ করলো। উপস্থিত ফোকাহা ও মুহাদ্দিসগণ একে অপরের দিক তাকাচ্ছে। এভাবে একেক করে দশজন সকলে তাদের হাদীসগুলি শুনিয়ে দিলো। আর বোখারী রহ. জানি না বলে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, আর নেই, তখন প্রথম ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার প্রথম হাদীসের সনদ ও মতন এমন। এভাবে দশটি হাদীস সঠিকভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী বলে দিলেন। পর্যায়ক্রমে দশজন সকলের হাদীসগুলির সনদ ও মতন সংশোধন করে দিলেন। তখন উপস্থিত লোকেরা স্বীকার করেছে যে, তার মেধা আছে।[৩৭৩]

তার মাযহাব পরিচিতি : আল্লামা তাকী উদ্দীন সুবকী রহ. বলেন, আবু আসেম আব্বাদী তার তবকাত কিতাবে ইমাম বুখারীর আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, ইমাম বুখারী রহ. হুমাইদী থেকে ফেকাহ শিখেছেন। আর হুমাইদী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।[৩৭৪]

---

৩৭৩. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২১৩।

৩৭৪. তবকাতে শাফিইয়াহ : ২/১৫৭।

উক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে আল্লামা তাহের জাযায়েরী রহ. বলেন, তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। তার কিতাব অধ্যয়ন করলে এটাই প্রমাণ হয়। আল্লামা কাশ্মিরী রহ.র এটাই মত।[৩৭৫]

হাদীসের খেদমত : আঠারো বছর বয়সে ইমাম বোখারী রহ. হাদীস জগতের শাহানশাহের মর্যাদা লাভ করেন। তার ইলমী যোগ্যতার কথা এতই প্রচার প্রসার লাভ করে যে, দূর দূর থেকে হাদীস শোনার জন্য আসতে থাকে। তিনি যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানে হাদীসের বিশাল দরসগাহ গড়ে উঠেছে। সর্বদা তার খেদমতে ওলামায়ে কেরামের ভিড় লেগে থাকতো। নিসাপুরে যাওয়ার পর হাদীসের ছাত্ররা তার প্রতি এই ঝুকে পড়েছে যে, ইমাম যুহিলীর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসের হাদীসের দরস খালি হয়ে গেছে। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ রহ. নিয়মিত ইমাম বোখারী রহ.র দরসে উপস্থিত থাকতেন। একদিন খুশিতে উঠে গিয়ে ইমাম বোখারীর কপালে চুমু দেন। এরপর বলেন, হে হাদীসের বাদশা, আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনার পায়ে চুমু খাবো।

ফেরাবরী বলেন, ৯০ হাজার ছাত্র সরাসরি ইমাম বোখারী থেকে বোখারী শরীফ শুনেছে।[৩৭৬]

উল্লেখযোগ্য কিছু ছাত্র : অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নাম ইমাম বোখারী রহ.র ছাত্রের তালিকায় পাওয়া যায়। তাদের থেকে কিছু নাম নিম্ন পেশ করছি। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু যোরআ', আবু হাতেম, ইবরাহীম আলহারবী, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া, আবু বিশির দুলাবী ও কাসেম বিন যাকরিয়া প্রমুখ।[৩৭৭]

অপার শ্রমের ফসল বুখারী শরীফ : ইমাম বোখারীর পূর্বে মুসন্নাফ ও মোসনাদের যুগ ছিলো। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো হাদীসগুলিকে একত্রিত করে মুসন্নাফ ও মোসনাদগুলি লিখেছেন।

---

[৩৭৫]. যফরুল মুহাসসিলীন : ৮৭।
[৩৭৬]. যফরুল মুহাসসিলীন : ৭৯।
[৩৭৭]. তাহযীবুত তাহযীব : ৮/৩৪।

এরপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম সেখান থেকে নির্বাচন ও যাচাই বাছাই করে সিহাহ ছিত্তা রচনা করেন।

ইমাম বোখারী রহ. বলেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে একটি পাখা। তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছি। পরে কোনো কোনো স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে মিথ্যা দূর করবে। তখন থেকে বোখারী শরীফ লেখার আগ্রহ জাগে।

ফেরাবরী বলেন, ইমাম বোখারী রহ. আমাকে বলেছেন, আমি প্রত্যেকটি হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করেছি। এরপর দুই রাকাত নামায আদায় করে হাদীসটি লিখেছি। এভাবে দীর্ঘ ১৬ বছর সাধনা করে বোখারী শরীফ লিখেছেন।

ইমাম বোখারী রহ. বলেন,

ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح محال الطول

'এই কিতাবে যা হাদীস নিয়ে এসেছি সবগুলি সহীহ। অনেক সহীহ হাদীস নিয়ে আসিনি কিতাবের কলেবর বেড়ে যাবে এই ভয়ে।'[৩৭৮]

ইমাম বোখারী রহ. বলেন, আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্ত আছে। এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্ত আছে। তবে এই কিতাবে হাদীস নিয়ে এসেছি মাত্র ৭২৭৫টি।[৩৭৯]

তার লিখিত অন্যান্য কিতাব : কযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবেয়ীন, তারিখুল কাবীর, তারিখুল আওসাত, তারিখুস সগীর, আল জামেউল কাবীর, আল মুসনাদুল কাবীর, খলকু আফআলিল ইবাদ, আল জামেউস সগীর, তাফসীরুল কাবীর, আলআদাবুল মুফরাদ, জুযউ কেরাত খলফাল ইমাম, জুযউ রফয়ে ইয়াদাঈন ইত্যাদি।

---

[৩৭৮]. তাহযীবুত তাহযীব : ৮/৩৫।

[৩৭৯]. মুকাদ্দামায়ে ইবনে সালাহ : ৮৫।

ইমামগণের প্রশংসা : ইমাম ইবনে খোযায়মা বলেন, আসমানের নীচে ইমাম বোখারীর চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বড় আলেম এবং বড় হাফেয আর কেউ নেই।[৩৮০]
ইমাম আবু ইসহাক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তব ও সত্য ফকীহ দেখতে চায় সে যেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলকে দেখে।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন জা'ফর বলেন, আমি যদি পারতাম তাহলে আমার হায়াত থেকে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলেন হায়াত বাড়িয়ে দিতাম। কারণ আমার মৃত্যুতে একজন মানুষের মৃত্যু হবে। আর তার মৃত্যুতে ইলম চলে যাবে।[৩৮১]

ইন্তিকালের হৃদয়বিদারক ঘটনা : মুহাদ্দিস হাসান বিন মুহাম্মাদ রহ. বলেন, ইমাম বোখারী রহ. যখন নিসাপুরে গেলেন, প্রথমে মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া যুহিলী হাদীসের ছাত্রদেরকে বললেন, তোমরা এই ভদ্রলোকের হাদীসের দরসে বসো এবং তার থেকে হাদীস শোনো। কিন্তু ইমাম বোখারী রহ.র দরসে যখন প্রচুর ছাত্র সমবেত হতে লাগলো, তখন ইমাম যুহিলীর মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। তখন তিনি খলকে কুরআনের মাসআলা গড়ে ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। তিনি বলছিলেন, ইমাম বোখারী রহ. এই আকীদা পোষণ করে যে, কুরআন মাখলুক। অথচ ইমাম বোখারী রহ.র বক্তব্য ছিলো ভিন্ন। তিনি বলছিলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম মাখলুক নয়। বান্দার উচ্চারিত শব্দ বান্দার কাজ হওয়ায় তা মাখলুক। কিন্তু এরপর ইমাম যুহিলী ইমাম বোখারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে পুরা নিসাপুরের আকাশ বাতাস ভারী করে তোলেন। অবশেষে তিনি নিজ দেশে চলে আসেন। তখন ইমাম যুহিলী বোখারার গভর্নরের কাছে চিঠি লেখেন, ইমাম বোখারী সুন্নাতের খেলাফ আকীদা পোষণ করে। এদিকে ইমাম বোখারীর সাথে গভর্নরের

---

[৩৮০]. তাহযীবুত তাহযীব : ৮/৩৭।
[৩৮১]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২১৭।

সাথে সম্পর্ক ভালো ছিলো না। তাই এই চিঠি পেয়ে গভর্নর তাকে দেশ থেকে চলে যেতে বলে।

তখন ইমাম বোখারী রহ. সমরকন্দের অদূরে খরতান্ক এলাকায় চলে যান। সেখানে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিলো। একদিন শেষ রাতে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে দো'আ করলেন, আল্লাহ, তোমার জমিন এতো প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এরপর এক মাস যেতে না যেতেই ৬২ বছর বয়সে ২৫৬ হিজরী শাওয়াল মাসের শনিবার এশার নামাযের পর হাদীসের এই সূর্য চিরতরে ডুবে যায়। খরতানকে তাকে দাফন করা হয়।[৩৮২]

---

৩৮২. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ২/২৩৬-২৪৩ সংক্ষেপিত।

ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নিসাপুরী
(২০৪-২৬১ হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : হাফেয আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম বিন ওয়ারদ বিন, কোশায কোশাইরী আন নিসাপুরী।

জন্ম : খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিসাপুরে ২০৪ হিজরীতে ইমাম মুসলিম রহ. জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা : তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে হাদীসের শিক্ষা শুরু করেন। সর্ব প্রথম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমীর কাছে হাদীস শোনেন। বিশ বছর বয়সে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। সেখানে গিয়ে আল ক'নাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা করেন।[৩৮৩]

উচ্চ শিক্ষার জন্য সফর : তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে রই, ইরাক, হেজাজ, মিশর ইত্যাদি দেশ সফর করেন।[৩৮৪]

উল্লেখযোগ্য কিছু উস্তাদ : ইমাম মুসলিম রহ. দেশ বিদেশের বরেণ্য বহু উস্তাদের কাছে হাদীস শিখেছেন। নীচে সংক্ষেপে কিছু নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। কোতায়বা বিন সাঈদ, ক'নাবী, আহমদ বিন হাম্বল, ইসমাঈল বিন আবি উওয়াইস, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবু বকর উসমান বিন আবি শায়বা ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াসার প্রমুখ।[৩৮৫]

ইবাদাত, সততা ও বুযুর্গী : ইমাম নববী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম রহ.র ইমামত, উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব, দক্ষতা ও অগ্রবর্তীতার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত হয়েছেন।[৩৮৬]

---

[৩৮৩]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/২৯৬।

[৩৮৪]. তাহযীবুল আসমা ওয়াল লোগাত : ১/৬২১।

[৩৮৫]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬১৯।

[৩৮৬]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬২০।

ইমাম মুসলিম রহ. কখনো কারো গীবত করেননি, কাউকে মারেননি। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়।[৩৮৭]

তিনি উস্তাদ মুরব্বীদেরকে খুবই সম্মান শ্রোদ্ধা করতেন। একদিন হাদীসের দরসে ইমাম বোখারী রহ.র কপালে চুমু দেন এবং তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনার পায়ে চুমু খাবো।

মেধা : মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার রহ. সারা পৃথিবীর মধ্যে চারজন বড় বড় হাফেযে হাদীসের মধ্যে ইমাম মুসলিম রহ.কে অন্যতম বলেছেন। এর দ্বারা মেধার পরিধি অনুমান করা যায়।[৩৮৮]

ইমাম নববী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. ততকালীন বড় বড় হাদীস বিশারদদের অন্যতম এবং তীক্ষ্ম স্মৃতিশক্তির অধিকারী।[৩৮৯]

মাযহাব পরিচিতি : তার মাযহাব নির্ধারণ করা জটিল। আল্লামা কাশ্মিরী বলেন, ইমাম মুসলিম ও ইমাম ইবনে মাজাহর মাযহাব জানা নেই। নবাব সিদ্দীক হাসান খান তাকে শায়েফী বলেছেন। শায়েখ আব্দুল লতীফ সিন্দী বলেন, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযীকে শাফেয়ী মাযহাবের বলা হয়। কিন্তু তারা দুজনই মুজতাহিদ। তবে মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী রহ.র দিকে ঝুকানো মনে হয়।[৩৯০]

হাদীসের খেদমত : ইমাম মুসলিম রহ. হাদীসের অধ্যয়ন শেষ করার পর দুইভাবে হাদীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। একদিকে হাদীসের দরস দিয়ে হাজার হাজার মুহাদ্দিস তৈরী করেছেন। অপর দিকে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব লেখে ইতিহাসের পাতায় অমর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

---

[৩৮৭]. যফরুল মুহাসসিলীন : ৯৫।

[৩৮৮]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৩০০।

[৩৮৯]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬১৯।

[৩৯০]. যফরুল মুহাসসিলীন : ৯৫।

উল্লেখযোগ্য কিছু ছাত্র : বহু বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম রহ.র দরস দ্বারা ধন্য হয়েছেন। যারা আজ পৃথিবীর বুকে উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাত। তাদের অন্যতম হলো, আবু ঈসা তিরমিযী, ইয়াহইয়া বিন সায়েদ, মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন সুফিয়ান, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, আলী বিন হোসাইন প্রমুখ।[৩৯১]

অপার শ্রমের ফসল মুসলিম শরীফ : ইমাম নভভী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. যে হাদীসের জগতে মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তার এই কিতাব বড় দলীল। তিনি বলেন, মুসলিম শরীফের মত এত সুন্দর বিন্যাস কোনো কিতাবে নেই। তিনি তার কিতাবের মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ কোনো আলোচনা করেননি।[৩৯২]

হাফেয আবু আলী নিসাপুরী বলেন, আমি আসমানের নীচে মুসলিম রহ.র সহীহ কিতাবের চেয়ে অধিক সহীহ কোনো হাদীসের কিতাব দেখিনি। হাফেয ইবনুস সলাহ বহ. বলেন, এটা এই হিসেবে যে, মুসলিম শরীফে হাদীসের সাথে অন্য কোনো ব্যাখ্যা যোগ করা হয়নি। নতুবা মুসলিম শরীফের তুলনায় বোখারী শরীফের মান বেশি।[৩৯৩]

তার লিখিত অন্যান্য কিতাব : আলমুসনাদুল কাবীর, জামেউল কাবীর, কিতাবুল ইলাল, কিতাবু আওহামিল মুহাদ্দিসীন, কিতাবুত তামীয, কিতাবু তবাকাতিত তাবেয়ীন, কিতাবুল মুখাযরমীন ইত্যাদি।[৩৯৪]

ইমামগণের প্রশংসা : মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বলেন, হুফ্ফাযুদ দুনিয়া অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মধ্যে বড় হাফেযে হাদীস চারজন। ১। রই দেশের আবু যোর'আ, ২। নিসাপুরের মুসলিম, ৩। সমরকন্দের আব্দুল্লাহ দারেমী ও ৪। বোখারার মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল।[৩৯৫]

---

[৩৯১]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬১৯।
[৩৯২]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬২০।
[৩৯৩]. মুকাদ্দামায়ে ইবনে সলাহ : ৮৫।
[৩৯৪]. তাহযীবুল আসমা : ১/৬২১।
[৩৯৫]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৩০০।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বলেন, নিসাপুরের মাটিতে তিন জন মহান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা হলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, মুসলিম বিন হাজ্জাজ ও ইবরাহীম বিন আবু তালেব।[৩৯৬]

ইন্তিকালের হৃদয়বিদারক ঘটনা : আহমাদ বিন সালামা বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. একদিন একটি আলোচনার মজলিসে বসেন। তাতে একটি হাদীস আলোচনা হলো। তার হাদীসটি জানা ছিলো না। তিনি ঘরে চলে গেলেন। ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বলেন, এই ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। তাকে বলা হলো, এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া এসেছে। তিনি বললেন, খেজুর আমার সামনে নিয়ে এসো। তিনি একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন, আর হাদীস খুঁজছিলেন। এদিকে খেজুরও শেষ হয়ে গেলো, হাদীসও পেয়ে গেলেন এবং তখন তিনি মারা যান। এভাবে তিনি ৫৭ বছর বয়সে ২৬১ হিজরীর রজব মাসের ২৫ তারিখ রবিবার ইন্তিকার করেন।[৩৯৭]

---

[৩৯৬]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৩০১।

[৩৯৭]. তাহযীবুল কামাল : ২৭/৫০৭।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন মাজাহ আলকযবিনী
(২০৯-২৭৩হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ কযবিনী আর রাবায়ী। 'মাজাহ' তার মায়ের নাম। তার পরদাদা নয়। একারণে এখানে বিন না লেখে ইবনে লেখা হয়েছে।[৩৯৮]

জন্ম : তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ শহর কযবিনে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইলম অর্জন : ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.র শৈশবকালে ইলমের বাজার গরম ছিলো। বাগদাদে তখন হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতরা ছিলেন। তাদের কাছে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।[৩৯৯]

উচ্চ শিক্ষার জন্য সফর : ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ২১, ২২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ এলাকায় হাদীস শিক্ষা করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন ইসলামী দেশে সফর করেন। এ সুবাদে তিনি ইরাক, মক্কা, সিরিয়া, মিশর, রই ইত্যাদি দেশে সফর করেন।

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : আলী বিন মুহাম্মাদ তনাফিসী, জুরারা বিন মুফাল্লিস, মোসআব বিন আব্দুল্লাহ যোবায়রী, আবু বকর বিন আবি শায়বা, হিশাম বিন আম্মার, ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়ামানী, আবু মোসআব যুহ্‌রী প্রমুখ।

সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদীসের কিতাবের মধ্যে সুনানে ইবনে মাজাহ একটি উপকারী কিতাব। এটা সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। এই কিতাব লেখার পর ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. মুহাদ্দিস আবু যোরআর কাছে পেশ করে ছিলেন। তিনি দেখে খুবই পছন্দ করে ছিলেন। তিনি বলেন, এই কিতাব মানুষের হাতে পৌঁছলে অন্য কিতাব অচল হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, এই কিতাবের মধ্যে আপত্তিকর সনদের হাদীস ত্রিশটির চেয়ে বেশি হবে না।

---

[৩৯৮]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৯৮, ২৯৯।

[৩৯৯]. যখরুল মুহাসসিলীন : ১১২।

কিতাবটিতে ৩২টি অধ্যায়, ১৫০০ অনুচ্ছেদ ও ৪০০০ হাদীস আছে।[৪০০]

অন্যান্য কিতাব : ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.র অন্যান্য কিতাবের মধ্যে কোরআনের একটি তাফসীর ও একটি তারীখের কিতাব রয়েছে।[৪০১]
হাফেয মুকাদ্দেসী রহ. বলেন, কযবিনে রেজাল ও আমসার বিষয়ে তার একটি তারীখের কিতাব দেখেছি।[৪০২]

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : ইবরাহীম বিন দীনার হাওশাবী হামযানী, হাফেয আবু ইয়ালা খলিলীর দাদা আহমদ বিন ইবরাহীম কযবিনী, আবু তৈয়ব আহমদ বিন রওহ আলবাগদাদী আশশা'রানী, আবু আমর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাকীম আল মাদিনী আল আসবাহানী প্রমুখ।[৪০৩]

বড়দের প্রশংসা : মুহাদ্দিস আবু ইয়ালা খলিলী বলেন, ইমাম ইবনে মাজাহ সর্বসম্মতক্রমে বড় ছেকাহ এবং দলিলযোগ্য ব্যক্তি। তার স্মৃতিশক্তি ভালো এবং ইলমে হাদীসে ভালো দক্ষতা রয়েছে।
ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, তার সুনান অনেক সুন্দর। আপত্তিকর খুব একটা বেশি নয়।[৪০৪]

ইন্তেকাল : ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ২৭৩ হিজরী রমযান মাসের ২২ তারিখ সোমবার ইন্তেকাল করেন এবং মঙ্গলবার দাফন করা হয়। ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিলো ৬৪ বছর।[৪০৫]

---

[৪০০]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৯৮, ২৯৯, সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৭।
[৪০১]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৯৯।
[৪০২]. তাহযীবুল কামাল : ২৭/৪১।
[৪০৩]. তাহযীবুল কামাল : ২৭/৪১।
[৪০৪]. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ২/১৫৫।
[৪০৫]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৭।

ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস সিজিস্তানী
(২০২-২৭৫ হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : সুলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক বিন বাশীর বিন শাদ্দাদ বিন আমর বিন আমের আবু দাউদ আল আযদী আস সিজিস্তানী। ইমাম আবু দাউদ রহ.র বংশ পরম্পরায় সামান্য মতবেধ রয়েছে। অধিকাংশ রেজাল শাস্ত্রবিদরা যেটা গ্রহণ করেছেন সেটাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

জন্ম : তিনি ২০২ হিজরীতে খোরাসানের সিজিস্তান অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইলমের জন্য সফর : ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীসের অন্বেষণে ইরাক, হারামাইন, মিশর, সিরিয়া ও জাযিরা ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন।[৪০৬]

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : তিনি যাদের থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, আলী বিন মাদিনী, হাকাম বিন মুসা, মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ, ইয়াহইয়া বিন মায়ীন, মো'আয বিন আসাদ প্রমুখ।[৪০৭]

সততা ও দীনদারী : আসসেকাত কিতাবে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু দাউদ রহ. ফেকাহ, ইলম, মেধা, দীনদারী, বুযুর্গীর ক্ষেত্রে দুনিয়ার ইমামদের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিতাব লিখেছেন। হাদীস থেকে জাল হাদীস আলাদা করেছেন। বিরোধীদেরকে প্রতিহত করেছেন।[৪০৮]

মাযহাব পরিচিতি : ইমাম আবু দাউদ রহ.র মাযহাব সম্পর্কে শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. লিখেন, তারীখে ইবনে খল্লিকানে উল্লেখ আছে, শায়েখ আবু ইসহাক শিরাযী তাকে ফোকাহায়ে কেরামের

---

[৪০৬]. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ২/২৩৬।

[৪০৭]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৪৯)

[৪০৮]. আসসেকাত : ৭/১০৮।

তবকায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪০৯]

বড়দের প্রশংসাবাণী : হাফেয মুসা বিন হারুন বলেন, ইমাম আবু দাউদকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করা হয়েছে হাদীসের জন্য, আর আখেরাতে জান্নাতের জন্য।

তিনি আরো বলেন, আমি আবু দাউদের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।

আল্লামা যাহাবী রহ. সনদের সাথে উল্লেখ করেন, ইমাম আবু দাউদ রহ. আমল ও আখলাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাদৃশ্য ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অকী' রহ.র সাদৃশ্য ছিলেন। অকী' রহ. সুফিয়ান সাওরীর সাদৃশ্য ছিলেন। সাওরী রহ. মানসুর রহ.র সাদৃশ্য ছিলেন। মানসুর ইবরাহীম নাখয়ী রহ.র সাদৃশ্য ছিলেন। ইবরাহীম নাখয়ী রহ. আলকামা রহ.র সাদৃশ্য ছিলেন। আলকামা রহ. ইবনে মাসউদ রাযি.র সাদৃশ্য ছিলেন। ইবনে মাসউদ রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্য ছিলেন।[৪১০]

হাদীসের খেদমত : ইমাম তিরমিযী রহ. দরস ও লিখনীর মাধ্যমে হাদীসের বিশাল খেদমত করেছেন। তার হাদীসের দরসে অনেক সময় হাজারের বেশি ছাত্র একত্রিত হতো। একারণে তার ছাত্রের সংখ্যা অনেক।[৪১১]

উল্লেখযোগ্য কিছু ছাত্র : ইমাম আবু দাইদ রহ.র উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে হলেন, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইবরাহীম বিন হামদান আকুলী, ইসহাক বিন মুসা রমলী, আবু বিশির দুলাবী, আব্দুর রহমান বিন খল্লাদ রামহরমুযী প্রমুখ।[৪১২]

---

[৪০৯]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৮৮।

[৪১০]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৫২-৪৫৫।

[৪১১]. যফরুল মুহাসসিলীন : ১০১।

[৪১২]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৪৯।

সুনানে আবু দাউদ : ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৫ লক্ষ হাদীস লিখেছি। তা থেকে বাচাই করে আমার এই সুনান কিতাবে ৪৮০০ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। এতে আমি সহীহ এবং সহীহের কাছাকাছি হাদীসগুলি স্থান দিয়েছি।একটি মানুষ দীনের উপর চলার জন্য এই চারটি হাদীস যথেষ্ট। সে হাদীসগুলি হচ্ছে,

(١)إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ.

(٢)من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

(٣) لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه.

(٤) إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ.[৪১৩]

লিখিত অন্যান্য কিতাব : মারাসিলে আবু দাউদ, আর রদ আলাল কদরিয়া, আন নাসেখ ওয়াল মানসুখ, কিতাবু বাদয়িল অহী, মা'রেফাতুল আওকাত, ফাযায়েলুল আনসার ইত্যাদি।[৪১৪]

বসরায় বসবাস : ইমাম আবু দাউদ রহ.র খাদেম আবু বকর বিন জাবের বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদ রহ.র সাথে বাগদাদে ছিলাম। একদিন আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে বের হলাম। হঠাৎ দেখলাম, বসরার আমীর আবু আহমদ আল মোআফ্ফাক দাড়িয়ে আছে। ইমাম আবু দাউদ রহ. তাকে স্বাগত জানালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এমন সময় আমীর কেন কষ্ট করে আসলেন? তিনি বলেন, তিনটি প্রস্তাব নিয়ে। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, তা কী? তিনি বলেন, ১। আপনি বসরাতে এসে বসবাস করুন। যাতে মানুষ আপনার ইলম থেকে উপকৃত হতে পারে। ইমাম সাহেব বললেন, গ্রহণ করলাম। ২। আপনি আমার

---

৪১৩. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৫১।

৪১৪. যফরুল মুহাসসিলীন : ১০৩।

বাচ্চাদেরকে আপনার কিতাবটি পড়াবেন। ইমাম সাহেব বললেন, গ্রহণ করলাম। ৩। আমার বাচ্চাদের জন্য আলাদা বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। ইমাম সাহেব বললেন, এটা গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমীর গরীব সকলে সমান। ইবনে জাবের বলেন, পরে তার বাচ্চারা সাধারণদের সাথে এক সাথে হাদীস শুনতো।[৪১৫]

ইন্তেকাল : শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. লিখেন, ইমাম আবু দাউদ রহ. ২৭৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ৭৩ বছর।[৪১৬]

---

৪১৫. তারিখে দামেশক : ২২/১৯৯।

৪১৬. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৮৯।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী
(২১০-২৭৯হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সূরাহ, বিন মূসা বিন যহ্হাক আস্সুলামী আত্তিরমিযী।

জন্ম : ইমাম তিরমিযী রহ. ২০৯ হিজরীতে খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর তিরমিযে জন্ম গ্রহণ করেন। 'তিরমিয' জায়হুন নদীর পারে একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। এই শহরে অনেক বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিস জন্ম গ্রহণ করেছেন। এজন্য এটাকে মদীনাতুর রেজাল বা মহান ব্যক্তিদের শহর বলা হয়। ঐ শহর থেকে কিছু দূরে 'বূগ' নামক গ্রামে ইমাম তিরমিযী জন্ম গ্রহণ করেন।[৪১৭]

প্রাথমিক শিক্ষা : ইমাম তিরমিযী বহ. প্রথমে নিজ এলাকাতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য সফর : তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইরাক, মক্কা, মদীনা ইত্যাদি শহরে সফর করেন। কোনো কেনো কিতাবে তিনি মিশর ও সিরিয়াতে সফরের কথা বললেও আল্লামা যাহাবী রহ. এটাকে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. মিশর ও সিরিয়া সফর করেননি।[৪১৮]

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : তিনি বিভিন্ন দেশে সফর করে অনেক বড় বড় হাদীসের পণ্ডিতদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, আহমদ বিন মানী', মুহাম্মাদ বিন মোসান্না, হান্নাদ বিন সারী, কোতায়বা বিন সাঈদ প্রমুখ।

---

[৪১৭] . দরসে তিরমিযী : ১/১৩১।

[৪১৮] . সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৪।

বড়দের প্রসংশা : তাহযীবুল কামালের টিকাতে আল্লামা মিয্যী রহ. উল্লেখ করেন, ইমাম বোখারী রহ. ইমাম তিরমিযী রহ.কে সম্বোধন করে বলেন,

ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي

'তুমি আমার থেকে যতটুকু উপকৃত হয়েছো, আমি তোমার থেকে এর চেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি।'[৪১৯]

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. একথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ছাত্র বেশি মেধাবী হলে, উস্তাদ তাকে পড়াতে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এতে উস্তাদের উপকার হয়।[৪২০]

শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল রহ. বলেন, বোখারী ও মুসলিম শরীফের তুলনায় তিরমিযী শরীফ বেশি উপকারী। কারণ বোখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া উপকৃত হতে পারবে না। আর তিরমিযী শরীফ সকলের জন্য উপকারী।[৪২১]

ইমাম তিরমিযী রহ. একদিকে ইমাম বোখারী রহ.র যেমন ছাত্র, আবার উস্তাদ। অর্থাৎ কিছু কিছু হাদীস ইমাম বোখারী রহ. ইমাম তিরমিযী রহ.র থেকে শুনেছেন।[৪২২]

মেধা : ইমাম তিরমিযী রহ. অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। নীচের ঘটনাটি এর জলন্ত প্রমাণ।

আবু সা'আদ ইদরিসী বলেন, আবু ঈসা বলেছেন, এক শায়খের দুইটি জুয লেখে ছিলাম। মক্কার পথে ঐ শায়খের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। আমি সেই জুয দুটি শায়খের থেকে সরাসরি শোনার আবেদন করলাম।

---

[৪১৯]. তাহযীবুল কামাল : ২৬/২৫২।
[৪২০]. দরসে তিরমিযী : ১/১৩১।
[৪২১]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৬।
[৪২২]. দরসে তিরমিযী : ১/১৩২।

তিনি মঞ্জুর করলেন। আমি মনে করেছিলাম জুয দুটি আমার সাথে আছে। কিন্তু খুঁজে না পেয়ে সাধা কাগজ সাথে নিয়ে বসে গেলাম। তিনি হাদীস শুনাতে শুরু করেন। হঠাৎ আমার হাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন আমার হাতে সাধা কাগজ। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তোমার লজ্জা হয় না? তখন আমি ঘটনা খুলে বললাম। এটাও বললাম, আপনি যা হাদীস বলেছেন, সব মুখস্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, শোনাও। আমি শুনিয়ে দিলাম। তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, তুমি আগে মুখস্ত করে এসেছো। আমি বললাম, তাহলে ভিন্ন আরো কিছু হাদীস শোনান। তিনি আরো চল্লিশটি হাদীস শোনালেন। এরপর বললেন, এবার শোনাও। আমি সব শুনিয়ে দিলাম। একটি হরফও ভুল হয়নি।[৪২৩]

হাদীসের খেদমত : ওমর বিন আল্লাক বলেন, ইমাম বোখারী দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় খোরাসানে ইলম, মেধা ও বুযুর্গীর ক্ষেত্রে আবু ঈসার মতো আর কাউকে রেখে যাননি।[৪২৪] অর্থাৎ তিনিই সবার সেরা ছিলেন। তাই ইমাম বোখারী রহ.র ইন্তিকালের পর হাদীসের দরসের ক্ষেত্রে খোরাসানবাসী ইমাম তিরমীকেই বেচে নেন। বরং দূর দুরন্ত থেকেও মানুষ হাদীস শিক্ষার জন্য আসতে থাকে।

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : আহমদ বিন ইসমাঈল সমরকন্দী, আহমদ বিন আব্দুল্লাহ বিন দাউদ মারওয়াযী, হোসাইন বিন ইউসুফ ফেরাবরী, হাম্মাদ বিন শাকের অর্‌রাক, দাউদ বিন নসর বিন সোহাইল বযদবী প্রমুখ।

লিখিত কিতাব : ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীস শাস্ত্রে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন। এর মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কিতাব জামে তিরমিযী। পাশাপাশি তার সাথে রয়েছে, শামায়েলে তিরমিযী ও ইলালে তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী রহ.র জামে কিতাব সর্বসম্মতক্রমে সিহাহ সিত্তার

---

[৪২৩]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৫।

[৪২৪]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৫।

অন্তর্ভুক্ত। একথা উপরে লেখা হয়েছে যে, তিরমিযী শরীফকে বোখারী ও মুসলিমের চেয়ে অধিক উপকারী বলা হয়েছে।

মাযহাব পরিচিতি : ইমাম তিরমিযী রহ.র তিরমিযী শরীফ অধ্যয়ন করলে একথা উপলব্দি করা যায় যে, তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ.র অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রায় মাসআলাতে ইমাম শাফেয়ী রহ.র মাযহাবকে তারজীহ তথা প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর খোদাভীতি : ইমাম তিরমিযী রহ. শেষ বয়সে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলেন।[৪২৫] এর থেকে তার খোদাভীতি ও তাকওয়ার বিষয়টি অনুমান করা যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ.র মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ছিলো প্রচুর। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারিরিক গঠন, আ'মাল ও আখলাক সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন 'শামায়েলে তিরমিযী' নামে।

ইন্তেকাল : ২৭৯ হিজরী ১৩ রজব সোমবার রাতে তিরমিয শহরে ইমাম তিরমিযী রহ. ইন্তেকাল করেন। সর্বসম্মতক্রমে তখন তার বয়স ৭০ বছর ছিলো।

---

[৪২৫]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৮/৪৮৫)

ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শোয়াইব নাসায়ী
(২১৫-৩০৩হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : আহমাদ বিন শোআইব বিন আলী বিন সিনান বিন বাহার খোরসানী আন নাসায়ী।

জন্ম : তিনি খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নাসাতে ২১৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

শারিরিক গঠন : আল্লাহ তা'আলা ইমাম নাসায়ী রহ.কে যেমন বাতেনী গুণ দান করে ছিলেন, তেমন বাহ্যিক সৌন্দর্যও দান করেছিলেন। চেহারা খুবই সুন্দর ছিলো। এমনকি বৃদ্ধকালেও চেহারার সৌন্দর্য অটুট ছিলো। সর্বদা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন।[৪২৬]

প্রাথমিক শিক্ষা : শৈশবেই লেখা পড়া শুরু করেছেন। পনের বছর বয়সে মুহাদ্দিস কোতায়বার কাছে যান এবং বাগলা নামক স্থানে তার কাছে এক বছর থাকেন। তার থেকে অনেক ইলম অর্জন করেন।[৪২৭]

উচ্চ শিক্ষার জন্য সফর : ইমাম নাসায়ী রহ. উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইরাক, সিরিয়া, হেজাজ, মিশর ও জাযিরা ইত্যাদি দেশ সফর করেন এবং ইলমে হাদীসে দক্ষতা অর্জন করেন।[৪২৮]

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : ইসহাক বিন রাহুইয়া, হিশাম বিন আম্মার, মুহাম্মাদ বিন নযর বিন মুসাইব, মুহাম্মাদ বিন মোসান্না, মুহাম্মাদ বিন যাম্বুর মাক্কী, মুজাহিদ বিন মূসা, হারুন বিন আব্দুল্লাহ্ হাম্মাল প্রমুখ।[৪২৯]

---

৪২৬. যফরুল মুহাসসিলীন : ১২৫।
৪২৭. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭২।
৪২৮. তাযকেরাতুল হুফ্ফায : ২/১৯৪।
৪২৯. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৩।

মেধা : হাফেয যাহাবী রহ. বলেন, তিনশত হিজরীর মাথায় ইমাম নাসায়ীর চেয়ে বড় কোনো হাফেযে হাদীস ছিলো না।[৪৩০]

তকাওয়া ও দীনদারী : হাফেয মুহাম্মাদ বিন মুযাফ্ফার বলেন, আমি মিশরের মাশায়েখদের কাছে শুনেছি তারা ইমাম নাসায়ী রহ.র রাত ও দিনের ইবাদাতের প্রশংসা করেন।[৪৩১]

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : বিভিন্ন ইসলামী দেশে ইমাম নাসায়ী রহ.র ছাত্র পাওয়া যায়। যাদের তালিকা বড় দীর্ঘ। সংক্ষেপে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি। আবু বিশির দুলাবী, আবু জা'ফর তহাবী, আবু আলী নিসাপুরী, হামযা বিন মুহাম্মাদ কিনানী, আব্দুল কারীম বিন আবু আব্দুর রহমান নাসায়ী প্রমুখ।[৪৩২]

নাসায়ী শরীফ : ইমাম নাসায়ী রহ. প্রথমে সুনানে কোবরা নামে হাদীসের বড় একটি কিতাব লিখেন। কিতাবটি তখন আমীরের কাছে পেশ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এই কিতাবের সকল হাদীস কি সহীহ? তিনি বলেন, না, এতে হাসান সহীহ দুটোই আছে। আমীর বললেন, তুমি উচ্চ স্তরের সহীহ হাদীসগুলি আমার জন্য আলাদা করে লেখে দাও। তখন তিনি মোজতাবা অর্থাৎ আমরা যেটা নাসায়ী শরীফ বলে চিনি সেটা লিখেন।[৪৩৩]

অন্যান্য কিতাব : খাসায়েসে আলী, মুসনাদে আলী, আমলু ইয়াওমী ওয়াল লাইলা, আত্ তাফসীর ইত্যাদি।

মাযহাব পরিচিতি : শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. বলেন, ইমাম নাসায়ী রহ.র আলোচনা থেকে বুঝে আসে যে তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ.র অনুসারী ছিলেন।[৪৩৪]

---

[৪৩০]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৬।

[৪৩১]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৫।

[৪৩২]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৩।

[৪৩৩]. বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন : ২৯৬।

[৪৩৪]. বোস্তানুল মুহাদ্দেসীন : ২৯৬, সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৫।

ইন্তেকালের মর্মান্তিক ঘটনা : ইমাম নাসায়ী রহ. মিশরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে সুনাম সুখ্যাতির কারণে হিংসার স্বীকার হন। একারণে তিনি সফর করে দামেশকে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি চাইলেন দামেশকের জামে মাসজিদের মিম্বরে হযরত আলী রাযি.র মর্যাদা সম্পর্কে তার লিখিত কিতাব 'কিতাবুল খাসায়েস' শোনাবেন। যাতে উমাইয়া শাসনের প্রভাবে মানুষের মাঝে নাসেবিয়াতের দিকে যে ঝুক এসে গেছে এটা যেন দূর হয়ে যায়। তিনি অল্প কিছু না পড়তেই এক লোক প্রশ্ন করলো, হযরত মো'আমিয়া রাযি. সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। অমনি লোকজন তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তিনি শাহাদাত বরণের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তিনি বললেন, আমাকে মক্কাতে নিয়ে চলো। যাতে সেখানে আমার মৃত্যু হয়। তাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার পথে ৩০৩ হিজরীর ১৩ সফর সোমবার ইন্তেকাল করেন। সাফা মারওয়ার মাঝে তাকে দাফন করা হয়।[৪৩৫]

---

[৪৩৫]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৭৬।

ইমাম আবু জা'ফার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ তহাবী
(২৩৯-৩২১হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচয় : আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামা বিন আব্দুল মালেক আলআযদী আলহিজরী আলমিসরী আত্ তহাবী আল হানাফী।

জন্ম : ইমাম তহাবী রহ. ২৩৯ হিজরীতে মিসরের তহা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইলম অর্জন : ইমাম তহাবী রহ. প্রাথমিক শিক্ষা নিজ দেশে মামার কাছে শিখেন। এরপরে মিসরের অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন থেকে, বরং মিসরের বড় বড় সকল ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের দারে দারে গিয়ে ইলম অর্জন করেন। এরপর ২৬৮ হিজরীতে সফর করে সিরিয়া যান। সেখানের বিভিন্ন অঞ্চলের মুহাদ্দিস ও ফকীহদের থেকে হাদীস ও ফেকাহ অর্জন করেন।[৪৩৬]

উল্লেখযোগ্য উস্তাদ : ইমাম নাসায়ী, আব্দুল গনী বিন রেফা'আহ, হারুন বিন সাঈদ আইলী, বাহার বিন নসর খাওলানী, আবু ইবরাহীম আল মুযানী, বাক্কার বিন কোতায়বা, মুহাম্মাদ বিন আকীল ফিরইয়াবী প্রমুখ।

বড়দের প্রশংসা : ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম তহাবী রহ. বড় হাফেয এবং মিসরের মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি এই ইমামের লিখিত কিতাব দেখবে সে বলতে পারবে যে, তার ইলমের গভীরতা কত দূরে।

আবু সাঈদ বিন ইউনুস বলেন, তিনি ছেকাহ, ছাবত, ফকীহ ও আকেল ছিলেন। তার পরে এমন কেউ আর হয়নি।[৪৩৭]

মাযহাব পরিচিতি : ইমাম তহাবী রহ. প্রথমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুস্বারী ছিলেন। তিনি তার মামা আবু ইবরাহীম মুযানীর কাছে

---

[৪৩৬]. যফরুল মুহাসসিলীন : ১৩০।
[৪৩৭]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৩৪২।

পড়তেন। একদিন তার মামা রাগ করে তাকে বলেন, আল্লাহর কসম, তোমার থেকে কিছুই হবে না। এতে তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে তার কাছ থেকে চলে যান। এরপর তিনি ইবনে আবি ইমরান হানাফীর কাছে চলে যান এবং হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। এরপর যখন তিনি তার 'মোখতাসর' কিতাব লিখেন তখন বলেন, আল্লাহ তা'আলা আবু ইবরাহীমের প্রতি দয়া করুন। তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তার কসমের কাফ্ফারা পরিশোধ করতেন।[৪৩৮]

শাহ আব্দুল আজীজ মোহাদ্দেসে দেহলবী রহ. তার মাযহাব পরিবর্তনের আরো একটি কারণ বলেছেন। তিনি বলেন, ইবনে খল্লিকান উদ্ধৃত করেছেন যে, ইমাম তহাবীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি আপনার মামার বিরুদ্ধে হানাফী মাযহাব কেন গ্রহণ করলেন? তিনি বলেন, আমি আমার মামাকে অধিকাংশ সময় হানাফী মাযহাবের কিতাব অধ্যয়ন করতে দেখতাম। একারণে আমিও সেই মাযহাব গ্রহণ করেছি।[৪৩৯]

হাদীসের অপূর্ব সম্ভার তহাবী শরীফ : ইমাম তহাবী রহ. হানাফী মাযহাবের বড় খেদমত করেছেন। তিনি তহাবী শরীফ লিখে ফেকহে হানাফীকে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এ কারণে ফেকহে হানাফীতে তার অবদান অবর্ণনীয়। তিনি তার এই কিতাবে এক এক মাসআলার উপর বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তহাবী শরীফ অধ্যয়ণ করেই এটা উপলব্ধি করা সম্ভব।

অন্যান্য কিতাব : ইখতিলাফুল ওলামা, আশশুরুত, আহকামুল কোরআন, মোশকেলুল আসার ইত্যাদি।

হাদীসের খেদমত : ইমাম তহাবী রহ.র মধ্যে অভূতপূর্ব ইলমী যোগ্যতা থাকায় সকলের কেন্দ্রে পরিণত হন। অনেক দূর দূর থেকে ইলম

---

৪৩৮. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৩৪৩।

৪৩৯. বোস্তানুল মোহাদ্দিসীন : ২২৯।

পিপাসুরা এসে তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। এমনকি ভিন্ন মাযহাবের লোকেরাও এসে তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন।

উল্লেখযোগ্য ছাত্র : যারা ইমাম তহাবী রহ. থেকে ইলম অর্জন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইউসুফ বিন কাসেম মিয়াজী, আবুল কাসেম তবরানী, মুহাম্মাদ বিন বকর বিন মাতরুহ, আহমাদ বিন কাসেম খশ্‌শাব, আবু বকর বিন মুকরী, মুহাম্মাদ বিন হাসান তনুখী প্রমুখ।[৪৪০]

ইন্তিকাল : ইবনে খল্লিকান অফিয়্যাতুল আ'ইয়ান কিতাবে লেখেন, ৩২১ হিজরীর যিলকদ মাসের চাঁদের রাতে বৃহস্পতিবার ইমাম তহাবী রহ. এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। কেরাফাতে তাকে দাফন করা হয়।[৪৪১]

---

[৪৪০]. সিয়ারু আ'লামিন নোবালা : ৯/৩৪২।

[৪৪১]. যফরুল মুহাসসিলীন : ১৩৩।

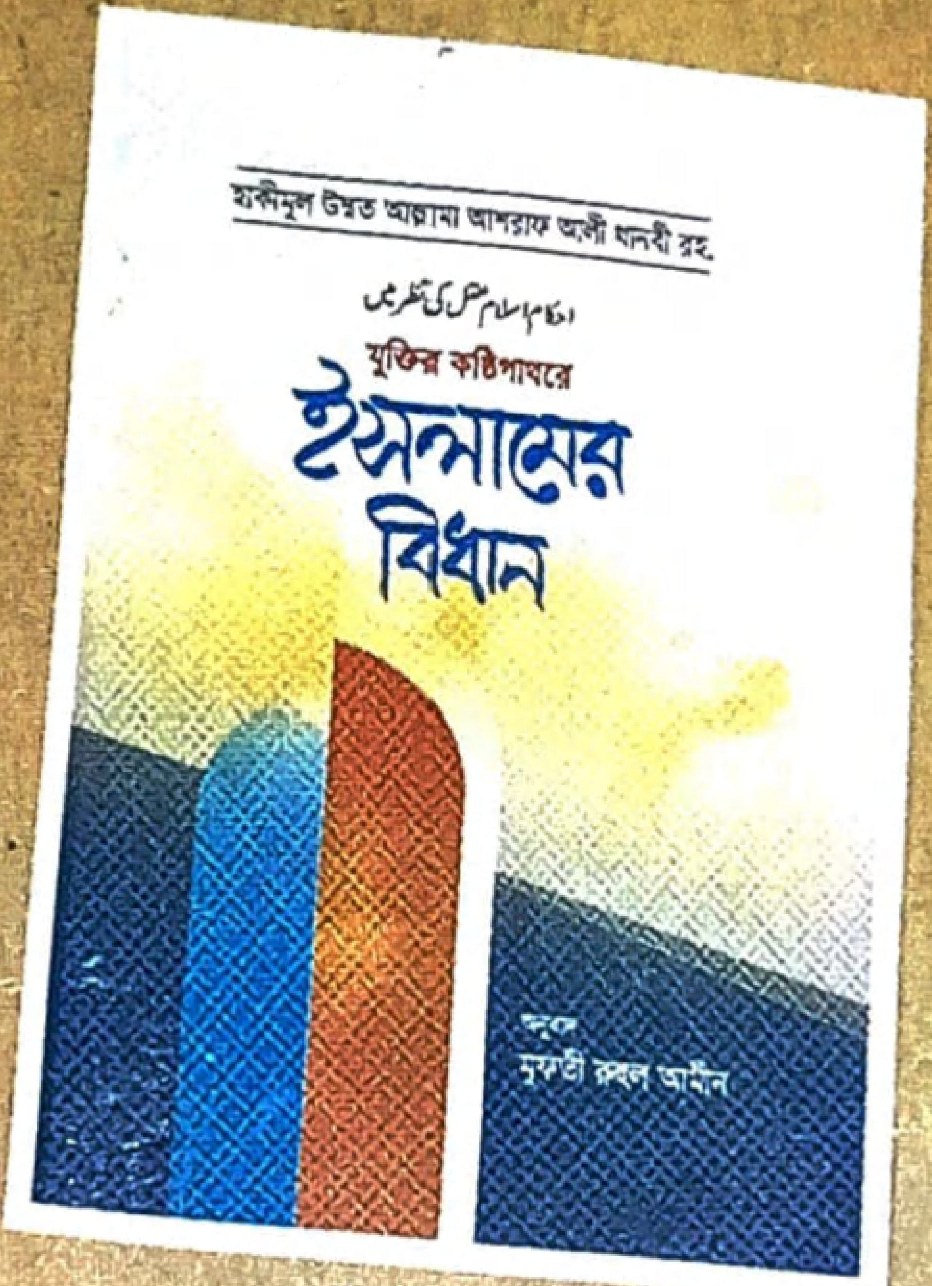
হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী রহ.
احکام اسلام عقل کی نظر میں
যুক্তির কষ্টিপাথরে
ইসলামের বিধান
মুফতী রুহুল আমীন